প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়
আলোকচিত্র : মোনা চৌধুরী

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপনা : লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

সদ্যপ্রয়াত বন্ধু
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ইন্দ্রজিৎ'
স্মরণে

ভূমিকা

'নব্বই পেরিয়ে' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহের কয়েকটি প্রবন্ধ ত্রিশের দশকে রচিত। সেগুলি আকস্মিকভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলিকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করলে অন্যত্র সন্নিবদ্ধ করতে পারা যাবে না। আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ গত সাত-আট বছরের মধ্যে রচিত। সেগুলিকে বাদ দেওয়া চলে না। নামকরণ 'নব্বই পেরিয়ে' হলেও নব্বইয়ের আগেও যা লিখেছি তাও এক সঙ্গে পুস্তকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এর জন্য আমি আমার পুরাতন বন্ধু মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ও নতুন বন্ধু সুধাংশুশেখর দের কাছে কৃতজ্ঞ। সম্পাদনা করেছেন আমার পুত্রপ্রতিম সুরজিৎ দাশগুপ্ত। সে তো আমাদের ঘরের লোক। আনন্দের সঙ্গে সে এই কাজ করেছে। সুবোধরঞ্জন রায় ও প্রভাতকুমার দাস দুটি বিস্মৃত রচনা উদ্ধার করে আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

সূচি

নব্বই বছর পেরিয়ে

নব্বই বছর বাঁচার মস্ত বড় সুবিধে এই, জীবনের অনেকগুলি সাধ পূর্ণ হবার সুযোগ পায়। আমার ধারণা ছিল আমি আমার মায়ের মত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই চলে যাব। তাহলে কিন্তু আমার পরিকল্পিত সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য' অসমাপ্ত থেকে যেত। সেটি যখন সমাপ্ত হয় তখন আমার বয়স আটত্রিশ।

ততদিনে আমি বিয়ে করেছি, ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছি, আমার বেঁচে থাকার উপর নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যৎ। তাছাড়া আমার সহধর্মিণী লীলা আমাকে তাঁর আদরযত্নের দ্বারা সুস্থ ও সমর্থ রেখেছিলেন। আমিও নিয়মিত টেনিস খেলতুম। তার আগে সাঁতারেও আমার উৎসাহ ছিল। স্বদেশে থাকতে দিঘিতে নদীতে ও সমুদ্রে সাঁতার কেটেছি। বিলেতে গিয়ে লন্ডনে ওয়াই এম সি এ-র সুইমিং পুলে প্রতি সপ্তাহেই সাঁতারের অভ্যাস বজায় রেখেছি। সুতরাং আমার শরীর নেহাৎ অপটু ছিল না। সরকারি কাজে খাটনির পরেও সাহিত্যের কাজে খাটতে পারতুম।

'সত্যাসত্য' শেষ হওয়ার পরে দেখলুম আমি আমার সাহিত্যিক পরিকল্পনার একটি মাত্র পর্যায় সমাপ্ত করতে পেরেছি, সেটি হল প্রাচ্যপ্রতীচ্যের মিলন। কিপলিং লিখেছিলেন Oh, East is East, and West is West and never the twain shall meet. আমি দেখাতে চেয়েছিলুম যে the twain could meet. আমার নিজের পারিবারিক জীবনেও তাই।

আর একটি পর্যায় সারা না হলে আমার জীবন সার্থক হবে না। সেটি হচ্ছে Eternal Feminine-এর অন্বেষণ। আমার এই অন্বেষণ বারো বছর বয়সে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' আবিষ্কার করার পর আরম্ভ হয়েছিল। তাঁরই লেখা 'চারইয়ারি কথা'র একস্থানে Eternal Feminine-এর উল্লেখ ছিল আর সেই সূত্রে Venus de Miloর নাম। তখন যে বিশেষ কিছু বুঝতে পেরেছিলুম তা নয়, তবে এইটুকু অনুমান করেছিলুম যে চিরন্তনী নারী আমাদের চেনাশোনা নারীরা নন, মহাকাব্যের নায়িকা বা ভাস্কর্যের প্রতিমা।

আরও একটু বয়স যখন বাড়ে, আরও বইপত্র যখন পড়ি, আরও রক্তমাংসের নারী যখন দেখি তখন প্রশ্ন জাগে, মহাকবিরা বা ভাস্কররা নিশ্চয়ই আকাশ থেকে তাঁদের মডেল পাননি, মডেল পেয়েছিলেন তাঁদের চারদিক থেকে। এই মাটির মেয়েরাই তাঁদের প্রেরণার উৎস। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'

আরও বড় হয়ে আরও অনেক মূর্তি ও ছবি দেখে, আরও অনেক কাব্য নাটক উপন্যাস পড়ে আমার প্রত্যয় হল যে Eternal Feminine সব সময়ই নিখুঁত নয়। বরঞ্চ কিছু না কিছু খুঁত রয়েছে বলেই সে এত আকর্ষণীয়।

পরবর্তী বয়সে আমি Feminine-এর যে তালিকা তৈরি করি তাতে দেবীদের স্থান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল অপ্সরাদেরও স্থান। তাতে সতীসাধ্বীদের স্থান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল অসতীদেরও স্থান। গৃহবধূদের স্থান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল স্বাধীনজীবী নারীদেরও স্থান। বীরাঙ্গ

নাদের স্থান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল বারাঙ্গনাদেরও স্থান। স্বকীয়াদের স্থান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল পরকীয়াদেরও স্থান।

সমাজ যাদের নিন্দে করে কবি চিত্রকর ভাস্কর নাট্যকার নৃত্যশিল্পী তাদের অচ্ছুৎ বলে বর্জন করে না, বরঞ্চ তাদেরকেই বেশি বৈচিত্র্যময়ী মনে করে। Sappho যে লেসবিয়ান ছিলেন কে না একথা জানে! তবু তাঁর কবিতা গ্রিকদের প্রিয়। Mary Magdalene যে একদা বারবনিতা ছিলেন, পরে যীশুখ্রিস্টের সংস্পর্শে এসে আর সকলের শ্রদ্ধেয়া হন, এটাও সুবিদিত। অক্সফোর্ডে তাঁর নামে কলেজ আছে। বোধহয় কেম্ব্রিজেও। সে কলেজের ছাত্ররা কম গর্বিত নয়।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, অথচ তিনিই মহাভারতের নায়িকা। মহাযুদ্ধ বেধে গেল তাঁর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে। কৃষ্ণবর্ণা হলেও তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। জয়দ্রথ বলেছিলেন, তাঁর তুলনায় অন্য নারীরা বানরী।

রাধা ছিলেন পরস্ত্রী, অথচ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি না থাকলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মন্দিরই হয় না। ভারতের কোনওখানেই রুক্মিণী বা সত্যভামাকে কৃষ্ণের সঙ্গে একই মন্দিরে দেখা যায় না। রুক্মিণীর মন্দির স্বতন্ত্র। সত্যভামার কোনও মন্দির আছে বলে শুনিনি।

যতদূর বুঝি, নারীত্বের মহিমা নির্ভর করে না দেবীত্বের উপরে বা সতীত্বের উপরে বা স্বকীয়াত্বের উপরে। নারীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা রূপের উপরে বা গুণের উপরেও নির্ভর নয়। যারা নারীর প্রেমে পড়েছে তারা পতঙ্গের মত আগুনের আকর্ষণে ছুটেছে। সেটা নারীর মোহিনী শক্তি বা charm. নরনারীর প্রেমই হল কাব্য নাটক উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। নরনারী সম্পর্কের মূল তত্ত্বই হল প্রেম। প্রেম থেকে সংগীত ও অপরাপর কলা। আমি যখন স্থির করি, আমি একজন কবি ও কথাসাহিত্যিক হব তখন আমাকে প্রেমিকার অন্বেষণ করতে হয়।

নারীর নারীত্ব মাতৃত্বে পরিপূর্ণতা পায়। সেইজন্য মা দুর্গা ও মা মেরির এমন মাহাত্ম্য। কিন্তু সব নারীর ভাগ্যে মাতৃত্ব ঘটে না। তা বলে কি তাদের নারীত্ব কারও চেয়ে কিছু মাত্র কম? নারীকে নারী বলেই মূল্য দিতে হবে, জননী ও বন্ধ্যা নির্বিশেষে। সন্তানহীনা নারীর মধ্যেও আমি মাতৃত্বর মহিমা দেখেছি।

Eternal Feminine-কে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারা যায় না। বিহারে একটি পর্বতগাত্রে খোদিত আছে বারাণসীর দেবদীন নামে রূপদক্ষ সুতনুকা নামে দেবদাসীকে কামনা করত। কামনাও প্রেমের অন্য এক নাম। 'মেঘদূতে'র যক্ষকে বলা হয়েছে 'কামী'। বুদ্ধদেব বসু তার অনুবাদ করেছেন 'কামুক'। সেটা সম্পূর্ণ ভুল। 'মেঘদূতে'র যক্ষের মত প্রেমিক সাহিত্যে বিরল। কালক্রমে 'কাম' শব্দটার অবমূল্যায়ন হয়। তাই চণ্ডীদাস বলেন, 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়।' যতদূর মনে পড়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজও কামকে 'পূতিগন্ধময়' বলেছেন।

আমরা এযুগের সাহিত্যিকরা কামকে তার আদি অর্থ ফিরিয়ে দিতে চাই। ঋগ্বেদে আছে কামস্তাদগ্রে সমবর্ততাধি অর্থাৎ সকলের অগ্রেই ছিল কাম। কিন্তু এটাও সঙ্গে সঙ্গে মানতে হবে যে এ নিয়ে বাণিজ্য করা হচ্ছে। সেইজন্য সিরিয়াস লেখাকেও মনে করা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি। সেরকম অপবাদ যারা চায় না তারা কামকে একবোরেই এড়িয়ে যায় তাদের লেখায়। তার অর্থ, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। কী করে সেসব লেখা কালোত্তীর্ণ হবে! অপর পক্ষে কমার্শিয়াল নভেল ক্ষণজীবী, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

আমার দ্বিতীয় পরিকল্পনা কতকটা সাহিত্যিক রূপ পেল 'রত্ন ও শ্রীমতী' নামক উপন্যাসের তিন খণ্ডে। কতকটা 'বিশল্যকরণী' আর 'তৃষ্ণার জল' উপন্যাস দুটিতে। বাকিটা এ জীবনে লেখা হল না। খেদ রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমার বয়স হয়েছে ছেষট্টি। আমার বাবা বিগত হন একষট্টি বছর বয়সে। আর কোনও বড় মাপের বই লেখার দম ছিল না। ন বছর কাটিয়ে দিলুম ছড়া ও প্রবন্ধ লিখে। তারপরে হাত দিলুম তৃতীয় পরিকল্পনায়। আমার বিষয়বস্তু—ভারতের নবযৌবন।

গত শতাব্দীতে যা ঘটেছিল তাকে বলা হয় নবজাগরণ। ইংরেজিতে renascence বা renaissance. আমার যেটা অন্বিষ্ট ছিল সেটা নবযৌবন বা পুনর্নবীকরণ বা renewal. 'ক্রান্তদর্শী' নামে সে উপন্যাস চার খণ্ডে সমাপ্ত করতে লেগে গেল ছ বছর। তার বিষয়বস্তু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের জাতীয় সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জাতীয় সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে পার্টিশন। এতে ভারতের পুনর্নবীকরণ হয়ত কিছু দূর এগিয়ে গেল, কিন্তু সে ভারত খণ্ডিত ভারত। তাতে না আছে পূর্ববঙ্গ, না আছে পশ্চিম পঞ্জাব, না আছে সিন্ধুপ্রদেশ, যেটা হিন্দুর আদি ভূমি। এটা কি বিধাতার পরিহাস!

এর পর আমার আর কোনও বড় মাপের পরিকল্পনা নেই। লিখেছি ও লিখব যেটুকু সাধ্যে কুলোয়। এক জীবনে তিনখানা বৃহৎ উপন্যাস লেখা কি যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ নয়?

রমাঁ রলাঁর অনুপ্রেরণায় জনগণের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির অভিলাষ ছিল। কিন্তু তার জন্য গ্রামে গিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হয়। লাঙল ঠেলতে হয়, দাঁড় বাইতে হয়, তাঁত বুনতে হয়, ঘানি ঘোরাতে হয়। এমনই অনেক কাজ করতে হয় যা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। তাই আমি people's writer হতে পারলুম না।

তবে people-এর জন্য ছড়া লিখে গেলুম। সেসব ছড়া গ্রাম অঞ্চলে আবৃত্তি ও গান করা হচ্ছে। মেদিনীপুরের এগরা গ্রাম থেকে একদল গায়ক আবৃত্তিকার এসে রবীন্দ্রসদনে সভা করে আমার ছড়া আমায় শুনিয়ে গেল। আর দিয়ে গেল একটি হাতে বোনা মাদুর আর তাতে হাতে বোনা আমার প্রতিকৃতি।

আমি কবি যত কুকুরের যত বিড়ালের যত হাতির যত ঘোড়ার যত বাঘের যত ভালুকের যত বানরের যত হরিণের যত পাখির যত কীটপতঙ্গের। এইসব জীবজন্তু নিয়ে আমার ছড়া শতাধিক। সমসাময়িক ব্যাপার নিয়েও আমি অজস্র ছড়া লিখেছি। বলা যেতে পারে যে আমার ছড়ার বইই আমার জর্নাল।

শেকসপীয়ার লিখেছেন,

The lunatic, the lover, and the poet
Are of imagination all compact.

তাঁর এই উক্তি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাগল না হলে কি কেউ এক অচেনা অজানা পরকীয়াকে তাঁর স্বামীর শাসনমুক্ত করার জন্য প্রতিশ্রুত হয়? প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে সাংবাদিকের উপার্জনে কুলোয় না। সুতরাং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হয় ও বিলেত যেতে হয়। বিলেত যাওয়ার পূর্বে জানা গেল যে মহিলাটি স্বামীর সঙ্গে

মিটমাট করেছেন। তাঁদের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে তাঁদের নবজাত পুত্রসন্তান। মুক্তির প্রয়োজন যদি থাকে তবে সেটা তাঁর নয়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তরুণের।

অবশ্য আই সি এস প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার অন্য একটি কারণ ছিল। ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ে এই পাগলটি ইউরোপে যাওয়ার জন্যও পাগল হয়েছিল। তার মনে হত যে ইউরোপে না গেলে তার জীবন ব্যর্থ হবে। কৈশোরে সে চেয়েছিল আমেরিকা পালাতে। সেটা সম্ভব হয়নি। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তরুণটি যখন সরকারি কাজে যোগ দিয়েছে তখন এক মার্কিন তরুণী এলেন ভারত ভ্রমণে। দুমাসের মধ্যে তিনবার সাক্ষাতেই পাগলটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রথমে প্রণয়ে ও তার পরে পরিণয়ে পরিণত হয়। তিনিও ছিলেন সমান পাগল। ভারতীয়কে বিয়ে করার ফলে তাঁকে হারাতে হল আমেরিকান ন্যাশনালিটি, পিতামাতার সম্পত্তি, নিজের মনোনীত পিয়ানো বাদনের জীবিকা। বিবাহের সময়ই পাগলটি পাগলিকে বলে রেখেছিল যে সে একদিন সাহিত্যের জন্য চাকরি ছাড়বে।

যখন তার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ, সে তার সহধর্মিণীর হাতে একটি আধুলি ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'টস করো। যদি রাজার মাথা ওঠে তাহলে, ইস্তফা দেব।' রাজার মাথাই উঠল। তখন সে স্ত্রীকে বলে, 'আমার ইস্তফাপত্র তুমিই টাইপ করো।' স্ত্রীর সুবিধা অসুবিধার কথা সে একেবারেই চিন্তা করেনি। বড় ছেলের বয়স তখন সতেরো, ছোট মেয়ের চার, আনুপাতিক পেনসনে সংসার চালানো শক্ত ছিল। স্ত্রী যে রাজি হয়ে যান এটা তাঁর মহত্ত্ব।

ইস্তফার পরেও আরও দু বছর তাকে চাকরিতে থাকতে হয়। নানা কারণে নানা পদে। শেষ পর্যন্ত সে পুরো পেনসনই পায়।

তার এই পাগলামির ফলে সে সাহিত্যের জন্য মনোযোগ দেওয়ার আরও সময় পায়। প্রেমের উপন্যাস লেখার আগে প্রেমের ভাষা আয়ত্ত করে। সরকারি চাকরিতে থাকলে সে প্রেমের ভাষায় লিখতে পারত না, লিখত কেজো ভাষায়। ভাষা ও শৈলী সম্বন্ধে সে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিল। তা না হলে সে রাশি রাশি বাজার চলতি উপন্যাসে লিখে বাড়ি ও গাড়ি করতে পারত।

আমি বিলেত না গেলে 'পথে প্রবাসে' ও 'সত্যাসত্য' লেখা হত না। আরও একবার প্রেমে পড়া হত না। সে প্রেম ছিল মুক্ত প্রেম। তার থেকে এসেছে বেশ কিছু কবিতা। তৃতীয় প্রেম থেকেও আরও অনেক কবিতা আসতে পারত। কিন্তু সরকারি চাকরির ব্যস্ততা ছিল কাব্যসৃষ্টির পরিপন্থী। যখন কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে ঠিক সেই সময়ই এজলাসে গিয়ে মামলা শুনতে হয়। ছুটির দিনে যে আমি কবিতা লিখতে বসব তারও জো নেই। টেলিগ্রাম আসবে, পরিস্থিতি গুরুতর। একবার আমাকে রাত এগারোটার সময় বিছানা থেকে উঠে ছুটে যেতে হয়েছিল দাঙ্গা থামাতে। ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের জীবনটাই ছিল কবিত্বের সঙ্গে বেখাপ।

তবে উপন্যাস লিখতে পারা যেত সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে না গিয়ে, আড্ডা না দিয়ে, তাস না খেলে, স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ না করে, ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অথবা ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে না গিয়ে।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে আমি দুপুর বেলায় একটু বিশ্রাম করতুম বিছানায় শুয়ে। কিন্তু সাতাত্তর-আটাত্তর বছর বয়সে 'ক্রান্তদর্শী' লেখার সময় ভিতর থেকে আদেশ আসত, Slave, go and write. সে আদেশ অমান্য করা যায় না। সরকারি কাজের মত চেয়ার

টেবলে বসে লেখার কাজ করতে হয়। কোথায় বিশ্রাম।

আমার পদত্যাগ বিশ্রামের জন্য নয়, শ্রমের জন্য। তবে সেটা আমার সাধনার অঙ্গ। আমার সাধনা হচ্ছে রূপের সাধনা তথা রসের সাধনা, শিল্পের সাধনা তথা প্রেমের সাধনা। জীবনভর আমি এই দুটি সাধনায় ধাপের পর ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার লেখা হয়েছে রূপোত্তীর্ণ তথা রসোত্তীর্ণ। কিন্তু কালোত্তীর্ণ হবে কি না, বলতে পারি না।

জনপ্রিয় হবার জন্য আমার লেখনী ধারণ নয়। জনপ্রিয় যদি হই তবে সেটা বাড়তি লাভ। তবে একথাও ঠিক, আমি আমার পাঠকদের হৃদয় জয় করতে চেয়েছি। পেরেছি কি না সন্দেহ। আমার বলবার কথা আমি প্রাণ খুলে বলতে পেরেছি, এতেই আমার পরিতৃপ্তি। আমার জ্ঞাতসারে আমি কখনও অসত্য লিখিনি। লেখাকে কখনও অসুন্দর হতে দিইনি। সত্য ও সৌন্দর্যের কাছে আমি দায়বদ্ধ। যেখানে সত্য আছে, সৌন্দর্য আছে, সেখানে শিবও আছে বলে আমার ধারণা।

তবে আমার অনের রচনা ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। সেসব রচনার উদ্দেশ্য এক-একটা সমস্যার মীমাংসা। এই যেমন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। বা জাত-পাত সমস্যা। এসব রচনা সাহিত্য হিসাবে স্থায়ী হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এসব বিষয়ে না লিখে উপায় নেই। যেহেতু আমি একজন বুদ্ধিজীবী। এটাও একপ্রকার noblesse oblige. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে লোকে প্রত্যাশা করে নিঃস্বার্থ সদাব্রত। তেমনই বুদ্ধিজীবীদের কাছে নিঃস্বার্থ কল্যাণকর্ম। আমার কাছে এটা এক প্রকার ফরজ।

অনেকদিন থেকে আমি বলে আসছি, আমি ব্যালাড লিখব। বাংলা ভাষায় ব্যালাডের বড় অভাব। কিন্তু কিছুতে লিখতে পারছি না। সময়ের অভাব নেই, কিন্তু বিষয়ের অভাব। কিছু কবিতা লেখারও ইচ্ছে আছে, বহুদিনের সাধ, সময়ের অভাব নেই, কিন্তু মুড আসছে না। ছোট একটা উপন্যাসের জন্য বারবার তাগাদা আসছে, আমারও বহুদিনের অভিলাষ, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি নেই, তাই লিখতে পারছি না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কথা দিয়েছি, কয়েকটা লেকচার দেব। প্রচুর ভেবেছি। খসড়া করেছি। কিন্তু শরীরে সার্মথ্য পাচ্ছি না।

রোমান ক্যাথলিক সাধুরা শরীরকে বলেন brother ass. আমার 'ভাই গাধাকে' আমি পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারছি না। তার উপর জুলুম করতে গেলে সে বিদ্রোহ করবে। তাই সাবধান থাকতে হচ্ছে। এটাও ফরজ।

:

বিলেত থেকে ফেরার আগে ভারতের হাই কমিশনারের অফিসে একদিন আমার ডাক পড়ে। এডুকেশন অফিসার ড. কোয়েল বলেন, 'আপনি বিচিত্রা পত্রিকায় যে ভ্রমণকাহিনী লিখছেন তা পড়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট বিব্রত বোধ করছেন। আপনার লেখায় তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু স্বনামে লেখায় আপত্তি। আপনি কি ছদ্মনামে লিখতে পারেন না?' তখন আমি লীলাময় রায় ছদ্মনাম গ্রহণ করি। তার কারণ আমি একটি বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসে লীলাবাদী। লীলাময় রায়ের জীবনসঙ্গিনীর নাম হয় লীলা রায়। বাষট্টি বছর আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘর করেছি। আমাদের বিবাহের হীরক জয়ন্তীও পালিত হয়েছিল। নব্বই বছর পেরিয়ে আমি এখন নিঃসঙ্গ।

আমার আমেরিকান স্বপ্ন

আমার ঠাকুমার মুখে শুনেছিলুম, আমেরিকা বলে একটা দেশ আছে। সেটা পাতালে। লোকে তো স্বর্গে যেতে চায়। পাতালে যেতে কে বা চায়!

বছর সাতেক বয়সে আমাকে আমার জন্মস্থান ঢেঙ্কানালে হাইস্কুলের সবচেয়ে নিচের শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। আমার পাশে বসত গোলোক বলে একটি ছেলে। তার মুখে শুনি, তার কাকা সারঙ্গধর দাস আমেরিকায় গিয়ে নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো করে চাকরি করছেন। পাতালে তাহলে মানুষ থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার!

গোলোক একদিন আমাকে একটি ফোটোগ্রাফ দেখায়। চেয়ারে হাত রেখে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেবী পোশাক-পরা এক যুবক। তিনিই গোলোকের কাকা। কাকা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনি।

কয়েক বছর বাদে একদিন আমার বাবা আমাকে ডেকে বলেন, 'তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন আর তোর ভাই হবে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।'

আমাদের বাড়িতে একটি মলাট ছেঁড়া বাংলা বই ছিল। তাতে পড়েছিলুম আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। তাছাড়া কোনও একটি পাঠ্য পুস্তকে জর্জ ওয়াশিংটনের গল্প ছিল। তিনি একটি কুড়ুল দিয়ে তাঁর বাবার প্রিয় একটি চেরিগাছ কেটেছিলেন। বাবা যখন রাগ করে জানতে চান, 'চেরিগাছ কাটল কে?' তখন ছেলে বলেন, 'বাবা, বাবা, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। চেরিগাছ আমিই কেটেছি।'

এমন যে জর্জ ওয়াশিংটন তিনি নিশ্চয়ই একজন আদর্শ পুরুষ। কিন্তু আমার পক্ষপাত ছিল নেপোলিয়নের উপর। কারণ তিনি ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী বীর। আমার মনে হয় যে বাবার পক্ষপাত আমার ছোট ভাইয়ের উপর। তাকেই তিনি দিগ্বিজয়ী বীর করতে চান।

আরও একটু বড় হলে আমি ইংরেজি পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারি। 'মডার্ন রিভিউ', 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পড়ি, সন্ত নেহাল সিং-এর আমেরিকা থেকে পাঠানো প্রবন্ধ পড়ি, সুধীন্দ্র বোসের ও আরও অনেক বাঙালি লেখকের নিবন্ধ পড়ি, 'প্রবাসী'তে পড়ি ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধায়ের লেখা।

ক্রমশ আমেরিকা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ বাড়ে। আমেরিকা এমন এক দেশ যেখানে তুমি একই সঙ্গে earn করতেও পারো, learn করতেও পারো। সেটাই তো আমি চাই। বাবার এত আর্থিক ক্ষমতা ছিল না যে আমাকে কলেজে পড়াতে পারেন। এদেশে একই সময় আমি earn আর learn করতে পারতুম না।

তাছাড়া আমার মনে একটি গুপ্ত বাসনা ছিল। সারঙ্গধর দাসের মত আমিও আমেরিকান বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। রূপকথার রাজপুত্র তো বিদেশে গিয়ে রাজকন্যা বিয়ে করত। শ্রীমন্ত সদাগরের বয়স ছিল আমার মতই কম। সে তো সিংহলে গিয়ে রাজকন্যা বিয়ে করে দেশে নিয়ে আসে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ছিল আমার প্রিয় পাঠ্য।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে প্রচুর ইংরেজি বই ছিল। তাদের মধ্যে একদিন আবিষ্কার করি

আমেরিকায় প্রকাশিত এক Self Educator. চার খণ্ডে সমাপ্ত। তাতে ছিল জার্নালিজমের উপর একটি কোর্স। বড় বড় সংবাদপত্রের অফিসে থাকে চারটি বিভাগ। একটি এডিটরের, একটি সাব-এডিটরের, একটি রিপোর্টারের এবং আর একটি ফ্রীল্যান্সদের।

আমি স্থির করি যে আমি হয় এডিটর হব, নয় ফ্রীল্যান্স হব। দেশেও হতে পারি, বিদেশেও হতে পারি। ভারতে প্রকাশিত নাম করা সংবাদপত্রগুলির নমুনা সংখ্যার জন্যে আমি কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ এলাহাবাদ করাচি লাহোর প্রভৃতি জায়গায় চিঠি লিখি। সমস্তই ইংরেজি পত্রিকা। আমার ধারণা ছিল আমি ইংরেজিতে ভাল লিখতে পারব। আমেরিকায় গেলে তো ইংরেজিতেই লিখতে হত।

পাটনায় প্রকাশিত Searchlight-এর motto ছিল : Eternal Vigilance is the price of Liberty. এই উক্তিটি যাঁর তিনি ছিলেন আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা John Curran. আমিও তাঁর মত Eternal Vigilance-এর সংকল্প নিয়ে সাংবাদিক হতে পারি। এটা শুধু একটা পেশা নয়। এটা একটা ব্রত।

অথচ একই সময় সমান্তরালভাবে আমার মনের উপর কাজ করছিল কবি ও প্রবন্ধকার হওয়ার সাধ। এ সাধ আমি পাই আমাদের স্কুলের কমন রুমে রক্ষিত বাংলা মাসিকপত্রসমূহ, বিশেষ করে 'সবুজপত্র' থেকে। আমাদের হেডমাস্টার রাজেন্দ্রলাল দত্ত কী জানি কেন আমার মত অভাজনকে কমনরুমের চাবি দিয়েছিলেন। সেটা এক রত্নভাণ্ডারের চাবি। আলিবাবার মত আমি এক গোপন রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করে মণিমুক্তা আহরণ করতুম।

পরে আমি 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রও হাতে পেলে পড়তুম। নিজেই 'প্রবাসী'র গ্রাহক হয়েছিলুম। একটু একটু করে আমার বাংলা লেখার হাত তৈরি হয়ে যায় 'সবুজপত্রে'র আদর্শে। আমি চলতি ভাষায় লিখি। স্কুল থেকে আমি অনেকবার ইংরেজি বই পুরস্কার পেয়েছি। তাদের একটি টলস্টয়ের Twenty Three Tales. তার একটি উপকথা বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সেটি সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তখন আমার ষোল বছর বয়স। সেটাই আমার বাংলা সাহিত্যে হাতেখড়ি।

আমার মনের অলক্ষ্যে আমার জীবনদেবতা আমাকে সাহিত্যের দিকে টেনে নিয়ে যান। যদিও আমি সাংবাদিক হতে কৃতসংকল্প। এবং আমেরিকায় গিয়ে ইংরেজি ভাষার সাংবাদিক হতে। আমার আমেরিকান স্বপ্ন আমাকে উন্মনা করে রেখেছিল।

কী জানি কেমন করে মা টের পান। একদিন আমাকে বলেন, 'হ্যাঁ রে খোকা, তুই নাকি আমেরিকা যাচ্ছিস?' আমি বলি, 'না, মা, আমি আমেরিকা যাচ্ছি না।' কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। যাচ্ছিনে এটা ঠিক, কিন্তু যেতে চাই এটাও ঠিক। তাঁর মনে কষ্ট দিতে চাইনে। তিনি বলতেন, খোকা জলপানি পাবে, কলেজে যাবে। আমি কটকে গিয়ে ওর কাছে থাকব। ওর বিয়ে দেব। তা শুনে আমি আতঙ্কিত।

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক পরেই সামান্য কয়েকদিনের অসুখে তিনি মারা যান। তখন আমি শোক পেলুম ঠিকই, কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে করার দায় থেকে মুক্ত বোধ করলুম।

এরপর একদিন আমি বাবাকে বলি, 'আমি কলকাতা যেতে চাই সাংবাদিক হতে।' তার পরের ধাপ যে আমেরিকা যাত্রা সেটা আমি গোপন রাখি। বাবা আমার হাতে পঁয়ত্রিশ টাকা দেন। বলেন, তার বেশি দিতে পারবেন না। নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হবে।

আমার আশা ছিল, আমি 'বসুমতী' বা 'সার্ভ্যান্ট' পত্রিকায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কিছু রোজগার

করতে পারব। কিন্তু তার কোনও সুরাহাই হল না। 'বসুমতী' সম্পাদক আমাকে বললেন টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড শিখতে। শিখলুম কিছুদিন। নিজের খরচেই। দেখলুম কোর্স শেষ করতে অনেকদিন লাগবে। ততদিন কী করে চলবে?

'সার্ভ্যান্ট' সম্পাদক আমাকে পাঠিয়ে দিলেন প্রুফরীডিং শিখতে। প্রুফরীডার ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি যদি প্রুফরীডিং শেখেন, আমার দানাপানি যাবে। আপনিই প্রুফরীডার হবেন।' আমি তাঁকে বোঝাই যে আমি সম্পাদকীয় বিভাগে সম্পাদকীয় লিখতে এসেছি। তিনি বললেন, 'তাই যদি হয় তাহলে আপনাকে আগে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। এখন আপনি কলেজে যান। চার বছর বাদে আসবেন।'

আমি চোখে আঁধার দেখি। জাহাজেই বা আমাকে খালাসী করে নেবে কে? আমি ছিলুম অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল। কলকাতার বন্দরে জাহাজগুলোর চেহারা দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই।

সুতরাং আমার আমেরিকা যাত্রা তখনকার মত শিকেয় তোলা রইল। গ্র্যাজুয়েট হয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পর সংবাদপত্রে আবার ভাগ্যপরীক্ষা করব। আপাতত এটাই আমার সিদ্ধান্ত। ছোটকাকার চিঠি পেয়ে কটক যাই ও রেভেনশ কলেজে আর্টস বিভাগে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই। সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায় সাত টাকা মূল্যের ঢেঙ্কানাল স্কলারশিপ। মা যাকে বলতেন, জলপানি।

মায়ের কথাই ঠিক হল। খোকা জলপানি পেল। সাত টাকাতে পাঁচ টাকা যায় কলেজের ফী বাবদ। আর দু টাকা জমিয়ে রাখতে হয় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র বাৎসরিক চাঁদার জন্যে। থাকি কাকার বাসায়, খাই তাঁরই খরচে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে চলে যাই হস্টেলে। তখন বাবা আমার খরচ পাঠিয়ে দিতেন।

আমার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার খবর যখন বেরোয় তখন দেখি যে আমি ফার্স্ট হয়েছি। তাহলে তো একটু চেষ্টা করলে আমি আই. এ. পরীক্ষাতে উচ্চস্থান পেয়ে ডিভিশনাল স্কলারশিপ কুড়ি টাকা পেতে পারি। Earning এবং learning এইভাবেও সম্ভব। এর জন্য আমেরিকায় যেতে হয় না।

আই. এ. পরীক্ষার ফল যখন বেরোয় তখন দেখা গেল আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেছি। পাব প্রভিন্সিয়াল স্কলারশিপ পঁচিশ টাকা। আমি কটক থেকে পাটনা চলে যাই। বি. এ.-তে অনার্স পাঠ্য হিসেবে নিই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য।

দু বছর বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করি। তখন তো আমার কলকাতায় ফিরে এসে সাংবাদিক হওয়ার ও পরে আমেরিকা যাওয়ার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কলেজ লাইব্রেরিতে হানা দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের সেরা কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ সংগ্রহ পাঠ করে আর সাংবাদিক হতে চাইনে, সাহিত্যিক হতে চাই, যাতে আমার একখানি বইও লাইব্রেরিতে স্থান পেতে পারে বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যিকদের গ্রন্থের সঙ্গে।

সাহিত্যের বাইরে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল ইতিহাস। বিশেষ করে ইউরোপের ইতিহাস। আমার মন উড়ে যায় ইউরোপের আকাশে। বিচরণ করি ইউরোপের মাটিতে। আগে ইউরোপ, তারপর আমেরিকা।

ফলে আমি পাটনা কলেজে ত্রিশ টাকা প্রভিন্সিয়াল স্কলারশিপ পেয়ে ইংরাজিতে এম. এ পড়তে পড়তে ভারতে অনুষ্ঠিত Indian Civil Services-এর প্রতিযোগিতার জন্যও প্রস্তুত হই। প্রতিযোগিতায় সফল হলে সরকারি খরচে দু বছর ইংলন্ডে শিক্ষানবিশ হতে পারব। তারপর

দেশে ফিরে এসে ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ হিসেবে পঁয়ত্রিশ বছর কাল চাকরি করতে পারব। বা ষাট বছর বয়সে অবসর নিতে পারব।

প্রথম বারে আমি সারা ভারতে পঞ্চম স্থান অধিকার করি। কিন্তু সেবার মাত্র তিনজনকে নেওয়া হয়। তখন আমি বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা করি যে পরের বার প্রথম হবই হব। তাহলে আমাকে না নিয়ে উপায় থাকবে না। ভগবান আমার মুখরক্ষা করেন।

সরকারি খরচে আমি বিলেত যাই। আমার জন্য অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে স্থান রক্ষিত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি লেখক হিসেবেও কিছু নাম করেছিলুম। 'পথেপ্রবাসে' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখব বলে 'বিচিত্রা' সম্পাদককে কথা দিয়েছিলুম। আমি অক্সফোর্ডে না গিয়ে লন্ডন বেছে নিই। লন্ডনের মত বৈচিত্র্য অক্সফোর্ডে নেই।

প্রথম সপ্তাহেই পেয়ে গেলুম আনা পাভলোভার ব্যালে নৃত্যের টিকিট। কিছুদিন পরে পাডেরেভ্স্কির পিয়ানো রিসাইট্যালের টিকিট। আর কিছুদিন বাদে ক্রাইজলারের বেহালা-বাদনের টিকিট। আরও কিছুদিন পরে শালিয়াপিনের লোকসংগীতের টিকিট। একটা রাশিয়ান থিয়েটার গ্রুপের নাটকের টিকিট। পরে একটা ফরাসী থিয়েটারের টিকিট। মাঝে মাঝে ইংরেজি থিয়েটারের টিকিট। ইতিমধ্যে বার্নার্ড শ এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের পাবলিক লেকচারের টিকিট। তাছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রীডিং রুমের টিকিট। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন অধ্যাপকের লেকচার শুনতে যেতে হয়েছিল ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স্ ও লন্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ—এই চারটি প্রতিষ্ঠানে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা শুনতে যেতে হত নিম্ন ও উচ্চ আদালতে। ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতে হত উলউইচ শহরে।

সেই যে দু বছর ইংলন্ডে ছিলুম তারই এক সময় একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে প্রস্তাব আসে, জাহাজে চড়ে অ্যাটলান্টিক পার হয়ে নিউইয়র্ক এবং ট্রেনে করে শিকাগো দর্শন করার। লোভনীয় প্রস্তাব। টাকাও বেশি লাগত না। কিন্তু প্রস্তাবটি গ্রহণ করার আগে অগ্রজপ্রতিম মণীন্দ্রলাল বসুর কাছে চিঠি লিখে তাঁর মত জানতে চাই। তিনি তখন সুইটজারল্যান্ডে। তিনি লেখেন, তুমি যে-খরচে আমেরিকার দুটি জায়গা দেখে আসবে সেই খরচে অর্ধেক ইউরোপ দেখতে পারবে। আমি তোমার সাথী হব। এটা আরও লোভনীয় প্রস্তাব।

আমি আমেরিকায় না গিয়ে ইউরোপে যাই। আমেরিকান স্বপ্ন আবার শিকেয় তোলা থাকে।

ইউরোপে থাকতে মাঝে মাঝে আমেরিকানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ এবং আলাপ হয়েছে। আমেরিকান বইপত্রও পড়েছি। আমি ছিলুম ওয়াশিংটন, জেফারসন ও লিঙ্কনের পরম ভক্ত। এমারসন, থোরো আর হুইটম্যানের পরম অনুরক্ত। নিউ ইংলন্ডকে আমি ইংলন্ডের মতই ভালবাসতুম। তাছাড়া আমেরিকান ফিল্ম আমি বড় কম দেখিনি। প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক, মেরি পিকফোর্ড। সুতরাং সে সময় ইউরোপে না গিয়ে আমেরিকায় গেলেই বোধ হয় ভাল করতুম। পরের বছর ইউরোপে অন্যান্য দেশগুলি আর একবার দেখার সুযোগ পেয়েছিলুম। তার জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়েছিল।

যে কারণেই হোক, বোধ হয় মিস ক্যাথরিন মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' বইখানি পড়ার দরুন, আমেরিকার উপর আমার মন বিরূপ হয়েছিল। সবচেয়ে ভারতবিদ্বেষী ইংরেজরাও এই অ্যামেরিকান মহিলার মত ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেনি। আমি রাগ করে বলে বসি, An

American woman will be the last woman I shall marry. সেই উক্তিটি যখন করি তখন বিধাতাপুরুষ বোধহয় অলক্ষ্যে অট্টহাস্য করেছিলেন।

দেশে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যেই আমি প্রেমে পড়ে বিয়ে করি যাঁর সঙ্গে তিনি এক আমেরিকান তরুণী। তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সুযোগ দিলেন না। বাষট্টি বছর আমার সঙ্গে ঘর করেন। আমার অষ্টআশি বছর বয়সে আমাকে একা রেখে স্বর্গে গেলেন। তিনি আক্ষরিক অর্থেই last woman তথা American woman যাঁকে আমি বিয়ে করি। ভগবান আবার আমার মুখরক্ষা করলেন।

ভগবান তৃতীয়বার আমার মুখরক্ষা করলেন যখন আমি একুশ বছর পরে সাতচল্লিশ বছর বয়সে আই. সি. এস. থেকে অকালে অবসর নিই ও পেনসনের উপর নির্ভর করে শান্তিনিকেতনে বাস করি।

মূলত আমি একজন সাহিত্যিক। কিন্তু বাজার চলতি উপন্যাস লিখি না। সাহিত্য থেকে আমার উপার্জন কম। বিয়ের সময় আমি আমার ভাবী গৃহিণীকে বলে দিয়েছিলুম যে আমি আই. সি. এস.-এর চাকরি ছাড়ব ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করব। তিনি যেন স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চালান। এটাও তাঁকে বলে দিয়েছিলুম যে আমাদের ছেলেমেয়েরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হবে না, বাঙালিই হবে। তাই তাঁকে বাংলা শিখে নিয়ে তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হবে। আমার সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল লীলাময় রায়। আমি তাঁর নতুন নাম রাখি লীলা রায়। আমার মা ছিলেন না। বাবা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ভিন্ন জাতধর্মের ও শ্বেতবর্ণের জন্য পর মনে করেন না। আমার কাকা-কাকীমা ভাই-বোনরাও তাঁকে আপন করে নেন। ঠিক বিপরীতটি ঘটে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাস রাজ্যের El Paso শহরে। মিস্টার ও মিসেস অর্নডর্ফ তাঁদের একমাত্র কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়াকে ত্যাজ্য কন্যা করেন। কারণ সেই কন্যা বিবাহ করেছেন একজন অশ্বেতকায় অখ্রিস্টান ভারতীয়কে। বিয়ের পরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লীলা দক্ষকন্যা সতীর মতই ভিখারী শিবের পত্নী রূপে অপমানিতা হন। ফিরে এসে আমাকে বলেন যে আমেরিকার পাট চুকিয়ে দিয়ে এসেছেন।

তাই আমি আর আমেরিকা যাত্রার কথা চিন্তা করিনি। শ্বশুর-শাশুড়ি যদি আমায় স্বীকার না করেন তাহলে আর কেন আমি তাঁদের দেশে যাব? পরে যদি তাঁরা মত পরিবর্তন করতেন তবে আমিও মত পরিবর্তন করতুম। দুঃখের বিষয় তাঁদের দিক থেকে আমি কোনোদিনই ডাক পেলুম না। তাঁদের কন্যাও না।

ডাকটা অবশেষে এল আমাদের ছোট ছেলে আনন্দরূপের কাছ থেকে। তার মাকে। দেশত্যাগের আটত্রিশ বছরে পরে। আনন্দরূপ ততদিনে কলকাতা ও কেম্ব্রিজের পড়া সাঙ্গ করে শিকাগোতে ডক্টরেটের জন্য পড়তে পড়তে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে। তার স্ত্রী এষাও ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডে চাকরি পেয়েছে।

লীলা আর কোনদিনই আমেরিকায় যেতে পারতেন না যদি আনন্দরূপের সাহায্য না পেতেন। এল পাসোতে ফিরে গিয়ে দেখেন, পিতা আর ইহলোক নেই, মা শয্যাশায়ী। কন্যাকে দেখে বলেন, আমার একটি মেয়ে ছিল। সে তোমার মত দেখতে। কিন্তু সে যে কোথায় হারিয়ে গেল জানি না। মা তাঁকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়রা চিনলেন ও কাছে টেনে নিলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার! আমার বড় ছেলে পুণ্যশ্লোক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রূপে কাজ করার সময় তার স্ত্রী গীতাকে ও তার পুত্র চন্দ্রহাসকে নিয়ে এল পাসো

যায়। তখন তাদের দিদিমা তাদের তিনজনকে দেখে খুবই খুশি হন ও তাদের খাতিরে একটা স্থানীয় হোটেলে ভোজ দেন। অন্য সব আত্মীয় যোগ দেন। অশ্বেতকায় অখ্রিস্টান ভারতীয় বলে তারা একটুও অনাদর পায় না।

আমাকে চোখে দেখলে হয়ত আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মন ভিজত। কিন্তু কেমন করেই বা তা বলি যখন শুনি যে লীলার বাবা তার একখানি চিঠিরও উত্তর দেননি। অথচ আমাদের বিবাহের পর আরও ত্রিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

মনে পড়ে যায় ব্রাউনিং পত্নী এলিজাবেথ ব্যারেটের কথা। তিনিও ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র কন্যা। পিতার অমতে বিয়ে করেছিলেন এটাই ছিল তাঁর একমাত্র অপরাধ। ব্রাউনিঙের যে হাল হয়েছিল আমারও সেই হাল হল। এক্ষেত্রে বর্ণভেদ ধর্মভেদ ইত্যাদি বড় কথা নয়। বড় কথা, পিতার ইচ্ছার অবাধ্যতা।

আমার ধারণা ছিল যে বৈবাহিক সূত্রে আমেরিকা যাত্রার সুযোগ না পেলেও একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিক হিসেবে আমি আমেরিকা থেকে আমন্ত্রিত অথবা ভারত থেকে সেখানে প্রেরিত হতে পারব।

আমার মত কত লেখককে ভারত সরকার আমেরিকায় পাঠাচ্ছেন, আমেরিকান সরকার বা কোন ফাউন্ডেশন বা কোন ইউনিভার্সিটি বা বড় কোন সংস্থা আমন্ত্রণ করছেন। কিন্তু এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার আমার কথা কারও মনে পড়ে না। যদিও আমি সাহিত্য অকাদেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নেহরু রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দিল্লিতে আমি এক টেবিলে বসেছি। শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক নেহরুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে ডিনার ও লাঞ্চ খেয়েছি। রথীবাবুর নিমন্ত্রণে মিসেস এলেনর রুজভেল্টের সঙ্গে সস্ত্রীক নৈশভোজন করেছি। কলকাতায় আমেরিকান অফিসিয়ালদের পরিবারে আমন্ত্রিত হয়েছি।

হ্যাঁ, একবার শুনেছিলুম যে ভারত সরকার আমাকে আমেরিকায় পাঠাচ্ছেন। শুধু লিখিত আমন্ত্রণ পত্রের অপেক্ষা। কিন্তু সে চিঠি আর কোনদিনই এল না।

অথচ আমি জাপানে গেছি আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. (P. E. N.) কংগ্রেসে ভারতীয় কেন্দ্রের ডেলিগেট রূপে, পরের খরচে। পশ্চিম জার্মানি ও ইংলন্ডে গেছি সেসব দেশের আমন্ত্রিত অতিথি রূপে। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে দুবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। কিন্তু গ্রহণ করতে পারিনি নানা কারণে। একটি কারণ তো এই যে সোভিয়েট ইউনিয়নে গেছি জানলে আমেরিকানরা ভিসা দিতে রাজি হবেন না।

এই যখন ইতিহাস তখন আমার ছোট ছেলে আনন্দরূপের ও ছোট বৌমা এষার অনুরোধে আমেরিকা যাই কী করে? তাদের বলি আমার বয়স হয়েছে সত্তরের মত, স্বাস্থ্যও ভাল নয়, আমি আমেরিকা যাত্রায় অক্ষম।

কিন্তু আসল কারণটা তাদের বলিনি। সেটা এই যে আমি একজন সাহিত্যিক। আমি যদি কখনও যাই তো আমার সাহিত্যিক পরিচয়েই যাব, পারিবারিক পরিচয়ে যাব না। তোমরা তো প্রত্যেক বছরেই দেশে এসে দেখা করছ। তাই যথেষ্ট নয় কি?

তারপরেও বিশ বছর কেটে গেছে। না আমেরিকা, না ভারত কেউ আমার সাহিত্যিক পরিচয়ে আমাকে ডাকেনি বা পাঠায়নি। সুতরাং আমার আমেরিকায় যাওয়া হয়নি।

এটা কি তবে আমার পক্ষে একটা আফসোসের কথা? না, বিন্দুমাত্রও নয়। আমার কাছে আমার জীবনসঙ্গিনী লীলা রায়ই আমেরিকার প্রতিমূর্তি। তিনি এতদূর থেকে এসে আমাকে

স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন, আমার পাঁচটি সন্তানের জননী হয়েছেন, আমার সাহিত্যকর্মে সহায়তা করেছেন, আমার বইয়ের মলাটের ছবি এঁকেছেন। আমার বিস্তর লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, আমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনিয়েছেন, আমার সঙ্গে ছায়ার মত জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় গ্রামে গ্রামে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরেছেন। কখনও কখনও পদব্রজে। আমার অস্বচ্ছল অবস্থায় নিজেই রাঁধুনির কাজ করেছেন, বাসন মেজেছেন, ঘর ঝাঁট দিয়েছেন, কয়লার বস্তা সাইকেলের পেছনে বয়ে এনেছেন, ছেলেমেয়েদের জন্য দারুণ কষ্ট স্বীকার করেছেন।

লীলা রায় অসম্ভব সাহসী ও ধৈর্যশীল ছিলেন। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেছেন। উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত। লাটসাহেবদের সঙ্গেও খেয়েছেন আবার গরিব চাষীদের সঙ্গেও খেয়েছেন। হাসপাতালে গিয়ে আতুরের সেবা করেছেন। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। বাড়িতে খাদি ক্লাস খুলেছেন ও খাদি বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলে চালিয়েছেন। আমাদের বাড়িকে করেছিলেন হিন্দু মুসলমান খ্রিশ্চান-এর বাড়ি। এই তো আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দিক। তাঁরই ভেতর দিয়ে আমি আমেরিকার পরিচয় পেয়েছি।

আফসোস যদি থাকে সেটা এই যে আমার জন্য তিনি তাঁর পিয়ানো বাদনের সাধনা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তবে অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করে, দেশে Translators' Society প্রতিষ্ঠা করেন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। রোমে অনুষ্ঠিত P. E. N-এর সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের তাঁর করা অনুবাদ *Vigil* নামে ইউনেসকো থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর মৌলিক ইংরেজি রচনারও সমাদর হয়েছিল। তিনি বাংলাও লিখতেন। তাঁর বাংলা বইও প্রকাশিত হয়েছে। এক কথায় তিনি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

সেটা করতে পারতুম আমি যদি আমেরিকা যাত্রার সুযোগ পেতুম। তবে আমি বিলেত থেকে ফিরে 'নিউ রিপাবলিক' ও 'লিভিং এজ' দুটি আমেরিকান পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলুম। দুঃখের বিষয় 'লিভিং এজ' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে আমি 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির' ম্যাগাজিন নিতে আরম্ভ করি। পঞ্চান্ন বছর ধরে নিয়ে আসছি।

আমেরিকার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্কে কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিবাহ সূত্রে সেটা আরও দৃঢ় হয়েছে।

আমেরিকার Declaration of Independence আমার কাছে মানবজাতির ইতিহাসে একটি অপূর্ব দলিল। আমেরিকান সংবিধান ভারতের পক্ষেও আদর্শ স্থানীয়। দাসপ্রথার উচ্ছেদ করতে গিয়ে দশ লক্ষ আমেরিকান প্রাণ দিয়েছিল ও পঞ্চাশ লক্ষ আহত হয়েছিল। অথচ তখন সে দেশের জনসংখ্যা মাত্র চার কোটি। এটা একটা অতুলনীয় রেকর্ড। মহাত্মা গান্ধীকে অনুপ্রাণিত করেছিল থোরোর Civil Disobedience. আর এমারসন তো আমাদেরই একজন ঋষি। তাঁর বাণী থেকে আমি প্রচুর প্রেরণা পেয়েছি। বিবেকের জন্য যাঁরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন তাঁদের প্রধান আশ্রয়স্থল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এসব কথা যখন চিন্তা করি তখন এত দেশ থাকতে আমেরিকার দিকেই তাকাই।

আজকাল বাঙালি ছেলেমেয়েদের তো উচ্চাভিলাষ আমেরিকা গিয়ে জীবন সার্থক করা। এখনও সেই earning আর learning তাদের লক্ষ্য। আমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে দেখছি যে যায় সে থেকে যেতে চায়। আমার ছোট ছেলে আনন্দরূপের একমাত্র সন্তান আদিত্যবর্ণের

জন্ম সেখানে। তার পক্ষে সেখানে থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই যদি হয় তাহলে আমেরিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পুরুষানুক্রমিক। আমার আমেরিকান স্বপ্ন আমার নিজের জীবনে না হলেও সফল হয়েছে আমার সন্তানসন্ততির জীবনে। কিন্তু আমার আমেরিকার স্বপ্ন সফল হলে তো আমি ইংরেজি ভাষার সাংবাদিক হতুম। বাংলা সাহিত্যে কি আমার স্থান হত?

মনে পড়ে

আমি ছিলাম পাটনা কলেজের ছাত্র। বি এ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে একমাত্র আমিই প্রথম শ্রেণীতে পাশ করি। তখন আমাকে তিরিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। সেই বৃত্তির সাহায্যে আমি পাটনা কলেজ হোস্টেলে একখানি ঘর নিয়ে থাকি। ইংরেজিতে এম. এ. পড়তে পড়তে আমি আই সি এস প্রতিযোগিতায় যোগদান করি এবং সারা ভারতে পঞ্চম স্থান অধিকার করি। অন্যান্য বছর পাঁচজনের বেশি প্রতিযোগীকে চাকরির জন্য নির্বাচন করা হতো। সে বছর মাত্র তিন জনকে নির্বাচন করা হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিকারীদের উপেক্ষা করে তাদের জায়গায় মুসলমান প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়। চতুর্থ স্থানীয় যিনি ছিলেন তিনি আর দ্বিতীয়বার আই সি এস পরীক্ষা দিতে পারলেন না। তাঁর বয়স বেশি ছিল। আমি আরও একবার পরীক্ষা দিতে পারতুম। আমার বয়স পার হয়ে যায়নি। তখনই প্রতিজ্ঞা করি, আগামীবার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবই। এ আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তাই আমি দিনরাত পড়ি, পড়ি আর যা পড়ি তা থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লিখি। আমার এই যে প্রস্তুতি তা আমার এম এ ক্লাস করার সঙ্গে খাপ খায় না। আমি ক্লাসে যাই ঠিকই, কিন্তু পিছনের সারিতে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে আই সি এস-এর পাঠ্যবই পড়ি। অধ্যাপক কী বলছেন তাতে কর্ণপাত করি না।

এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া, সেটা একদিন ধরা পড়ে যায়। নিরঞ্জন নিয়োগী ছিলেন অতি সুদক্ষ অধ্যাপক, তাঁর বক্তৃতাও ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমি তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতুম, শুধু অধ্যাপক হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন আচার্য। ব্রাহ্ম সমাজের সভায় আমি তাঁর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও ছিলুম ব্রাহ্মভাবাপন্ন। সেই নিয়োগীমশাই যে এমন কড়া হবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। ক্লাসের মাঝখানে আমার দিকে চেয়ে বলেন, 'ওটা কি পড়া হচ্ছে দেখাও আমাকে।'

আমি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াই। তিনি বইখানা তুলে দেখেন ইংরেজির পাঠ্যবই নয়, ইউরোপের ইতিহাস। তখন তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'এই বই বন্ধ কর, না হয় ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও।'

আমি ক্লাস থেকে বেরিয়েই যাই। কারণ এম. এ ডিগ্রির মোহ আমার ছিল না। পরীক্ষা দেব না। পরীক্ষা দেব না বলেই স্থির করেছিলুম। আই সি এস প্রতিযোগিতাতে ব্যর্থ হলে কলকাতা চলে গিয়ে সাংবাদিক হতে চেষ্টা করতুম। আই সি এস-এর চিন্তা মাথায় ঢুকবার আগে সাংবাদিকতার চিন্তাই ছিল আমার মনের মতো পেশা কিংবা নেশা।

সেদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমি হোস্টেলে আমার ঘরে ফিরে যাই। সেই ইতিহাসের বই পড়ায় মন দিই। এরপর আবার আমি নিয়োগীমশাই-এর ক্লাসে কেন, আর কোনও ক্লাসেই যাইনি। আমার এম. এ পড়া সেইখানেই থামে। নির্দিষ্ট দিনে আমি এলাহাবাদ যাই, প্রতিযোগিতায় বসি। এলাহাবাদের পালা সাঙ্গ হলে পাটনায় ফিরে আসি। যখন ছাত্রবৃত্তির টাকা আদায় করতে যাই তখন শুনি আমার বৃত্তি আটক। কারণ আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট গেছে যে

আমি ক্লাসের পড়ায় অমনোযোগী। ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ আর্নল্ড সাহেব আমাকে ভালবাসতেন। আমি আই সি এস-এর জন্য তৈরি হচ্ছি শুনে উৎসাহ দিতেন। তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলে ছাত্রবৃত্তির টাকাটা কাটা যেত না, কিন্তু এই শর্তে যে আবার ক্লাসে হাজিরা দিতে হবে। অনর্থক নিয়োগীমশায়ের বিরক্তি সঞ্চার হত। তিনি আমার মুখদর্শন করতে চাননি, আমিও তাঁর মুখো হতে চাইনি। কী করে তাঁকে বোঝাতুম যে আই সি এস-এ সফল হওয়া আমার কাছে জীবন মরণ সমস্যা। সফল হলে বিলেত গিয়ে দু'বছর সরকারি খরচে থাকতে পারতুম। ইউরোপে বেড়াতে পারতুম। ইউরোপ সম্বন্ধে লিখতে পারতুম।

আমার পারিবারিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল ছিল না যে বাবা তাঁর টাকায় আমাকে বিলেত পাঠাতে পারতেন। কিন্তু আমার পক্ষে সেই ছিল now or never। তাছাড়া বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা যখন করেছি, তখন সে প্রতিজ্ঞাপূরণ করতেই হবে। তাই আমি রাত জেগে পড়েছি। অনিদ্রা রোগে ভুগেছি। আবার সকালবেলায় গঙ্গায় সাঁতার কেটে সম্পূর্ণ তাজা বোধ করেছি। রান্নাঘরে খাবার সময় বই নিয়ে গেছি ও খেতে খেতে পড়েছি।

রান্নাঘরের পাচক ছিল এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ, তাকে আমরা মেসের বাঙালি ছাত্ররা বাবাজী বলে ডাকতুম। বাবাজীকে কে যেন বলেছিল যে আমাকে একটু ভাল করে খাওয়ালে বড় চাকরি পাব, আর তাকে মোটা বকশিশ দেব। তাই সে আমাকে খুব যত্ন করে খাওয়াত, বোধহয় এক পিস মাছও বেশি দিত। যাই হোক, ছাত্রবৃত্তির টাকা না পেয়ে আমি দেখলুম যে আর মেসের খরচ চালাতে পারব না। কাউকে কিছু না বলে একদিন পাটনা ছেড়ে চলে গেলুম শান্তিনিকেতন ও সেখান থেকে পুরীতে আমার সেজোকাকার বাড়ি। তখন আমার মনে To be or not to be that is the question.

একদিন সত্যি সত্যি খবরের কাগজে দেখলুম প্রতিযোগিতার ফল বেরিয়েছে। আমার নাম সকলের শীর্ষে। কাকার বাড়ীর পাশে ছিলো একটা রেস্তোরাঁ। তার মালিক লালমোহনবাবু ছুটে এলেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে। ধরে নিয়ে গিয়ে দুখানা চপ বিনামূল্যে খাওয়ালেন। এটা তিনি কখনও কারও বেলা করতেন না।

এখন বিলেত যাবার জন্য যা কিছু করণীয় সব কিছুই আমি করলুম। কিন্তু কথা হলো বিলেতে প্রথম তিনমাসের খরচ সরকার অগ্রিম দেবেন না। সেটা আমাকেই খরচ করতে হবে। প্রায় দু'হাজার টাকা লাগবে। বাবা সে টাকা দিতে পারলেন না। সেজোকাকা বললেন—তুমি বিয়ে কর, তাহলে শ্বশুরবাড়ী থেকে এই টাকা পাবে। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমি প্রেমে না পড়ে বিয়ে করব না। কাকাকে সে কথা না বলে শুধু বললুম যে আমি শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাব না। একদিন আমি খুব বিমর্ষ মুখে পুরীর সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি। দেখা হয়ে গেল লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়কের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একজন সাবজজ। তাঁরই এক ছেলের নাম বিজয়ানন্দ ওরফে বিজু। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু যে পত্রিকায় লিখতেন আমিও সেই পত্রিকার লিখতুম। তিনি ব্রাহ্ম আর আমি ব্রাহ্মভাবাপন্ন। তিনি জানতে চাইলেন—বিলেত যাচ্ছি কবে। আমি বললুম—মহা মুশকিলে পড়েছি, দুহাজার টাকা আমার দরকার, কোথাও পাচ্ছি না। তিনি বলেন—আমি তোমায় টাকা দেব। তোমাকে একটা insurance policy করতে হবে। সেটা আমার নামে assign করতে হবে আর আমার কাছে জমা দিতে হবে। তোমাকে দুহাজার টাকা ধার দেব। ডাকঘরে আমার ছেলেমেয়েদের নামে যে-account আছে তার থেকে আমি টাকাটা তুলব। তুমি ডাকঘর যে হারে সুদ দেয় তার চেয়ে একটু বেশী হারে সুদ দেবে। আমার ছোটকাকা

আমাকে তার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন একজন এজেন্ট। তিন হাজার টাকার একটা Policy করলুম সামান্য খরচে। Policy-টা লক্ষ্মীনারায়ণবাবুকে দিলুম। তিনি তাঁর চার ছেলেমেয়ের নামে গচ্ছিত টাকা থেকে পাঁচশো টাকা করে দু'হাজার টাকা আমাকে দেন। আমি সেই টাকা নিয়ে কটক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলুম। জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন একজন বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নামে একটি ড্রাফট দিলেন। তখন আমার অর্থসমস্যা দূর হলো। এদিকে পাটনা থেকে এলো একখানা চিঠি। বাবাজী দাবি করেছে তার বকশিশ। সে যে আমায় খাইয়েছে সে কথা মনে করিয়ে দিল। আমার হাতে যা ছিল তা থেকে যথাসাধ্য বাবাজীকে পাঠালুম। তাতেও সে সন্তুষ্ট নয়। যতদূর মনে পড়ছে, পরে বিলেত থেকে আরও টাকা পাঠাই। সেইভাবে পাটনা কলেজের ঋণশোধ করলুম।

বিলেত গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর ঋণশোধ করার জন্য বাবার কাছে প্রত্যেক তিনমাস অন্তর সরকারি টাকা পাওয়া মাত্র কিছু টাকা পাঠাতুম। সুদের জন্য এত বেশি লাগছে দেখে বাবা এক কাজ করেন। তিনি ঢেঙ্কানালের রাজসরকারের চাকরি করতেন। রাজবাড়িতে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রাজাসাহেবকে অনুরোধ করায় রাজসরকার বিনাসুদে কিছু টাকা ধার দেন। তা দিয়ে বাবা লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর পাওনা শোধ করে দেন। তারপর রাজসরকারের যা পাওনা সেও শোধ দিয়ে দেন। আমার কোনো কষ্ট হয়নি। বিলেতে আমার হাতে যে টাকা বাঁচতো তা দিয়ে আমি ইউরোপ ভ্রমণ করি। দেশ ছাড়ার আগে আমি দেখি ইউরোপ ভ্রমণের জন্য আরো টাকার দরকার। তখনকার দিনে একটা নিয়ম ছিল যে নবনিযুক্ত অফিসাররা লন্ডনে হাই কমিশনারের অফিস থেকে কয়েকমাসের মাইনে আগাম নিতে পারেন ও পরে মাইনে থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ দিতে পারেন। দেশে ফিরে এসে প্রত্যেক মাসে আমার মাইনে থেকে দেড়শো টাকা কাটিয়ে দিতুম। হাতে যে তিনশো টাকা আসতো তার থেকে দেড়শো টাকা পাঠাতুম আমার ছোটভাইকে জার্মানিতে, বাকী দেড়শো টাকায় সংসার চালাতে হতো। সেই প্রথম আমার সংসার চালানোর অভিজ্ঞতা। বাবুর্চি রোজ বাজার খরচার নামে লুঠ করতো। আমি টের পেতুম না। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক আসে। বিয়ে করলে মোটা পণ। আমি এড়িয়ে যেতুম। আমার I. C. S.-এ প্রথম হবার প্রতিজ্ঞার মত আরও একটা প্রতিজ্ঞা ছিলো যে আমি পাঁচবছর চাকরি করে ছেড়ে দেব। তারপর সাহিত্যসাধনা করব আর সাংবাদিকতাই হবে পেশা। আমাকে যে বিয়ে করবে সে I. C. S-কে বিয়ে করবে না—সাহিত্যিককে বিয়ে করবে। তখনকার দিনে সাহিত্য তথা সাংবাদিকতা থেকে সামান্যই আয় হতো। সাহিত্যিককে মেয়ে দিতে রাজী হতেন কজন! তাছাড়া আমার তো ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিলো প্রেমে না পড়ে বিয়ে করব না। আমি ধরে নিয়েছিলুম আমার বিয়ে নিকট ভবিষ্যতে নয়।

এমন সময় ঘটে গেল একটি অঘটন। আমার বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখা হয়ে যায় এক আমেরিকান তরুণীর। তিনি জানতে চান ভারতবর্ষে এসে তিনি কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ভবানী আমার নাম ও ঠিকানা দেয়। বহরমপুরে হঠাৎ একখানা চিঠি পাই। এক মার্কিন মহিলা আমার কাছে জানতে চান ভারতবর্ষে দ্রষ্টব্য কী কী আছে। আমি লিখি মুর্শিদাবাদ নগরে হাজারদুয়ারী অবশ্য দ্রষ্টব্য। আপনি বহরমপুর স্টেশনে নামলে আমি আপনাকে receive করব। ট্রেনের নামও জানাই। তিনি সত্যি সত্যি একদিন সন্ধেবেলা বহরমপুরে পৌঁছান। তাঁর জন্য একটি সার্কিট হাউস ব্যবস্থা ছিল। তবে তিনি খাওয়াদাওয়া করতেন আমার ও বন্ধু দ্বিজেন মজুমদারের সঙ্গে আমাদের বাসায়। সেইসূত্রে

আলাপ তাঁকে আমি হাজারদুয়ারী ও আরও দু/একটা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাই। তাঁকে ফিরতি ট্রেনে তুলে দেবার সময় তাঁকে দু-তিনটি বাংলা শব্দ শেখাই—এটা গাছ, ওটা পাখি ইত্যাদি। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি দুমাসের মধ্যে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। ওঁকে নিয়ে আমি বহরমপুরে ফিরে আসব। আর তিনি আমার ঘরকন্নার ভার নেবেন। ধরে ফেলবেন আমার বাবুর্চি আবু মিয়ার বাজার খরচ লুট। দেড়শো টাকায় সংসার চালানো বাঙালি মেয়ের পক্ষেও সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই খুব কষ্টে চালিয়েছিলেন। পরে আমি বাঁকুড়ায় বদলি হই। ততদিনে আমার অবস্থা একটু স্বচ্ছল হয়েছে। ধারের টাকা শোধ হয়েছে, কিন্তু ভাইয়ের জন্য তখনও টাকা দিতে হচ্ছে। তখন রান্না করেন আমার গৃহিণী স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করার জন্য হিন্দু কাজের লোক পাওয়া যায় না। কারণ তিনি খ্রিস্টান ও শ্বেতাঙ্গিনী। কাজ করতে আসে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। তার নাম সাবধান বিবি। তিনি বাংলা শিখে নেন তাঁর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। তাঁকে বাংলা শেখানোর সময় আমার ছিল না। এরপর আমি বদলি হই নওগাঁয়। সেখানেও তাঁকে স্বহস্তে রান্না করতে হতো, তাঁকে রান্নায় সাহায্য করত এক যুবক—নাম সুখলাল। তাকে আমার কাছে হাজির করা হয়েছিল গাঁজা সোসাইটি থেকে, আমি ছিলুম যার Vice-Chairman। বছর দুয়েক পরে নওগাঁ থেকে যখন বদলি হই তখন জানতে পারি সুখলাল মুসলমান। লীলা আমেরিকায় থাকতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন ও পিয়ানো বাদনকে নিজের জীবিকা বলে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁকে রান্নাবান্নার কাজে লাগিয়ে দিতে আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না। তাঁর Grand Pianoটি তিনি আমেরিকা থেকে থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেটি ঘর জুড়ে থাকত। রোজ দুপুরবেলা তিনি বাজাতেন। সেই সময় আমি আদালতে, তাই বাজনা শোনার সুযোগ আমার ঘটত না। আমাদের অবস্থা পরে আরও স্বচ্ছল হলে তাঁকে আর রান্নাবান্না করতে হয় না। কিন্তু ছেলে মানুষ করতে হয়। পাঁচবছর বাদে আমার চাকরি ছেড়ে দেবার কথা। ততদিনে আমাদের দুই পুত্রসন্তান হয়েছে। বিয়ের সময় তাঁকে বলেছিলুম—'তোমাকে বাংলা শিখে নিয়ে আমার সন্তানদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হবে। ইংরেজী বলা চলবে না।' তিনি তাদের সঙ্গে ভুলেও একটি ইংরেজী কথা বলতেন না। যা কিছু শেখাতেন তা বাংলা বই থেকে। তাদের আমরা ইংরেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছি দেখে বন্ধুবান্ধব সকলে আমাদের দোষ দেয়। কিন্তু আমরাই চাই যে ওরা বাঙালি সমাজে বাঙালি বলে গৃহীত হোক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে নয়। এর জন্য লীলাকে বিস্তর বই পড়তে হয়েছে। পড়তে পড়তে তিনি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। নিজেও একটু আধটু বাংলা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর একটি বাংলা কবিতার বই তাঁর প্রয়াণের পরে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর বাংলায় অনুবাদ করা স্প্যানিশ ও অন্যান্য ভাষার কবিতার বই প্রকাশের অপেক্ষায়। তিনি সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হয়েছিলেন—গাত্রবর্ণ বাদে। আমার সঙ্গে বিবাহ না হলে তাঁর দেশে ফিরে গিয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করার কথা। ইতিমধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান। তার জন্য তিনি বোম্বাইতে ভাতখণ্ডের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌতেও যেতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেখানকার সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে। এমন সময় আমি বহরমপুর থেকে কলকাতায় আসি। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। আমি প্রস্তাব করি যেন তিনি লক্ষ্ণৌ যাবার আগে একবার রাঁচি যান। সেখানে আমার বন্ধু শরৎ মুখোপাধ্যায় থাকতেন। আমি যাচ্ছিলুম পুজোর ছুটি কাটাতে। তিনি সম্মত হন ও সত্যি সত্যি রাঁচি যান। তার পরের দিন বুঝতে পারি যে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা

না বলে তাঁর সামনেই আমি শরৎকে বলে বসি যে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। বিয়ের প্রস্তাবে তখনও সম্মতিই পেলুম না, অথচ জানিয়ে দিলুম বিয়ে করতে যাচ্ছি। তিনি রাজী হয়ে যাবেন একথা ভাবতেই পারিনি। যাই হোক, এই স্থির হলো যে তিনি এক মাস থেকে যাবেন ও রেজিস্ট্রারের কাছে বিয়ের নোটিশ দেবেন। আর আমি বহরমপুর ফিরে গিয়ে ছুটি নিয়ে রাঁচীতে এসে বিয়ে করব। প্রায় মাসখানেক দেরী। তখনকার নিয়মানুসারে একমাস নোটিশ দিতে হতো। আমাদের বিয়েটা হবার কথা নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বা তার পরে। হঠাৎ শরতের টেলিগ্রাম পেয়ে শশব্যস্ত হয়ে দিন পনের আগে রাঁচি গিয়ে হাজির হই। শরৎ বলে—'যদি তুমি বিয়ে করতে চাও তো তিনদিনের মধ্যে বিয়ে কর, নয় অ্যামেরিকার কনসাল জেনারেল কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের সাহায্যে ভার্জিনিয়াকে ভারত থেকে ডিপোর্ট করবেন। টেগার্টের লোক ঘোরাফেরা করছে।' আমি তো আকাশ থেকে পড়ি! তিনদিনের মধ্যে বিয়ে! কোন মতে? শরৎ বলে খ্রিস্টান ম্যারেজ অ্যাক্টের একটি ধারায় একজন খ্রিস্টান একজন অখ্রিস্টানকে বিয়ে করতে পারে। আমাতে খ্রিস্টান হতে হবে না। ভার্জিনিয়া নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন। তিনদিনের নোটিশ যথেষ্ট। এই বিবাহের রেজিস্ট্রার ছিলেন একজন জার্মান পাদ্রী। তিনি বেঁকে বসলেন। অখ্রিস্টানের সঙ্গে রেজিস্ট্রার বিয়ে তিনি রেজিস্ট্রি করাতে পারবেন না। শরৎ তাঁকে শাসায়—'এটা আপনার ডিউটি। না করলে আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব। তাছাড়া আপনার তো একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে। আমি তার অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার। আপনাকে আমি কোনরকম সাহায্য করব না।' পাদ্রীসাহেব রাজী হয়ে যান। বলেন—বিয়ের সভায় শপথবাক্য পাঠের পর আমি একটা Sermon দেব। শরৎ রাজী হয়ে যান। পাদ্রীসাহেবের Sermon শেষ হবার পর শরতের ব্যবস্থাপনায় ব্রাহ্মসমাজের এক আচার্য ভাষণ দেন। বিবাহসভায় রাঁচীর বহু গণ্যমান্য স্থানীয় ভদ্রজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী। তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করেন। দুঃখের বিষয় ঐ বিবাহের সময় আমার কোনো গুরুজন উপস্থিত ছিলেন না। বাবাকে জানিয়েছিলুম ভার্জিনিয়াকে বিবাহের কথা। তিনি আমাকে আগেই বলে রেখেছিলেন যে আমি স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারি। তাঁর এতে আপত্তি করার কথা নয়। কিন্তু খ্রিস্টান ও আমেরিকান শুনে তিনি পিছিয়ে যান। আমি কথা দিয়েছি—আমি তো পিছিয়ে যেতে পারি না। আমি কথা রাখি। বিয়ের পর ভার্জিনিয়ার নাম হয়ে যায় 'লীলা'—বৈষ্ণবদের প্রথায়। আমার বাবা একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, বিপত্নীক। বিয়ের পর যখন ওঁকে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি তাঁর লীলা নাম শুনে, বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ী, সিঁদুর দেখে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু লীলার বাবা-মা এই বিবাহকে স্বীকার করেননি। লীলাকে ত্যাজ্য কন্যা করেন। লীলা আমাকে সুখী করার জন্য সারাজীবন দুঃখ পেয়ে গেলেন। বিয়ের পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি দেশে ফিরে যান। তার আটত্রিশ বছর পরে আবার যখন যান তখন বাবাকে আর দেখতে পান না। মা মৃত্যুশয্যায়। মেয়েকে দেখে তিনি চিনতেই পারেননি। বলেন—'তোমার মতো আমার একটি মেয়ে ছিল। সে যে কোথায় আছে এখন তা জানি না।' লীলা তার বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা, আদরের দুলালী ছিল। তার সংকটটা ছিলো দক্ষকন্যা সতীর মতো—পিতা বড় না পতি বড়। বিবাহের পর পতিই বড়। এর জন্য লীলাকে সতীর মত দেহত্যাগ করতে না হলেও বাবা মায়ের স্নেহ ত্যাগ করতে হয়। তার তুলনায় আমায় কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি। তাঁর কাছে আমি ঋণীই রয়ে গেলাম—প্রেমের ঋণে ঋণী।

সেই আগুন দেখতে পাই

আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে দিনটির কথা মনে পড়ে, তা কোনো সুখের স্মৃতি নয়। সে ঘটনা আজও আমার মনে দুঃখের ছবি হয়ে বেঁচে আছে।

ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার বয়স দশ বছর। আমাদের মাটির বাড়িতে ছিল খড়ের চাল। তিন-চারটে ঘরের লাগোয়া গোয়ালে কয়েকটা গরুও ছিল। একটা ছোট্ট ঘরে আমি তৈরি করেছিলুম আমার জীবনের প্রথম লাইব্রেরি। আমার সংগ্রহে ছিল কৃত্তিবাস, বঙ্কিমচন্দ্র, শেক্সপীয়রসহ বহু প্রাচীন কবি ও লেখকের রচনাবলী। এছাড়া বাড়ির সকলের যাবতীয় বইপত্র রাখতুম আমার প্রাণতুল্য ঐ লাইব্রেরিতে।

বই পড়ে হেসে খেলে কাটছিল বালক 'আমি'র নানা রঙের দিনগুলো। অবশেষে এলো সেই ভয়ঙ্কর রাত। অন্যান্য দিনের মতো সেই রাতেও খাবারদাবারের পাট চুকিয়ে বিছানায় গেছি। শীতের রাত, সম্ভবত ডিসেম্বর মাস। আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে আমি আর আমার পিসতুতো ভাই লেপমুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়েছি। ঐ ঘরেই, খাটে শুয়েছেন আমার এক দূর-সম্পর্কের কাকা।

দু'ভাই লেপের তলায় শুয়ে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভাঙল 'আগুন আগুন' চিৎকারে। কাকা খাটের ওপর থেকে চিৎকার করছেন। ঘুম চোখে দেখি, খড়ের চালে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ক্রমশ সে আগুন ছড়িয়ে গেল। ঘুমের ঘোর কাটতেই বুঝলাম ঘর পুড়ছে। ঘরে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। বিপদের গুরুত্ব বুঝেই, দে ছুট। ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেলুম। ঐ শীতের রাতে সম্বল কেবল একটা খাটো ধুতি। গায়ে কিছু নেই। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে দেখলুম, আগ্রাসী আগুন একে একে আমাদের প্রত্যেকটা ঘর পুড়িয়ে দিল। চাল ভেঙে পড়ল। বুঝলুম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কতটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। ওখানে থাকলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

খবর পেয়ে পড়শীরা ছুটে এলো। আমাদের সকলকেই আশ্রয় ও জামাকাপড় দিল। আমি অবাক বিস্ময়ে সেই তাণ্ডব দেখছিলুম।

আগুনের গ্রাস থেকে আমাদের পরিবারের সমস্ত মানুষজন রক্ষা পেলেও রক্ষা পায়নি গোয়ালে বাঁধা গরুগুলো। পরদিন সকালে দেখা গেল গোয়ালে গরুগুলো ঠিকই শুয়ে আছে, তবে তাদের দেহ ছাই হয়ে গেছে।

আর আমার বুকের পাঁজর, আমার সেই বয়সের সমস্ত সঞ্চয়, আমার প্রিয় লাইব্রেরির একটা বইও আস্ত নেই। সব ছাই হয়ে গেছে। শেক্সপীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র কারোর কোন চিহ্নই নেই। দুঃখে আমার বুক ভেঙে গেল।

এরপর আমাদের সেই পুড়ে যাওয়া মাটির বাড়ির বদলে সুন্দর পাকাবাড়ি হলো। আবার আমার লাইব্রেরিও হলো। কিন্তু ঐ মাটির ঘরের ছোট্ট লাইব্রেরিটার কথা আমি ভুলতে পারি না।

পুরোন দিনের কথা ভাবতে বসলে আজও আমি সেই আগুন দেখতে পাই।

পূজাস্মৃতি

বাংলা দেশে যে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তা একই কালে পঞ্চদেবতার পূজা। এঁরা হলেন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক। পূজাবেদীর উপরে দেবদেবীর সঙ্গে তাঁদের বাহনগুলিও থাকে। দুর্গার বিপরীতে থাকে এক অসুর যাকে তিনি বধ করছেন অথচ যে তখনও জীবিত। এটা এক যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। দুর্গা দেবীর দশ ভুজে দশ প্রকার অস্ত্র। চণ্ডীপাঠের সময় তাঁকে নারায়ণী বলেও নমস্কার করা হয়। বৈষ্ণবরা তাঁকে বৈষ্ণবী মনে করতে পারেন। তিনি সর্বভূতে নানা রূপে সংস্থিতা। সুতরাং বৈদান্তিকরাও তাঁকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম মনে করতে পারেন। বাংলা দেশের এই যে দুর্গাপূজা এর মধ্যে একটা সমন্বয়ের ভাব আছে। এরকমটি আর কোনওখানে নেই। তবে বাংলার বাইরে যেখানেই বাঙালিরা গেছেন সেইখানেই এই ধরনের দুর্গাপূজা তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গেছেন। অনেকেই জানেন না যে এই দুর্গাপূজা বসন্তকালেও অনুষ্ঠিত হয়। তখন একে বলা হয় বাসন্তী পূজা। আমি যতদূর জানি, বাসন্তী পূজা রূপেই এর আরম্ভ। সত্যযুগে সুরথ রাজা এর প্রবর্তন করেছিলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে এর অকাল বোধন করেন। এ সব অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্য বলে গণ্য হতে পারে না, তবে বহু লোক বিশ্বাস করে।

আমার পূর্বপুরুষ তোডরমলের সঙ্গে আকবরের আদেশে নবগঠিত সুবা ওড়িশা জরিপ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে জাহাঙ্গির তাঁকে একটি লাখেরাজ তালুক দান করেন। তার মানে তালুক ভোগের জন্য খাজনা দিতে হয় না। তালুকটির অবস্থান সেকালের ওড়িশায়। মেদিনীপুরের একাংশও তখন সেই সুবার অন্তর্গত ছিল। এই তালুকদার বংশটিকে বলা হত মহাশয় বংশ। কালক্রমে তালুকটি পাঁচ-ছয়টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। জাকপুর শাখাটি এখন মেদিনীপুরে পড়েছে। লক্ষ্মণনাথ, দেহুরদা, কাউপুর ও রামেশ্বরপুর পড়েছে বালেশ্বর জেলায়। সম্প্রতি বালেশ্বর জেলাও বিভক্ত হয়েছে। ভদ্রক মহকুমা হয়েছে এখন ভদ্রক জেলা। রামেশ্বরপুর পড়েছে এখন ভদ্রক জেলায়। এই রামেশ্বরপুরেই আমার পিতামহের জন্ম। আমরা পুরুষানুক্রমে রামেশ্বরপুরের মহাশয়। অন্তত দু'শ বছর আমরা বাঙালি মতে শরৎকালে দুর্গাপূজা করে আসছি, এখনও করি। কিন্তু পিতামহ তাঁর শরিকদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে সপরিবার দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। তখন থেকে তিনি ও তাঁর পরিবারের কেউ রামেশ্বরপুরে যান না।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার। আমার বছর চারেক বয়সে আমার ঠাকুমা জাজপুরে তাঁর বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অদূরবর্তী রামেশ্বরপুরে শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুজো দেখতে যান।

আমাকেও নিয়ে যান তাঁর সঙ্গে। এ রকম পূজা আর কোথাও দেখিনি। তাই মূর্তিগুলি দেখে অভিভূত হয়েছিলুম। এক সময় দেখি, বাড়ির মহিলারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে আটক করে দরজায় শিকল তুলে দেন। সেই ঘরে আমি একা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হঠাৎ শুনি, বাইরে ঢাকঢোল বাজছে, সঙ্গে কাঁসি। ভীষণ হট্টগোল। তা সত্ত্বেও আমার কানে আসে একটি

ছাগকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। ছাগটিকে আমি চক্ষে দেখিনি। সে যে কেমন করে কোনখান থেকে এল তা-ও আমি জানিনে। গণ্ডগোল যখন থামল তখন দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমি ঘর থেকে বাইরে পা দিয়ে দেখি, পূজা প্রাঙ্গণে রক্ত থিকথিক করছে। এক জায়গায় একটি ছাগমুণ্ড পড়ে রয়েছে, আর এক দিকে ছাগদেহ। যত দূর মনে পড়ে, সেই রক্ত কেউ কেউ গায়ে মাখছে, কারও কারও মুখে উল্লাস। একেই নাকি বলে বলিদান। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। পূজার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

তখন থেকে আনন্দময়ীর আগমন আমার কাছে আনন্দদায়ক নয়। এ রকম পূজা দেখতে আমি আর কখনও রামেশ্বরপুরে বা অন্য কোথাও যাইনি। তবে একবার পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলুম কটকের একটি গ্রামে। সেটা ছিল বসন্তকাল। পাশের গ্রামে আমি বাসন্তী পূজা দেখেছি। কিন্তু বলিদানের সময় নয়। বাসন্তী পূজাতেও তেমনই একই রকম চালচিত্র, একই রকম পঞ্চদেবতা মায় তাদের বাহন এবং অসুর। কিন্তু বাসন্তী পূজা অত্যন্ত বিরল। দুর্গাপূজা বলতে আমরা সকলেই বুঝি শারদীয়া পূজা। আমার শৈশবে বারোয়ারি পূজা ছিল না। যেটা ছিল সেটা জমিদার-তালুকদারদের পারিবারিক পূজা। বারোয়ারি পূজা আজকাল ওড়িশাতেও ছড়িয়েছে বলে শুনতে পাই।

আমার জন্মস্থান ঢেঙ্কানাল। রাজ সরকারে চাকুরি সূত্রে আমার বাবার সেখানে অবস্থান। আমার ঠাকুরদা ঠাকুমাও আমার বাবার সঙ্গে থাকতেন। কাকারাও সেখান থেকে পড়াশোনা করতেন। আমাদের ঢেঙ্কানালের পারিবারিক দুর্গাপূজা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনের। একটি জলচৌকির উপরে আসন পেতে প্রতিমা ও পটের পরিবর্তে দেবী দুর্গার প্রতীক একটি তলোয়ার খাপ থেকে বার করে রাখা হত। সেটি আমাদের পারিবারিক উত্তরাধিকার। তার সামনে রাখা হত সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথিপত্র। এবং একটি ইংরেজি শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলি। সেটা বোধ হয় আমার কাকাদের সংযোজন। দেবীর কাছে তাঁরা বরপ্রার্থী হতেন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য। বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে শেক্সপীয়র থেকে বাছা বাছা কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয়ও দেখেছি। অভিনয়ে থাকতেন ছোটকাকা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা।

আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজায় বলিদান হত না, আমিষ ভোগ হত না। তবে বিজয়ার দিন সিদ্ধি পান করা হত। আমাকে একবার বড় কাকিমা জোর করে সিদ্ধি খাইয়ে দেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম যখন ভাঙে তখন রাজাসাহেবের দশহরার উৎসব দেখার সুযোগ পাইনে। খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। রাজাসাহেবের এক দুর্গামন্দির ছিল। সেই মন্দিরে বারোমাস ধাতুনির্মিত দেবী প্রতিমার সেবাপূজা হত। মাটির প্রতিমা তৈরি করে তিনদিনের পর সেই প্রতিমার বিসর্জন ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বাইরের লোক দেবীকে দেখতেই পেত না। ভিতরে যাওয়া ছিল সর্বসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। অপর পক্ষে সকলেই যেতে পারত বলরাম মন্দিরে, দেখতে পেত জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে। রথযাত্রা ছিল সর্বসাধারণের উৎসব। এটাই মোটের উপর ছিল দেশীয় রাজ্যের প্রথা। রাজাসাহেবেরা দশহরার দিন সকালবেলা মিছিল করে বের হতেন যুদ্ধযাত্রায়। দু-তিন ক্রোশ দূরে একটা খোলা ময়দানে হত যুদ্ধের মহড়া। পাইকরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে যোগ দিত। আমি কখনও সেখানে যাইনি। দু-একটা মিছিল দূর থেকে দেখেছি।

দশহরার বিকেলবেলা রাজাসাহেব বসতেন তাঁর অমাত্যদের নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এক শামিয়ানার নীচে। আমলাদের সঙ্গে তাদের ছেলেরাও থাকত। সেই সূত্রে আমিও রাজাসাহেবের

সামনে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-কৌতুক দেখতে যেতুম। একটা চর্বিমাখানো গোলাকার কাঠের থামের উপর মাথা নিচু ও পা উঁচু করে ডগায় ওঠার কসরত দেখানো হত। কিন্তু পারবে কেন? মাটির উপর গড়িয়ে পড়ত আর সবাইকে হাসির খোরাক জোগাত। একটা গামলায় রাখা হত এক গাদা ময়দা। ময়দার তলায় থাকত একটা সিকি বা দো-আনি। ময়দায় মুখ ঢুকিয়ে তুলে আনতে বলা হত সেই লুকানো সিকি বা দো-আনিটা। যারা মুখ ঢোকাত তাদের মুখ হয়ে যেত সাদা, ভূতের মতো। এ ছাড়া আর একটা খেলা ছিল গাধার দৌড়। পুরস্কার দেওয়া হত সবচেয়ে পেছিয়ে পড়া গাধাটাকে, মানে তার মালিককে। কারণ তার গাধা ছিল গাধাদের মধ্যে সবচেয়ে গাধা। রাজাসাহেব খেলোয়াড়দের পুরস্কার দিতেন।

ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ বাবা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। আমরা শাক্ত থেকে বৈষ্ণব হয়ে যাই। বছর পাঁচেক পরে রাজাসাহেবেরও মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা ও ক্রীড়া-কৌতুকও বন্ধ হয়ে যায়। যুবরাজ ছিলেন নাবালক।

আমাদের বাড়িতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ছিল না, ছিল কবিকঙ্কণের চণ্ডী। মহিষাসুর বধ সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজার সঙ্গে দেবীর ভয়ঙ্কর মূর্তির কোনও সম্পর্ক ছিল না। কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান দুটি আমার এত ভাল লাগত যে আমি একা একা পড়তুম, পরে আমাকে পাঠ করে শোনাতে হত। শুনতেন মা-ঠাকুমা-কাকিমা প্রভৃতি মহিলারা। তখনকার দিনে কবিতা পাঠ করা হত সুর করে। আমি যেই সুর করে পড়তুম একটি পঙ্‌ক্তি অমনই সুর করে ধুয়া ধরতেন মহিলারা। এই যেমন আমি পড়লুম, 'ঈশানে উড়িল মেঘ 'করে দূর দূর রে'। অমনই ওঁরা গেয়ে উঠলেন, 'হায় রে নায় রে নায় রে।' ওঁরা আশঙ্কা করছেন যে একটা কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। এমনই আরও অনেক অংশের বর্ণনা শুনে ওঁরা কখনও বলে উঠতেন, 'মায়ের মহিমা' কিংবা 'কেমন দুর্গার নাম'। একবার নয়, পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি, বার বার। তেমনই আর একটি ধুয়া ছিল। সেটি শ্রীমন্তের ঘোর বিপদের সময়। 'তুমি না রক্ষিলে কে বা রক্ষিবে তারিণী।' দেবীর তারিণী রূপটি সেই উপাখ্যান দু'টির উপজীব্য। অসুরের হাত থেকে নয়, প্রকৃতি কিংবা মানুষের হাত থেকে। তবে দেবী ছলনাময়ীও ছিলেন। তিনি কমলেকামিনী সেজে হাতি গিলতেন ও উগরে ফেলতেন। ধনপতি সওদাগর সিংহলের রাজাকে এই দৃশ্যের বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজাকে দেখাতে না পেরে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীমন্তও এই রূপ দেখে একই প্রকার বর্ণনা দিয়েছিল। সে-ও রাজাকে সেই রূপ দেখাতে পারেনি। রাজা তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু দেবী তাকে রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহও দেন। মাঝখান থেকে ধনপতিও কারামুক্ত হন। সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তার আগে থাকত একটা কী হয় কী হয় ভাব। ছেলেটা বাঁচবে তো? 'তুমি না রক্ষিলে কে বা রক্ষিবে তারিণী।' আমার সুর করে চণ্ডীপাঠ বোধ হয় ঠাকুরদার মৃত্যুর পরেও কিছু দিন অব্যাহত ছিল।

ঠাকুমা বড় কাকার কর্মস্থলে চলে যাওয়ার পর আর কারও চণ্ডীপাঠ শোনার তাগিদ রইল না। অনেক দিন পর্যন্ত একা একাই আমি কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করেছি। তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। আমার দশ বছর বয়সে এক দিন মাঝরাতে আগুন লেগে আমাদের বাড়ি পুড়ে যায়। সেই সঙ্গে ভস্ম হয় আমার বাবার সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় গ্রন্থ। সেগুলি পরে আর সংগ্রহ করা হয় না। হ্যাঁ, তার মধ্যে শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলিও ছিল।

পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণব প্রভাব, ব্রাহ্ম প্রভাব ও খ্রিস্টান প্রভাব আমাকে এক এক করে সব

রকম পুজো-পার্বণ থেকে সরিয়ে রাখে। এমনকি কিছুদিন আমি ঈশ্বর বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছি। আরও পরে আমি নিমন্ত্রণ পেলে পুজো-পার্বণ দেখতে যাই, কিন্তু উদ্বোধন করতে নয়। একবার খুব বিপদে পড়ে গেলুম। যাঁরা আমাকে একটি বহুতল ভবন উদঘাটন করার জন্য নিয়ে গেছলেন তাঁরা আমাকে চমকে দিয়ে বলেন দুর্গাপূজা উদ্বোধন করতে। বিপদে পড়ি আমি। 'তুমি না রক্ষিলে কে বা রক্ষিবে তারিণী।' আমার হয়ে তুমি উদ্বোধন করো, আমি বলি আমার সহধর্মিণীকে। তাঁর ধর্মমত হিন্দু ধর্মমত নয়। তবে তিনি আচারে আচরণে হিন্দুর মতো। সবাই তাঁকে অনুরোধ করলেন উদ্বোধন করতে। তিনি অগত্যা তাই করেন। আরও একবার এ রকম ঘটনা ঘটেছিল। সে দিন থেকে আমি আর উদ্বোধনের ডাক শুনে সাড়া দিই না। তবে পূজা দেখতে যাই ও দেখে খুশি হই যে বলিদান আর হয় না। শাক্তদের মধ্যেও বলিদানের উপর একটা বিরাগ এসে গেছে। কিন্তু কোনও কোনও বনেদি বাড়িতে এখনও প্রথা রক্ষার নামে বলিদান হয়। যোধপুর পার্কে আমার এক প্রতিবেশী তাঁর বাড়ির ভিতরে, অপরের অগোচরে, বলিদান করতেন। কিন্তু ছাগকণ্ঠের আর্তনাদ আমার কর্ণগোচর হত। আমি আমার মনের দুঃখ তাঁকে জানাই। তিনি বলেন, এটা তাঁদের বংশের দু'শ বছরের পুরনো প্রথা। শরণার্থী হয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসার পরেও তাঁরা সে প্রথা ছাড়তে পারেননি। পারতেনও না। কিন্তু আমার যোধপুর পার্ক ছেড়ে আসার আগে একবার ছাগকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে না পেয়ে আমি জানতে চাই, ব্যাপার কী! তিনি বলেন, সর্ব সুলক্ষণযুক্ত ছাগল আর কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। যে কোনও ছাগলকে বলি দিলে দেবী অপ্রসন্ন হবেন। তাই বলিদান প্রথা বন্ধ হল, আর বলিদান হবে না। যাক, এই অন্তঃপরিবর্তনটাই আমি চেয়েছিলুম। তুমি শাক্ত হতে চাও, হতে পারো, কিন্তু নিরীহ ছাগলের উপর শক্তির পরীক্ষা দিতে যাও কেন?

এর আগে থেকেই অনেক জায়গায় পশুবলির পরিবর্তে চালকুমড়ো, শশা ইত্যাদি ফল বলি প্রবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথাভঙ্গ হয়নি, পদ্ধতি বদল হয়েছে। আজকাল আমি অনাহূত ভাবেও প্রতিমাদর্শন করতে যাই।

বাঙালির শিল্পী প্রতিভা প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে বিভিন্ন মণ্ডপে। কিছু দিন পরে আমরা স্যাটেলাইটেও দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকের মূর্তি দর্শন করতে পারব বাহন সমেত। তবে অসুরের কী দশা হবে জানিনে। সে কি হবে স্যাটেলাইট অব স্যাটেলাইট! বিজ্ঞানের কল্যাণে সমস্তই সম্ভব। আর বাঙালি কারিগরদের কর্মকুশলিতায়। কারিগর সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর এদের কর্মকুশলিতাকেও। সেই জন্য আমি এখন মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসী হলেও শিল্পরক্ষায় ও শিল্পীরক্ষায় বিশ্বাসী।

আজকাল বারোয়ারি পূজার সঙ্গে আরও কয়েকটি শিল্পেরও সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। গান-বাজনা, নাট্যাভিনয়, আলোকসজ্জা, শোলার কাজ, বাঁশের কাজ ইত্যাদি। এক কথায় বলা যেতে পারে শারদীয়া পূজা এখন পশ্চিমবঙ্গের গণ-উৎসব। তাতে অহিন্দুদেরও অংশ আছে।

আমি আজকাল বালিগঞ্জের যে বাড়িতে থাকি তার পাশের বাড়িতে এক দিন গণভোজও হয়। আমিও যোগ দিই। সকলের সঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজনে যে আনন্দ আমি বৈষ্ণবদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে পেয়েছি সেই আনন্দই আমি এই বয়সে আবার শাক্তদের সঙ্গে ভোজ খেয়ে পাই। পার্বণ না বলে উৎসব বললে ভাল হয়। হিন্দু-অহিন্দুর কোনও বাছবিচার নেই। তবে এখন পর্যন্ত কোনও গণভোজেই আমি এই উদারতা দেখতে পাইনি। কিন্তু আশা করি এক দিন এটাও

দেখতে পাব।

ছেলেবেলায় বিসর্জনের পারে আমাদের পা ঢেকে বসতে হত। পুরোহিত এসে শান্তিজল দিতেন। আর একটি প্রথা ছিল বলে মনে পড়ছে। একটি বেলপাতার উপরে নিজের নাম লিখতে হত। সে সব প্রথা এখনও আছে কি না জানিনে। তবে সপ্তমী অষ্টমী নবমীর দিন পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রথা এখনও প্রচলিত। এবং এটাই ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে ভাল লাগে। আমারও ভাল লাগত। একটা শ্লোক আমার আংশিক মনে আছে। 'সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে'... ...'শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী' এই দুটি টুকরোর জোড়া দেওয়ার ভার পাঠক-পাঠিকার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

সাত বছর বয়সের পর পঁচাশি বছর কেটে গেছে। স্মৃতিভ্রংশ স্বাভাবিক। আর একটি প্রথা তখনও ছিল, এখনও আছে ও চিরকাল থাকা উচিত। সেটি হচ্ছে সকলের সঙ্গে সকলের কোলাকুলি। বয়স নির্বিশেষে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নয়। এই কোলাকুলি প্রথাটি মুসলমানদের মধ্যে আছে। ঈদের সময় তারা কোলাকুলি করে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। দশহরার দিন অবাঙালির মধ্যে আমি কোলাকুলি দেখিনি। কিন্তু দশহরার গ্রিটিংসের কার্ড ভারতের নানা স্থান থেকে পেয়েছি। দশহরাটা ভারতের হিন্দুদের সর্ব অঞ্চলের প্রথা। প্রাচীনকালে দশহরার দিন রাজারা বেরোতেন দিগ্বিজয়ে। এই প্রথা প্রাচীন যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের অন্বয় রক্ষা করছে, যদিও আজকাল দিগ্বিজয় করার মতো দিক নেই। তবে আমরা সাহিত্যিকরা কলম দিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় জয় করার জন্য পূজার আগে থেকেই বেরিয়ে পড়ি। পূজা সংখ্যাগুলি আমাদের বাহন।

আদিপর্ব

বাঙালি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি বাঙালি হিন্দু। তাই বাঙালি সংস্কৃতি বলতে বুঝি বাঙালি-হিন্দু সংস্কৃতি। আমাদের মনে থাকে না যে, বাঙলা সাহিত্যে সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন চর্যাপদগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা বৌদ্ধ সাধক। বাঙলা সাহিত্যের আদিপর্ব ছিল পালযুগে বৌদ্ধগীতি। অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে যান বাঙলা থেকে তিব্বতে। সন্ধান করলে তিব্বতেও বাঙালি বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যাবে। নেপালে তো পাওয়া গেছেই। চর্যাপদ নেপাল থেকে পাওয়া। সাহিত্য সংগীতের মত ভাস্কর্যও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নওগাঁ মহকুমায় কর্তব্যরত অবস্থায় আমি পায়ে হেঁটে নিয়ামতপুর থানার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। সেখানে পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখেছি অজস্র পাথরের মূর্তি। সমস্তই পাল যুগের। আর বেশির ভাগই বৌদ্ধ। পরে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় দেখেছি আরও অনেক প্রাচীন মূর্তি ; প্রায় সমস্তই পাল আমলের ও বেশির ভাগই বৌদ্ধ। দেবদেবী বা বোধিসত্ত্বের আর একটি সংগ্রহশালা ঢাকার মিউজিয়াম এবং আরও বড় কলকাতার ভারতীয় যাদুঘর। এসব স্থানে সংরক্ষিত হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শন। কুমিল্লায় নিযুক্ত থাকার সময় আমি ময়নামতী দেখতে যাইনি। সেটা আমার জীবনে মস্ত বড় একটা আফসোস। বার্লিনের ডঃ গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য সেখানকার যাদুঘরের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষ। তিনি ময়নামতী ঘুরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন সেকালে গোটা চট্টগ্রাম বিভাগটা ছিল বৌদ্ধদের রাজ্য। সেখানে প্রচুর বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। ময়নামতীতে সংগ্রহশালা রয়েছে। সেখানে উৎখনন করে উদ্ধার করা গেছে এক বিশাল ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। এতবড় ব্রোঞ্জ মূর্তি নাকি ভারতের কোথাও নেই। তাঁর মতে এই মূর্তির দাম হবে ষাট থেকে সত্তর লক্ষ মার্কিন ডলার। ইতিমধ্যে চল্লিশ/পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রাকার বৌদ্ধমূর্তি নাকি ডাকাতেরা নিয়ে গেছে। সম্ভবত তারা এই মূর্তিগুলি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সমুদ্রপথে আমেরিকায় পাচার করে দিয়েছে। এইভাবে যদি মূর্তি চুরি ও পাচার চলে, তবে বাঙালি সংস্কৃতির সন্ধানে আমাদেরকে আমেরিকার বিভিন্ন যাদুঘরে যেতে হবে। যেমন পুঁথিপত্রের সন্ধানে যেতে হচ্ছে তিব্বতে ও নেপালে। বাঙালি সংস্কৃতি একটি প্রাচীন ও মিশ্র সংস্কৃতি। এর অনেকখানি বৌদ্ধ। বিশ্বভারতীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে আমি অনুরোধ করেছিলুম আমাদের বৌদ্ধযুগের একখানি ইতিহাস লিখতে। তিনি সেটা লিখে যেতে পারেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যে ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করেন তাতে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁর বাড়ি ও লাইব্রেরি যেন বিশ্বভারতীকে দান করা হয়। বিনিময়ে তিনি আশা করেন যে, বিশ্বভারতী প্রাচীন বাঙলার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশ করবে। বাঙালি সংস্কৃতি বহু পরিমাণে নির্ভর করবে প্রবোধচন্দ্রের ইচ্ছাপূরণের ওপর। আরও অর্থের প্রয়োজন হলে আরও অর্থ পাওয়া যাবে। পশ্চিমবাঙলায় বাংলা আকাদেমি আছে কী করতে! কিন্তু অর্থের চাইতে আরও বেশি দরকার নিষ্ঠাবান কর্মীর। তাঁরা সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গবেষণা করবেন। তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানবেন। বিশ্ববাসীও আরও বেশি অবহিত হবেন।

অনুলিখন : সুচরিতা ব্যানার্জি

আমাদের নববর্ষ

১বৈশাখ বাঙালির নববর্ষের প্রথম দিন। যাঁরা ব্যবসা করেন, সে যে কোন ব্যবসাই হোক, মূলত এই দিনটি তাঁদেরই। তাঁরা রাত থাকতে উঠে স্নানটান সেরে নতুন আদ্দির পাঞ্জাবি কাপড় পরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পুজো দেন। নতুন হালখাতা খোলেন। তাতে টাকার ছাপ দেন। মন্ত্রপূত ফুল সেই খাতার সঙ্গে নিয়ে ব্যবসাস্থলে ফেরেন। নতুন খাতায় নতুন বছরের আর্থিক পাওনাগণ্ডার হিসেব নতুন করে নথিভুক্ত হবে। বিকেলে ফুল পাতায় ব্যবসাস্থল সাজিয়ে তাঁরা বসবেন। বিগত বছরের খদ্দেররা আসবেন। পাওনাগণ্ডা মেটাবেন। মিষ্টান্ন পরিবেশিত হবে পরিবর্তে। এমন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমার যোগাযোগ পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। পুস্তক ব্যবসায়ী অর্থাৎ প্রকাশক। তাঁরা আমাকে তাঁদের যাঁর যাঁর অফিসে বিকেলবেলা উপস্থিত হতে নিমন্ত্রণ করেন। শুধু আমাকে নয়, গ্রন্থকারদের সকলকেই সেখানে যথাযোগ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। যা মিষ্টান্নের চাইতেও মধুর তা হয়ত একখানি চেক বা কিছু নগদ টাকা। এটা এখন একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতিবারের এদিনের চিত্রটা একইরকম। বই-এর বাজার বলতে এখনও তো একটা জায়গাই সকলে বুঝি। তা হল কলেজ স্ট্রিট।

কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার এ গলি ও গলি এ মাথা ও মাথা জুড়ে ১লা বৈশাখ যেন একটা উৎসব। সমস্ত প্রকাশকের অফিসও ফুল-পাতায় সাজানো। সংশ্লিষ্ট মানুষজনের ভিড়। তার ওপর গ্রন্থকারদের প্রতিটি অফিসে একবার করে ঘুরে আসা। কখনও কথা বলার লোক পেলে দু'দণ্ড বসে পড়া। হাসি-ঠাট্টা-হৈহৈ। উদ্দেশ্য যোগাযোগ এবং সেই মিষ্টান্নের অধিক মধুর জন্য অপেক্ষা। তবে সেখানেও সকলের ভাগ্য সমান নয়।

অনেকের বই তেমন বিক্রি হয় না। অনেককেই তাই প্রায় খালি হাতেই ফিরতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল।

এই কদিন আগে আমার এক পুরাতন প্রকাশক সকালবেলা আমার বাড়িতে এসে গোটা কতক ডাব এবং সেই সঙ্গে কিছু মিষ্টি দিয়ে গেলেন। অথচ সেদিনই বিকেলবেলা আমাকে যেতে হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটার সেই বিখ্যাত যদু মল্লিকের বাড়িতে। বাড়িটাও বিখ্যাত। যাইহোক, সেখানে সাহিত্যতীর্থ নামক এক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে আমার ডাক পড়েছিল। আমি 'তীর্থপতি' অর্থাৎ সভাপতি। কবিরা কবিতা পাঠ করলেন। গল্প লেখকেরা গল্পপাঠ করলেন। মল্লিকবাড়ির মহিলারা মিষ্টান্ন পরিবেশন করলেন। তাছাড়া ছিল সঙ্গীত পরিবেশন। একজন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিকে সেই সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। তারপর তাঁর ভাষণও শুনতে হল এবং সভাপতি হিসেবে আমাকেও কিছু বলতে হল।

এইভাবে একসময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। কোন প্রকাশকের আস্তানায় সেদিন আর যাওয়াই হয়ে উঠল না। খালি পকেট খালিই পকেট থেকে গেল।

বছর শুরুর এই দিনটা আমার মনে হয় শুধু আর্থিক। যেন ব্যবসা সম্পর্কিত মানুষজনের

দিনই হল ১ বৈশাখ। তাই এই দিনটিতে উৎসব বলতে আমার আপত্তি আছে। ১ বৈশাখ উৎসব হবে কী করে। কতজন মানুষ এই দিনটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত? শুধু ব্যবসায়ী আর বুদ্ধিজীবীরা তো আর সমগ্র জাতি নয়। একটা জাতির কত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ তারা। এখনও পর্যন্ত তাই ১ বৈশাখ দিনটি সমগ্র জাতির উৎসব বলে চিহ্নিত হয়নি। বোধহয় হবেও না। যেমন দোল, দুর্গোৎসব দেওয়ালি সমগ্র জাতির কাছে বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে উৎসব। জাতীয় উৎসব। কোন না কোনভাবে সমগ্র জাতির প্রতিটি ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে উৎসবগুলো জড়িয়ে আছে। দোল, দুর্গোৎসব দেওয়ালির মত ১ বৈশাখ তো আর সবার মুখে হাসি ফোটায় না। রঙও ধরায় না। লোকে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নববর্ষের উৎসবে যোগদান করতে নাই পারে তা হলে শুধুমাত্র অফিস-আদালত বন্ধ করে সে উৎসবের আমেজ আনা যাবে না। সাধারণত এদিনটায় যেহেতু ছুটি থাকে তাই দেখি বাবুরা সব দল বেঁধে বন্ধুবান্ধব-স্ত্রীপুত্র নিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চললেন দীঘা নয়তো ডায়মন্ডহারবার।

দিনটা তাদের দিক থেকে একটা পিকনিক উৎসব। সকলে মিলল কোথায়! সবার মনে রঙ ধরালো কোথায়! মানুষে মানুষে মিলনই বা হলো কোথায়! যেটা উৎসবের মূল লক্ষ্য। যেমন আমরা মিলিত হই জাতীয় যেকোন উৎসবে।

আমার মতে কলকাতার আসল নববর্ষের দিন হল ২৫ বৈশাখ। ঠিক সেই দিনটিতেই আমরা যেন উৎসবের স্বাদ পাই। প্রায় জাতীয় উৎসবের। কলকাতাও তো সেদিন সেজে ওঠে উৎসবের রঙে। প্রতিটি পাড়ার গলি থেকে নগরের যে কোন মঞ্চ। শান্তিনিকেতনে দুটি দিন অর্থাৎ ১ বৈশাখ আর ২৫ বৈশাখকে একত্রিত করা হয় ১ বৈশাখে। আর ১ বৈশাখেই সমাপন করা হয় ২৫ বৈশাখের উৎসব। কারণ গরমের ছুটিটা ওখানে ২৫ বৈশাখের আগেই শুরু হয়ে যায়। অনেককাল আগে দেখেছি ১ বৈশাখ আর ২৫ বৈশাখ দুটি দিন আলাদা আলাদাভাবে উৎসবের দিন ছিল। কিন্তু পরে গুরুদেব থাকতেই ২৫ বৈশাখকে এগিয়ে আনা হয় ১ বৈশাখে। আজও শান্তিনিকেতনে ১ বৈশাখের দিনটিতে নাচ, গান, আবৃত্তি ও ভাষণ হয়। তবু ২৫ বৈশাখ দিনটি কখনই উপেক্ষিত নয়। ছিলও না। গুরুদেব না থাকলেও, বিশ্বভারতীর তরফ থেকে কিছু না কিছু করলেও, যে ক'জন ভক্ত ও অনুরাগী গরমের ছুটির মধ্যেও ওখানে থাকেন, তাঁরা নিজেদের মত সন্ধ্যাবেলা গানবাজনা করেন। কেউ কেউ আবৃত্তি করেন। গুরুদেবের বিভিন্ন রচনা পাঠ করেন। সে এক অন্যরকম অনুভূতি। সারা দিনের রুদ্রবেশী নিদাঘের দাবদাহের পর শান্তিনিকেতনের নীরব স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় গুরু প্রণামের সেই আয়োজন বড় আন্তরিক। ভীষণ সুন্দর সেই পূজা। ওদিকে ১ বৈশাখের যে আসল উৎসব সেখানে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী মাস্টারমশাইরা এবং সেই উপলক্ষে উপস্থিত অতিথি এবং দর্শকদের সমবেতভাবে যে অনুষ্ঠান হয় তা হয় দুটো ভাগে দু'জায়গায়। সকালবেলা আম্রকুঞ্জে। সেখানে মূলত গানই হয়। আশ্রমিকরা গান করেন। সন্ধ্যাবেলায় গৌর প্রাঙ্গণে হয় নাটক অভিনয়। বলাই বাহুল্য সেসব নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি সবই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো।

কথা হচ্ছে ১ বৈশাখ নিয়ে। আমরা বাঙালিরা যদিও বাংলার তারিখ বলতে এই দুটো দিনই জানি। এক ১ বৈশাখ। দুই ২৫ বৈশাখ। বাদবাকি ইংরেজি মতে। বৈশাখ মাসটা গুরুদেবের জন্মের মাস। তাই সেই মাসের অন্য কোন তারিখের কথা বলতে গেলে তাঁর কথাও না এসে যায় না। আর কোন কথাই বা তাঁকে ছেড়ে বলি, বা বলা যায়!

আজ ১ বৈশাখের কথা বলতে বসে তাই ঘুরে-ফিরে ২৫ বৈশাখেই ফিরে ফিরে আসছি

শুধু এই জন্যই যে আমার কাছে ২৫ বৈশাখই ১ বৈশাখ। উৎসব হিসেবে তো বটেই। অন্য এক ভেতরের যোগাযাগ থেকেও।

আর ২৫ বৈশাখ শুধু কলকাতায় নয় ভারতেও নয় সারা বিশ্বেই আজ পালিত হচ্ছে। যেখানে বাঙালি সংস্কৃতি পৌঁছেছে সেখানেই পালিত হচ্ছে ২৫ বৈশাখ। আর যা নিয়ে কথা হচ্ছিল সেই ১ বৈশাখ ওদিকে সীমান্তের ওপারে বিশেষ করে ঢাকা শহরে পালন করা হয় জাতীয় উৎসব রূপে। কোনবার আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারিনি। কিন্তু খেয়াল করে দূর থেকে শুনেছি তার বিবরণ। বলতে পারি নির্দ্বিধায় ঢাকায় ১ বৈশাখ কলকাতার অনুকরণযোগ্য। আবার এটাও শুনতে পাচ্ছি যে ঢাকার লোকেরা ২৫ বৈশাখ উদযাপন করছে কলকাতার অনুকরণে। কিন্তু ওদের আসল উৎসবটা হল ১ বৈশাখ। যেমন আমাদের আসল উৎসব হল ২৫ বৈশাখ।

এটা তো মনে রাখতেই হবে যে ১ বৈশাখ কখনই সারাটা ভারতের নববর্ষ দিবস নয়। এই দিনটি একেক জায়গায় একেকরকম ভাবে পালন করা হয়, যেমন আমার ওড়িশার ঢেঙ্কানালে। ওড়িশায় আমি কোনদিনই ১ বৈশাখ কোন উৎসবই দেখিনি। তবে একটা কথা জানি। তা হল ওই দিনটাতে ওড়িশাতে প্রতিটি বাড়ি থেকে পথিকদের অর্থাৎ যারা বাড়ির সামনে দিয়ে যায় তাদের গুড়ের পানা (গুড়ের শরবত) খেতে দেওয়া হয়।

তার সঙ্গে যতদূর মনে পড়ছে একমুঠো ছাতুও দেওয়া হয়। এটা শুধু সেই দিনের জন্য নয়। সারাটা বৈশাখ মাস ধরেই চলে। ঠিক তারিখটা এখন মনে পড়ছে না, তবে ওড়িশার নববর্ষ ভাদ্র মাসের কোন এক তারিখে। সেদিন কোন উৎসব কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নামটা মনে আছে 'সুনিয়া'। উত্তর ভারতের মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে নববর্ষ শুরু দেওয়ালির দিন। দক্ষিণ ভারতের নববর্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান আমার নেই। পাঞ্জাবি শিখরা ১ বৈশাখ উদযাপন করে। তবে নববর্ষ বলে কোন নির্দিষ্ট দিন ক্যালেন্ডারে চিহ্নিত করা হয় না বা সেই দিন বলে ছুটিও দেওয়া হয় না। কিন্তু বাঙালির নববর্ষ দিবস অর্থাৎ ১ বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশেও ছুটির দিন বলে চিহ্নিত।

অধিকন্তু ২৫ বৈশাখও একটা ছুটির দিন বলে পশ্চিমবঙ্গে পালিত হয়। বোধহয় বাংলাদেশেও। এতে করে প্রমাণ করছে যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি একটি জাতি। আরও বহু কিছুর সঙ্গে এটাও আমাদের কাছে জাতীয় একতার স্মারক। এতে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়।

অনুলিখন : সৃজন ভট্টাচার্য

পুরনো কাসুন্দি

❑ সরকারি উচ্চপদে আপনি ছিলেন। সেই পদ ছেড়ে সাহিত্যের পথে এলেন কবে?

❑❑ আমি তখন ওই মুর্শিদাবাদেরই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৪৮ সাল। বিধান রায় তখন সি এম। উনি একদিন নির্দেশ দিলেন সীমান্ত থেকে মুসলমানদের ওপারে সরাতে হবে। আমি লিখিত নির্দেশ চাইলাম। উনি রাজি হলেন না। আমিও সেটা না পেলে মুভ করবো না। এরপর উনি তৎকালীন হোম মিনিস্টার কিরণশঙ্কর রায়কে পাঠালেন আমার কাছে। উনিও তাই বললেন। আমি জানিয়ে দিলাম লিখিত আদেশ ছাড়া আমাকে ও কাজ করতে বাধ্য করলে ইস্তফা দেব। আমাকে তখন মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। আমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে বসে থেকে জয়েন করলাম ওয়ার্কমেনস কমপেনসেশন কমিশনার পদে।

আমি কিন্তু অনেক আগে থেকেই ভেবে রেখেছি চাকরি ছেড়ে দেব।

একদিকে লেখালেখি অন্য দিকে সরকারি চাকরি—ওই বিশাল চাপের বোঝা নিয়ে আর পেরে উঠছিলাম না। আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছিল। আমি আমার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলাম। তাতে লিখলাম 'মোমবাতির দুটো দিক পুড়ছে। আমার ইস্তফা মঞ্জুর হোক।' তখনকার বড়লাট রাজগোপালচারী আমার ইস্তফা গ্রহণ করলেন।

সুকুমার সেন তখন মুখ্য সচিব। ওঁর পরে এলেন সত্যেন রায়। উনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আইন সচিব শিশির সেন অসুস্থ, আমি ওঁর কাজ করতে রাজি আছি কি না। প্রাথমিকভাবে একমাস দু'মাস তারপর আরো তিন মাস এইভাবে মাস ছয়েক ওই পদে রইলাম। সেই ১৯৫১ সাল থেকে আমি পুরোপুরি লেখার দিকে এলাম। তবে একটা কথা, বিধান রায়ের সঙ্গে যাবার আগে কিন্তু আমার সম্পর্ক ভাল হয়েছিল।

❑ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কখনো?

❑❑ হয়েছিল, আমি যখন পাটনা কলেজে ইংরেজি আদর্শ নিয়ে পড়ছি সেই সময় আমি একবার শান্তিনিকেতনে গেছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং আর্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করতে। ১৯২৪ এর জানুয়ারি মাসে। উনি বলেছিলেন, আর্ট বুঝতে গেলে তৈরি হতে হবে। পরে ১৯৩৭ সালে গুরুদেব আমাকে ওঁর 'সে' গ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন। ছড়া লেখার কথাও বলেছিলেন কথা প্রসঙ্গে।

❑ আপনার প্রথম ছড়া তাহলে কোনটি?

❑❑ ছড়া নয়। ছড়ার ছন্দে প্রথম দিকে বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলাম। 'লন্ডন ফগ' হল সেই প্রথম কবিতা। ১৯২৭ এ লেখা। অবশ্য ১৯৪২-এ বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে 'উড়কি ধানের মুড়কি' নামে এক গুচ্ছ ছড়াও লিখেছিলাম। ছড়া বলতে প্রথম সেগুলোই।

❑ আর সেই প্রবাদ হয়ে যাওয়া ছড়াটা 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ কর। তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ কর? তার বেলা?' এর ইতিহাসটা কী?

❑❑ পার্টিশনের মাস দেড়েক আগে লিখেছিলাম। আমার বয়েস ছিল ৪৩। দুটো ঘটনা এর পিছনে আছে। প্রথমত পার্টিশনের ফলে নিজের দেশেই একটা অংশে বিদেশী হয়ে যেতে হবে সেই দুঃসহ বেদনা থেকে। অবশ্য একটা স্বস্তি বোধও ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আর থাকছে না।

❑ আর একটি যোগাযোগ?

❑❑ (হেসে) আমি একদিন স্নান করতে যাব। তেলের শিশিটা রোদ্দুরে দিয়েছি। আমার দেড় বছরের মেয়ে তৃপ্তি টলোমলো পায়ে গিয়ে শিশিটা ভেঙে ফেলল। বেশ রাগ হল। ঐটুকু মেয়েকে বকবো কি? আর সেই রাগ থেকেই ছড়াটা লিখে ফেলেছিলাম।

❑ অসাধারণ। এবার আপনার যৌবনের দিকে চললাম। আপনার স্ত্রী ছিলেন বিদেশিনী। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিণয়-এর ঘটনাটা জানতে চাই।

❑❑ আমি যৌবনে ভীষ্মের পণ করেছিলাম যে প্রেমে না পড়লে বিয়ে করবো না। অনেক সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছি সেইজন্য। এমন সময়, আমি তখন বহরমপুরের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, চিঠি পেলাম এক মার্কিন কন্যা ভারত দেখতে আসছেন। আমার বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্য তাঁকে আমার ঠিকানা জানালেন। আমি তাঁকে বহরমপুরে আসতে বললাম। ১৯৩০ সাল, ২৮ আগস্ট আমাদের দু'জনের আলাপ হল। নাম অ্যালিস ভার্জিনিয়া। আমরা রাঁচিতে গিয়ে উঠলাম বন্ধু শরৎ মুখার্জির বাসায়। সেখানেই বিয়ে করি ২৩ অক্টোবর।

❑ এ তো সেই 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে'-র মত ঘটনা।

❑❑ (হেসে) তাই তো। রেজিস্ট্রি হল। তারপর ধর্মীয় ভাষণ যাকে খ্রিস্টানরা সারমন (Sermon) বলে, তাই হল। তারপর খাওয়া-দাওয়া।

❑ কারা উপস্থিত ছিলেন সেদিন?

❑❑ প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরা দেবী। ওঁরা তো রাঁচির বহুদিনের বাসিন্দা। শরৎ ছিল। যোগেন্দ্রনাথ নামে একজন বিহারী বন্ধুও ছিল। প্রায় ৫০/৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

❑ ওঁর 'লীলা' নামটা তো আপনারই দেওয়া?

❑❑ হ্যাঁ। আমি একসময় 'লীলাময়' ছদ্মনামে লিখতাম। বাবা শুধু আমাকে বলেছিলেন, 'বিয়ে তো করলি। তোদের ছেলে-মেয়েরা কিভাবে বিয়ে করবে। আমি বলেছিলাম, 'হিন্দু সমাজ তখন খুব উদার হবে।' আমার বড় ছেলে এবং দুই মেয়ে হিন্দু মতেই বিয়ে করেছে। ছোট ছেলে শুধু ব্রাহ্ম মতে।

❑ আপনি আই সি এস-এ প্রথম হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পিরিয়ডে তো বটেই স্বাধীনতার পরেও বহুদিন সরকারের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। তবু আপনি যেমন আদ্যোপান্ত স্বদেশী তেমনি শুনেছি আপনার বিদেশিনী স্ত্রীও একজন আদর্শ ভারতীয় নারী হয়ে উঠেছিলেন।

❑❑ দেখো, মাত্র দুইমাসেরও আলাপ নয় অথচ ৬২ বৎসর দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়েছি। কী করে সম্ভব হল বল?

❑আপনার কী মনে হয়?

❑❑ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব নয়। লীলা একজন অসামান্যা নারী ছিলেন।

❑ লেখালেখির বিষয়ে নতুন কিছু ভাবছেন?

❑❑ ভাবছি। ২ আগস্ট শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। ফিরে এসে একটা লেখা শুরু করব।

❑ বিষয়?

❑❑ মায়াবতীকে নিয়ে শুরু করবো। নারীরা তো এখন সব জায়গায় সর্দারি করছে। (হেসে) ভীষণ ভাল লাগছে। আর মায়াবতী একজন দলিত কন্যা হয়ে উত্তর প্রদেশের মত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। কম কথা নয়। ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল। তাই নারীদের এই উত্থান নিয়ে লিখব ঠিক করেছি।

❑ মায়াবতী দিয়ে না হয় শুরু করবেন। শেষ করবেন কাকে দিয়ে?

❑❑ শেষ কি এখনই বলা যায়? সবে তো শুরু। কাকে দিয়ে শেষ হবে জানি না।

সাক্ষাৎকার : সৃজন ভট্টাচার্য

শালীনতা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে কাপড় কেনা সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়। ছেলেরা কী করে ইস্কুলে যাবে? কেবলমাত্র ধুতি। ভদ্রলোকের ছেলের জন্যে চাই একটা জামা। যাতে শরীরের বুক ও পেট ঢাকা যায়। কোনো মতে একটা চাদর জড়িয়ে সেটা সম্ভব হতো, কিন্তু চাদরই বা ক'জনের অভিভাবক কিনতে পারেন।

সেই অবস্থায় আমাদের হেডমাস্টার মশাই আমাদের বলেন, "তোমরা ধুতির কোঁচা গায়ে জড়িয়ে ক্লাসে আসতে পারো। খালি গায়ে ফুটবল খেলতে পারো।"

অধিকাংশই পাড়াগাঁয়ের ছেলে। তাদের পক্ষে ওটা লজ্জার বিষয় নয়। দেখা গেল ওটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখনকার মতো সেটাই শালীনতা। যুদ্ধের পর আবার যে কে সেই। কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীকে মনে হলো একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি তো ইস্কুলের ছাত্র নন। কলেজে গিয়ে আমরা কেউ তাঁর অনুকরণ করতে সাহস পাইনি। পাব কী করে? সবাই তো আমাদের হেডমাস্টার মশাই নন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর ও সহানুভবী।

শালীনতা একটা আপেক্ষিক শব্দ। মহারানী ভিক্টোরিয়ার যুগে তাঁর দেশের মহিলারা হাত পা ঢাকা পোশাক পরতেন। আজকাল সেটা উপহাসের বিষয়। মহারানী বেঁচে থাকলে বিষম রাগ করতেন। একালের উচ্চপদস্থ বা উচ্চবংশীয় মহিলাদেরও স্কার্টের ঝুল হাঁটুর নিচে নামতে দেখা যায় না। জামাও হাফ কাটা। তবে কি তাঁরা শালীন নন? এত বড়ো কথা মুখে আনতে কেউ সাহস পান?

আমি যতদূর বুঝি এসব ক্ষেত্রে শালীনতা নির্ভর করে লোকে কী মনে করে তার উপরে। আজকাল সালোয়ার কামিজ পরে শত শত মেয়ে পুরুষদের সামনে আসছে। পুরুষদের এটা চোখ সওয়া হয়ে গেছে। আমার নাতনিরাই সালোয়ার কামিজ পরে কলেজে যায় ও সমাজে বেরোয়। তবে এটাও মনে রাখতে হয় যে সালোয়ার কামিজ পরলে উড়ুনি বা ওড়নাও পরতে হয়। সেটাই আদব কায়দা। পাঞ্জাবী মহিলারা সালোয়ার কামিজের উপর চাদর চড়ান। অর্থাৎ গলবস্ত্র।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ধুতি পাঞ্জাবির উপর চাদর পরেন। এটাই ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্য। সভা সমিতিতে গেলে আমিও তাই পরি। আমাদের দেশের কলেজের প্রিন্সিপালরাও কি তাই করেন? তাঁরা যদি ঐতিহ্য রক্ষা না করেন তবে ছাত্রীদের কাছে সেটা দাবি করেন কেন.? কোন যুক্তিতে? শালীনতা একতরফা নয়। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।

সত্যজিৎ প্রয়াণ

সত্যজিৎ নেই। দূরদর্শনে সংবাদটা শুনে চমকে উঠি। একালের পক্ষে সত্তর বছর বয়স এমন কিছু বেশি নয়। তাঁর দীর্ঘতর আয়ু প্রত্যাশা করেছিলুম। তাঁর হাত থেকে পাবারও প্রত্যাশা ছিল আরো অনেক। তাঁর জন্য আমি শোকাকুল।

আমার ছেলেবেলায় 'সন্দেশ' পত্রিকা ছিল সন্দেশের মতোই উপাদেয়। একখানা 'সন্দেশ' যেন একটা ভোজ। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা গল্প মন কেড়ে নিত। তিনি ছিলেন রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলার ওস্তাদ। তাঁর অকালমৃত্যুর পর তাঁর মতো গল্প বলার কেউ রইলেন না। কিন্তু ছড়া দিয়ে আর ছবি দিয়ে আমাদের মাতিয়ে রাখলেন তাঁর পুত্র সুকুমার। সেসব ছড়া আর ছবি ক্লাসিক হয়ে গেছে। তাঁর ছড়া আমি এ-বয়সেও আওড়াতে পারি।

সুকুমার আরো অকালে চলে গেলেন। 'সন্দেশ' কোনোরকমে টিকে রইল বটে, কিন্তু তার সে আকর্ষণ স্থায়ী হল না। কিছুদিন পরে পত্রিকাটি উঠে যায়। ততদিনে আমিও বড়ো হয়েছি। তার অভাব বোধ করিনে।

সত্যজিৎকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে। তিনি তখন কলাভবনের ছাত্র। কবে তিনি সেখান থেকে ফিরলেন, কোথায় কাজ করলেন, এসব কিছুই আমার জানা ছিল না। একদিন শুনি তিনি 'পথের পাঁচালি' উপন্যাস অবলম্বনে ফিল্ম নির্মাণ করে দেশ-বিদেশে নাম করেছেন। সে ফিল্ম পরে একদিন বোলপুরে দেখানো হয়। দেখি আর উপভোগ করি। বিভূতিভূষণ বেঁচে থাকলে কত খুশি হতেন।

সত্যজিতের সঙ্গে আবার দেখা হয় কলকাতায়। তিনদিনের জন্যে কলকাতায় এসে আমরা নানা কারণে বছরের পর বছর থেকে যাই। আমাদের পারিবারিক বন্ধু ডেভিড ম্যাককাচন অকালে মারা গেলে সত্যজিতের ফিল্মের বাক্যাংশ ইংরেজিতে তর্জমা করার জন্যে মানিক তাঁর লীলা মাসিকে অনুরোধ করেন। সেই থেকে বহুবার সে কাজ করতে হয়েছে উক্ত মহিলাকে। সত্যজিৎ তাঁর একটির পর একটি নবনির্মিত ফিল্মের প্রথম প্রদর্শনের দিন আমাদের আমন্ত্রণ করতেন। শেষবার 'শাখাপ্রশাখা' দেখতে যাই নন্দনে।

কিন্তু এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে অন্য একটি সম্পর্ক ছিল। ফিল্ম জগতে প্রতিষ্ঠার পর তিনি 'সন্দেশ' পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হন। সম্পাদক লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়। তিনজনেই উপেন্দ্রকিশোর ঘরানা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর ঘরানার পর অমন একটি ঘরানা আমার জানা নেই। কুলদারঞ্জন, সুখলতা, পুণ্যলতা, সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল, লীলা, সত্যজিৎ। চল্লিশ বছর বয়সে কলম ধরেই তিনি আসর মাত করলেন।

সেকালের মতো একালেও 'সন্দেশ' একাই একটা ভোজ। আমার কাছে পাঠানো হয় আস্বাদনের জন্যে নয়, পরিবেশনের জন্যে। সেই সুবাদে সত্যজিতের রকমারি কাহিনী পড়ি। কতরকম তার বিচিত্র চরিত্র। অধ্যাপক শঙ্কু, ফেলুদা, তারিণী খুড়ো। সকলের নাম মনে নেই। এসব গল্প বই হয়ে বেরয়। ছেলেমহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শুনতে পাই এক একখানি বেস্ট

সেলার। একজন আমাকে বলে সত্যজিতের আয় বই থেকে যত, ফিল্ম থেকে তত নয়। আশ্চর্য হই।

তাঁর একটি গল্প ইংরেজিতে তর্জমা করে আমার নাতি চন্দ্রহাস রায়। 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' সেটি প্রকাশ করে। সেইসূত্রে লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের ঘনিষ্ঠতা। আমাদের বিবাহের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের ফ্ল্যাটে যে প্রীতি সম্মেলন হয় তাতে যোগ দেবার জন্য চন্দ্রহাস গিয়ে সত্যজিৎকে আমন্ত্রণ জানায়। পার্টির প্রধান আকর্ষণ তিনি। সামান্য একটু মুখে দেন। কিন্তু আলাপ করেন বেশ কিছুক্ষণ। পুত্রবধূর প্রশংসা করেন। সন্দীপ ললিতার বিবাহের পর প্রীতিসম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু লীলা মাসি তখন বোম্বাইতে চিকিৎসাধীন।

মানিকের সঙ্গ পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য। তাঁকে বিরক্ত করতে চাইনে বলে তাঁর ফ্ল্যাটে যাইনে। মাঝে মাঝে লীলা মাসি যান। তাঁর অস্কার প্রাপ্তির পর তাঁকে সশরীরে অভিনন্দন জানাতে লীলা মাসি যাবেন বলে স্থির করেছিলেন, এমন সময় দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে বোম্বাই যেতে হয়। আর মানিককে বেলভিউ নার্সিং হোমে। সত্যজিতের সঙ্গে শেষ দেখা হল না। তাঁর প্রয়াণের পরদিন আমি নন্দনে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি। সেই দীর্ঘকায় শালপ্রাংশু পুরুষকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখে অশ্রুর আবেগ সংবরণ করি। চারদিকে দর্শনার্থীর ভিড়।

কে একজন জানতে চাইলেন, 'শ্মশানযাত্রার সময় রবীন্দ্রনাথের জন্যে কি এরকম ভিড় হয়েছিল!' আমি নিজে দেখিনি, তবে শুনেছিলুম কলকাতা ভেঙে পড়েছিল। এই ভিড় সেই ভিড়কে ছাপিয়ে উঠেছিল কি না বলতে পারলুম না। তবে লোকের অন্তরে রবীন্দ্রনাথের পরেই সত্যজিৎ। কারণ তেমনি সব্যসাচী, তেমনি বিশ্ববরেণ্য। জনতা রবীন্দ্রনাথের দাড়ি উপড়ে নিয়েছিল শুনেছি। সত্যজিতের বেলা যাতে তেমন কিছু না হয় তার জন্য এন্তার পুলিশ মোতায়েন ছিল। সত্যজিৎ রাজার মতোই গেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

তাঁর সব ছবি সকলে দেখেনি। আমিও না। সুতরাং তাঁর সব ছবির রেট্রস্পেকটিভ হওয়া উচিত। স্বদেশে ও বিদেশে। দূরদর্শনে নয়, সিনেমা হল্‌-এ। আর কোথাও না হলে নন্দনে। যারা দেখতে পায়নি তারা দেখতে চাইলে দেখতে পাবে। শিল্পীর মেমোরিয়াল তার সৃষ্টির প্রদর্শনী। সেটা প্রত্যেক বছর তাঁর জন্মবার্ষিকীর সময় হতে পারে। নাম রাখতে পারা যায় সত্যজিৎ রায় ফেস্টিভাল।

নবজাগৃতি—সূচনা ও সম্ভাবনা

আমরা সুদীর্ঘকাল ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের চেতনা, মূল্যবোধ—সব কিছু কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এ ভাবে একটা সমাজ, একটা জাতি চলতে পারে না। বাঙালীকে ভেতর থেকে নাড়াতে হবে, জাগাতে হবে। নতুন প্রজন্ম কী করতে আছে? তারা কি শুধু নামেই 'নতুন', কাজে নয়? কর্তব্যবোধ কি লুপ্ত হয়ে গেছে?

বিগত নবজাগৃতির ভাবনায় আমাদের উজ্জীবিত করেছিল কারা? —ইংরেজ। ইংরেজ হঠাৎ এসে হাজির হলো—সঙ্গে এলো ইংরেজী সাহিত্য। ওদের আসার ফলে আমাদের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। জন্ম নিলো হিন্দু কলেজ। আমাদের ছেলেরা পড়তে গেলো ওঁদের কাছে। ডিরোজিওর মতন শিক্ষক পেলাম। Byron, Keats, Shelley-র কবিতা পড়ল ওরা—European Philosopherদের দর্শন পড়ল—ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস জানলো—American Independence-এর খবর পেলো। খবরের কাগজ বেরোল।— প্রথমে ইংরেজী, তারপর বাংলা। 'সমাচার দর্পণ'। ইংরেজী কাগজ প্রথমে ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে। পরে বেরোল। Hindu Patriot। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের কথা। Derozianরা প্রথমে ইংরেজী লিখেছে, ক্রমশ বাংলায় লেখার ঝোঁক হলো, বাংলাতেও লিখলো। তখন গদ্য সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। এরাই আরম্ভ করলো। Epic ছিল না— সব হিন্দু কলেজের মাধ্যমেই হয়েছে। এর মূল্য তখন বোঝা যায়নি— পরবর্তীকালে দেখা গেল, একটা নতুন স্রোত এসেছে। বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র পাঁচালি আর ছড়া নয়— মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল নয়— নতুন কত বই লেখা হলো। আধুনিকতার স্রোতে প্রাচীনের তরঙ্গ অনুভূত হলো। নতুন ঢঙে লেখা হলো 'মেঘনাদ বধ'। গ্রীকরা Iliad লিখেছে— আমরাও লিখবো। এলো অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

এই জাগরণ, ইংরেজরা না এলে কোনদিন সম্ভব হতো না। ইংরেজরা আসার ফলে আমরা দেখলাম, 'পুরাণ'টা ইতিহাস নয়। আমাদের দেশের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লেখেনি— যা লিখেছে, সব বিদেশীরাই। তাই নিজেদের ইতিহাস জানতে পারলাম। বিজ্ঞান বলে কোন পদার্থ ছিল না, বিজ্ঞান এলো। পদার্থ বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নতুন একটা জগৎ উন্মোচিত হচ্ছে। চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় জানতাম না, জানলাম। পৃথিবীর ম্যাপ কখনো দেখিনি— চোখের সামনে একটা Globe পেলাম। তারপর এলো রেল, জলযান, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। এতরকমের জিনিস একসঙ্গে এসে পড়ল যে আমরা একেবারে দিশেহারা। তখন কিছু লোক বলে উঠলেন— "আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছি। সবই ত পরকীয়, নিজেদের ত কিছুই নয়। স্বকীয় কী আছে দ্যাখাও?" এইভাবে প্রাচীনের নতুন করে মূল্যায়ন শুরু হলো। ঋগ্বেদ অনুবাদ করলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বেদকে অনুবাদ করতে দেওয়া হতো না— সংস্কৃতই পড়তে দেওয়া হত না— কয়েকঘর ব্রাহ্মণ মাত্র পড়তেন। সব ব্রাহ্মণেও পড়ত না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুরু করলেন সংস্কৃত পড়ানো। কিন্তু উনিও সবটা পারলেন না— কায়স্থ ও নবশাখ অবধি নামতে রাজী ছিলেন, সোনার বেনে নয়। অথচ এইভাবে সংস্কৃতের মতো উর্বর

সাহিত্যকে কোমরে গেঁট দিয়ে বেঁধে রাখলে মানুষ শিখবে কী করে? এই Monopoly-র ফলে মানষ বেদ পড়তে জানতো না, উপনিষদকে কোনদিন ভালো করে জানতে পারেনি। ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম উপনিষদ পড়ানো আরম্ভ করে। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এইভাবে আগ্রহ বাড়ে। যাঁরা খুব পশ্চিমী দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের কাছেও Ancient India-র একটা রূপরেখা ফুটে উঠতে লাগলো। চর্চা শুরু হলো পুরোদমে। Europian Indologist এখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা গবেষণায় মন দিলেন। অশোক নামে যে এক রাজা ছিল, জানতাম না। Ashokan Inscription ছিল অথচ কারো নজরে পড়েনি। প্রিন্সেপ সাহেব বের করলেন প্রিয়দর্শী বলে এক রাজার নাম।

সিংহল থেকে জানা গেল, প্রিয়দর্শী নামক রাজাই হচ্ছেন 'অশোক'। তখন অশোক কে? কোথায়? কবে ছিলেন?— সব জানা গেল। ইতিহাস সম্পর্কিত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আমরা হাতে পেলাম। Megasthenes-এর ভারত বিবরণ, Fa-Hien-এর ভারত বিবরণ, এ সবের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরী হলো। আমাদের আত্মসম্মান বোধ জাগলো। সবকিছু এই পশ্চিমীদের থেকে নেবো কেন? আমরাই বা কিসে কম? আমাদের যা আছে তা ওরা নিক। বিবেকানন্দ গেলেন শিকাগোয়— বেদান্ত প্রচার করলেন। এইভাবে দেখা গেল দুটো স্রোত কাজ করছে, একটাকে বলা যেতে পারে modernization বা westernization। ইংরেজরা কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আনেনি— আধুনিক সভ্যতাকে নিয়ে এসেছে। আধুনিক সভ্যতা বলতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, রাজনীতি, Democracy। এই বৃত্তিগুলো আমাদের মধ্যে ছিল না। এরই সঙ্গে আমরা দেখলাম, আরো গভীর কিছু বিষয় আছে যার সম্বন্ধে ওরা বেশী কিছু জানে না। আমাদের আদিপর্বের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমাদের ঋষি ছিলেন, মুনি ছিলেন। আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ কম নয়— শুধু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। তোমরা Shakespeare বলছ? কালিদাস কম কিসে? Homer-এর সঙ্গে বাল্মীকির তুলনা করা হলো। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বই পর্যন্ত লেখা হলো। আবার কত লোক মেতে গেল আধুনিক জগৎ নিয়ে— তার জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে।

শুরু হলো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু ওরা বাধা দিচ্ছে। অতএব একটা বিরোধী ভাব এলো যেটা গোড়ার দিকে আসেনি। "হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়/ জগৎ গ্রাসিতে করেছে আশয় ... ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়"। ভারতের এই ঘুম ভাঙানোর জন্য চেষ্টা চললো। একদিকে স্বাধীনতার খাতিরে anti-European ভাব এলো—অন্যদিকে সাহিত্যিকরা Europeanদের চায়। ওদের কাছ থেকে ক্রমাগত শিখছি আমরা। আমাদের 'নভেল' ছিল না, ছোটগল্প ছিল না, 'লিরিক' ছিল না— সব পেলাম। আরো পেলাম পত্রিকা, মাসিকপত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদি। পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই progress না হলে— মাসিক ধ্যান ধারণায় এই আমূল পরিবর্তন না এলে, রবিঠাকুর কোনদিন নোবেল পুরস্কার পেতেন না। অথচ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দিনের পর দিন পরাধীন হয়ে যাচ্ছি, গরীব হয়ে যাচ্ছি— তাই 'বয়কট' প্রয়োজন। বিদেশী দ্রব্য কিনবো না— ওদের শিক্ষা চাই না।

ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলাম আমরা— Europe-কে নেবো না নেবো না? আমরা চরকা নিয়ে থাকবো, না মিল-ফ্যাকটরী চাইবো। যুদ্ধ চাইবো, না অহিংসা— কোনটা? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ঘোষণা করলেন— India is a great country। আমাদের glorious heritage— সেটাকে revive করতে হবে। আমরা নিজস্ব শিল্পকে নিয়ে এগোব। অপরদিকে, Calcutta

Group প্রতিবাদ করে বললো—"আমরা আধুনিক হবো— European Painter-দের নকল করে এগোব।" ক্রমশ রাশিয়ার দিকেও মুখ ফিরলো, আমরা চেয়ে বসলাম Communism। এই এতগুলো ভিন্নধর্মী ধারাকে সামাল দিতে গিয়ে ঘাড়ে এসে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কিছু বোঝার আগেই, ইংরেজদের প্রস্থান, দেশভাগ।

আমাদের এই যে উত্তরাধিকার এটা খুবই মিশ্র প্রকৃতির, অনেক কিছু আমরা পেয়েছি—কিছুই ছাড়তে পারছি না। রেল, টেলিগ্রাফ, প্রিন্টিং প্রেস, কোনটা ছাড়বো? যাত্রাও থাকবে, আধুনিক থিয়েটারও থাকবে। হারমোনিয়ামও চাই, একতারা খঞ্জনীও চাই। ওদের কাছ থেকে বহু জিনিস নিয়েছি— তবু একটা পিছুটান রয়ে গিয়েছে। এতকাল ধরে যা পেয়েছি, তারই একটা যথার্থ Synthesis চাই। নতুন-পুরনোকে নিয়ে বিশ্বপটে কিছু করে দেখাতে হবে।

এখন দুনিয়ায় কেউ আর সংস্কৃত শুনতে চায় না। ইংরেজী তুলে দিলে, জগতে আর কোনদিন দাঁড়ানো যাবে না। চিরকাল কূপমণ্ডূক হয়ে থাকতে হবে। কত লোক আজ আমেরিকা যাচ্ছে— প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকে কেউ-না-কেউ গেছে। মানুষ আজ ইংরেজী শিখতে আগ্রহী কেন? কারণ তাদের ambition রয়েছে — চাকরী নিয়ে বাইরে যাবার। পরীক্ষায় পাশ করে কোথাও যাবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না— অনেকে তাই computer শিখছে— যদি কাজকর্ম পেয়ে যায়। আমদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড confusion চলছে— কোনদিকে যাবো ঠিক বুঝতে পারছি না— এগিয়ে যাবো না পিছিয়ে যাবো? নাকি দুটো মিলিয়ে কিছু একটা করবো? কিছু একটা তৈরী করবে। গড়বো। যারা communist রাষ্ট্র চেয়েছিল তারা এখন disillusioned—হাল ছেড়ে দিয়েছে।

নবজাগরণ করতে গেলে নতুন একটা কিছু আনতে হবে। সেই নতুন জিনিসটা কী? রামকৃষ্ণ? বিবেকানন্দ? মহাত্মা গান্ধী? রবিঠাকুর? এঁদের সকলকেই তো দেখা হয়ে গেছে—চেনা হয়ে গেছে। নতুন কী আছে? কে আছে? এখন সবাই নতুনত্ব চাইছে, কিন্তু নতুনত্ব দেবার মত লোক নেই। বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে যারা কিছু নিচ্ছে, তা মোটেই উৎকৃষ্ট মানের নয়। নিতান্ত খেলো Popular জিনিস, যেমন Pop music, কমিকস্-এর মধ্যে রামায়ণ, খুনখারাপি, ধর্ষণ-রাহাজানি ঠাসা 'থ্রিলার'। সর্বত্র চালাকি চাই—খুব কমের মধ্যে, অনেক চাই। এইসব শিক্ষা থেকে কোনদিন কোন মহৎ কার্য হতে পারে না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Hope springs eternal in human breast। আশা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। Faith বা বিশ্বাস ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে না। আরেকটা জিনিস আছে—যা অমূল্য—তা হল Charity বা Love। মানুষের জীবনে প্রেম থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। এই তিনটেই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। ঘৃণা, বিদ্বেষ না রেখে মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে যাও। অচিরেই হাওয়া বদলে গেছে—বিপ্লব আসন্ন—পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

শহীদ জননীর 'একাত্তরের দিনগুলি'

জাহানারা ইমাম এখন নেই। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত বছর আমেরিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে সবাই একডাকে চেনে। তিনি ছিলেন ঢাকার ঘাতক নির্মূল সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। তাঁর যে কার্যকলাপ তা খবরের কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু তিনি একটি স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন, যেটি বাংলা সহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ— তাঁর ১৯৭১ সালের দিনলিপি, যার নাম 'একাত্তরের দিনগুলি'। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে, দ্বাদশ মুদ্রণ ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারি। আমার হাতে এসেছে দ্বাদশ মুদ্রণের বইটি।

জাহানার ইমাম সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ভেবে চিন্তে যত্ন করে এ বই লেখেননি। যেদিন যা ঘটেছে বা যা শুনেছেন, তা তখনকার মতো লিখেছেন। সেই বিবরণ এতো সুন্দর ভাষায় এতো সাবলীলভাবে রচিত যে পড়তে পড়তে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

ইতিহাস হিসেবে বইটি যেমন মূল্যবান, সাহিত্য হিসেবেও তেমনি। ঢাকায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা সক্রিয় ছিল এখবর আমরা জানতুম। কিন্তু কারা সেই সব মানুষ, কাদের আত্মীয়-স্বজন, কেমন ছিল তাঁদের কর্ম পদ্ধতি, তঁদের উপর নির্যাতনের দানবিকতা বা কেমনতরো, সমসময়ে ঢাকার গৃহস্থ-জীবনের দুর্ভোগই বা কী আকার ধারণা করেছিল— ওসব জানতে হলে এই রকম একটি রোজনামচা পড়ার দরকার।

জাহানারা ইমামের পুত্র রুমী গেরিলাদের সঙ্গে ছিল গভীরভাবে লিপ্ত। তাকে একদিন জেরা করবার জন্য তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাকে যে হত্যা করা হয়েছিল এটা ধরে নেবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রুমীর পিতাও এর কিছুদিনের মধ্যে পুত্রশোকে প্রাণ হারান। পুত্রশোক এবং স্বামীশোক বহন করে এবং সেই সঙ্গে অমোচনীয় কর্কট রোগের যন্ত্রণায় জাহানারা ইমাম বাকি জীবন কাটান।

বাংলাদেশের সকলেই তাঁকে মায়ের মতো ভক্তি করে। এই মহীয়সী মহিলা হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ মানতেন না। মুসলিম বন্ধুর পাশাপাশি হিন্দু বন্ধুকেও বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন। ওঁর জীবন-চর্চা ছিল সর্বতোভাবে জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ। একজন আমেরিকান কন্যা ওঁর বাড়িতে থেকে বাংলা ভাষা শিখতেন। নিজেও ছিলেন অধ্যাপিকা।

জাহানারার বই-এর মধ্যে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' ব্যবহারের নির্দশনও পাচ্ছি। দুঃখের দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাথী।

মুক্তিযুদ্ধের অনেকদিন পরে ইনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তখন আমার বাড়িতেও আসেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। বলেন, 'আমার ছেলেকে আমি ওদের হাতে থালায় করে তুলে দিলুম ওদের কথা বিশ্বাস করে! ওরা বলেছিল ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।' — এই বেদনা উনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। আমরাও ভুলতে পারবো না। ঐ সব সোনার চাঁদ ছেলেরাই তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে তাঁদের দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। জাহানারা নিশ্চয় এসব জানতেন। তিনি ছিলেন শহীদ জননী। কিন্তু তিনি যে এতো ভালো লেখেন, এটা আগে জানতুম না। এটি একটি অবশ্য পাঠ্য ইতিবৃত্ত। সাহিত্যগুণেও অতুলনীয়। জাহানারা ইমাম বাঙলা গদ্য সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভারত, চীন, তিব্বত

আনন্দের সংবাদ ভারত ও চীন একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে তাদের সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছে। চীন এখন থেকে আর অরুণাচল প্রদেশ দাবি করবে না। ভারত আর দাবি করবে না আকসাই চীন অঞ্চল। সীমান্তের একপারে চীন রাষ্ট্র, অপর পারে ভারত রাষ্ট্র। তৃতীয় কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি।

তা হলে তিব্বত গেল কোথায়? সে কি একটি রাষ্ট্র নয়? কখনও ছিল না? কখনও হবে না? চীন রাষ্ট্রের মতে তিব্বত চীনেরই একটি অঙ্গরাজ্য। যেমন অসম ভারতের। এটা একটা নতুন মত। আমাদের ছেলেবেলায় যে মানচিত্র দেখেছি তাতে তিব্বত ছিল চীন সাম্রাজ্যের একটি দেশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যেমন ভারতবর্ষ। চীন নিজেও ছিল সেইরকম একটি দেশ। যেমন ব্রিটেন। মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী ছিলেন বৌদ্ধ। তিব্বতের দলাই লামাও বৌদ্ধ। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল, মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতনের পর যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকে না। দলাই লামা ভারতে পালিয়ে আসেন। ইংরেজদের আশ্রয়ে থাকেন। ফিরে যাবার পর ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা করেন। ম্যাকমহোনের নেতৃত্বে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে এক টেবিলে বসেন তিব্বতের প্রতিনিধি। কূটনৈতিক দিক থকে এটা তিব্বতের স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি। কিন্তু চীন সেটা মেনে নেয় না। ম্যাকমহোন লাইন বিতর্কিত থেকে যায়। এই প্রথম চীন রাষ্ট্র সেটা প্রকারান্তরে স্বীকার করল। কিন্তু তিব্বতের খরচে। যেন তিব্বত বলে কোন রাষ্ট্র নেই। তিব্বত হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের এক প্রত্যঙ্গ।

তবে এটাও ঠিক যে মাঞ্চু আমলে চীনের বাইরে যেসব দেশ তাদের সঙ্গে তিব্বতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। রাষ্ট্রদূত বিনিময় হতো না। কনসাল বিনিময় হতো না। তিব্বত ছিল এক নিষিদ্ধ ভূমি, লাসা এক নিষিদ্ধ নগর। পলাতক দলাই লামার প্রত্যাবর্তনের পর ব্রিটিশ ভারত থেকে এক প্রতিনিধি যান লাসায়। শতখানেক ভারতীয় সৈনিক মোতায়েন হয় গ্যানটসিতে কিন্তু বিনিময়ে তিব্বত থেকে কোন প্রতিনিধি পাঠানো হয় না। দিল্লিতে বা লন্ডনে তিব্বতের কোন প্রতিনিধি আসেন না। তিব্বত যদি একটি স্বাধীন দেশই হতো তার প্রতিনিধিরা চীনের নানা দেশের বাইরে নিযুক্ত হতেন। নানা দেশে থেকে প্রতিনিধিরা তিব্বতে যেতেন। আসলে লামারা ছিলেন বাইরের ভয়ে ভীত। একমাত্র চীনই লাসায় প্রতিনিধি প্রেরণে অনুমতি পেত। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চীন হস্তক্ষেপ করত না।

তবে এটাও সত্য যে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকেই ছিল। চীনের তাতে আপত্তি ছিল না। আর এটাও সত্য যে ভারত থেকে তীর্থযাত্রীরা কৈলাস ও মানস সরোবরে অবাধে যাতায়াত করতে পারত। চীনের অনুমতির প্রয়োজন হতো না। সেসব দিন আর নেই। এখন চীনের ছাড়পত্র চাই। তিব্বতের ছাড়পত্রও যথেষ্ট নয়। তবে এটা একটা কঠিন ব্যাপার নয়। সহজেই তীর্থযাত্রীদের অনুমতি মিলবে। ব্যবসায়ীরাও যথাপূর্ব আমদানি রপ্তানির অনুমতি পাবেন। আধুনিক যুগে সব দেশই টুরিস্টদের ডাকছে, তাতে দুদেশেরই লাভ।

তিব্বতেও একদিন পর্যটকরা স্বাগত হতে পারেন, চীনের সম্মতিতে।

কিন্তু তিব্বত যদি স্বাধীন না হয় তো লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে থেকে যাবে। তারা ভারতের আশ্রয় ছেড়ে চীনের অধীনে যাবে না। তিব্বতের চেয়ে অনেক ছোট ছোট দেশ এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম। মঙ্গোলিয়ার উত্তরাংশও এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ বলে স্বীকৃত। তিব্বতকে চীন যদি স্বাধীনতা না দেয় তবে ভারতকে মনঃস্থির করতে হবে সে তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে না বিপক্ষে না নিরপেক্ষ বা উদাসীন। চীনকেও মনঃস্থির করতে হবে আন্তর্জাতিক জনমত সে কতদিন অগ্রাহ্য করবে। এখনকার দলাই লামা স্বাধীনতা না পেলে দেশে ফিরবেন না। দেশে দেশে ঘুরে তিনি জনমত তৈরি করছেন। তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে নরওয়ে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। চীন এখন কোণঠাসা হবে, যদি না রাশিয়ার অনুকরণে তিব্বতকে আর্মেনিয়া কিংবা জর্জিয়ার অনুরূপ মর্যাদা দেয়। তার পর কমনওয়েলথ গঠনের উদ্যোগ করে। কমনওয়েলথে চীনই প্রধান হবে, কিন্তু অধিপতি নয়। এমন একদিন আসতে পারে যেদিন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিরও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মতো দর্প চূর্ণ হবে। কবিগুরু বলেছেন—

"একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
চিরদিন নিখিলের অভ্রান্ত বিধান।"

চীন চীনেই থাকুক, তিব্বতকে তার নিজের ঘরে মালিক হতে দিক। সে যে ভারতেরই তাঁবেদার হবে তা ধরে নেওয়া উচিত নয়। নেপাল তো ভারতের তাঁবেদার হয়নি। বাংলাদেশও তাঁবেদার হবে না। ভারত ও তিব্বতের মাঝখানে হিমালয় এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ভারতের দিক থেকে তিব্বত ততখানি নিরাপদ তিব্বতের দিক থেকে ভারত যতখানি। তিব্বত স্বাধীন হলেও তার দক্ষিণ সীমান্তে চীনা সৈন্য মজুত থাকতে পারে, যতদিন না তিব্বতের নিজস্ব সৈন্যদল দায়িত্বের যোগ্য হতে পারছে। তাছাড়া ভারত তিব্বতকে অভয় দিতে পারে, যেমন নেপালকে দিয়েছে। নেপাল যদি স্বাধীন হতে পারে তিব্বত কেন হতে পারবে না? গায়ের জোর ছাড়া চীনের আর কোন জোর আছে? কমিউনিজমের জোর? চীন কি দিন দিন কমিউনিজম থেকে সরে যাচ্ছে না? একটু একটু করে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে উঠছে না?

তিব্বত একদিন স্বাধীন হবেই। চীনের সঙ্গে মৈত্রী আমি বিশ বছর ধরে চেয়ে এসেছি। ঠিক এমনি একটি সমাধানই আমার মনে ছিল। এখন এই মৈত্রী যেন তিব্বতের স্বাধীনতার অন্তরায় না হয়। তিব্বতের স্বাধীনতার জন্যেও আমরা অপেক্ষা করব। দলাই লামার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। কিন্তু লামাতন্ত্র আর নয়। চাই গণতন্ত্রের আধারে সামাজিক ন্যায়।

লামাশাসিত তিব্বত একটি আধুনিক রাষ্ট্র ছিল না। ব্রিটিশ অনুপ্রবেশও তাকে আধুনিক করতে পারেনি। তার আধুনিকীকরণ কমিউনিস্ট চীনের দ্বারাই আরম্ভ হয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে কমিউনিস্ট আমল একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে। চীনারা চলে গেলে তিব্বত আবার মধ্যযুগে ফিরে যেতে পারে। ভারতের তেমন কোনও ভূমিকা ছিল না। ব্রিটেনেরও না। সুতরাং চীনকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া চলে না। দেশ যেমন সত্য যুগও তেমনি সত্য। দেশের দিক থেকে তিব্বত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যুগের দিক থেকে লাভবান হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিব্বতীরা মঙ্গোলেয়ান, চীনারাও তাই। তিব্বতীরা বৌদ্ধ, চীনারাও বহু পরিমাণে তাই। বলা যেতে পারে তারা পরস্পরের ধর্মভাই। কমিউনিজম বৌদ্ধ

ধারাকে বিলুপ্ত করতে পারেনি খাস চীন মুলুকে। পারবেও না। সুতরাং তিব্বতীরা কোটি কোটি চীনা বৌদ্ধের সহানুভূতি আশা করতে পারে। তিব্বত ও চীনের মাঝখানে হিমালয়ের মতো দুর্ভেদ্য প্রাচীর নেই। যাতায়াত ও আদানপ্রদান অনেক বেশি সহজ ও স্বাভাবিক। তিব্বতের স্বার্থ চীনের স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। মিটমাট একদিন না একদিন হবেই। ভারতের ভূমিকা হবে মধ্যস্থের ভূমিকা। ভারত চেষ্টা করবে যাতে উভয়পক্ষের বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যায়।

ভারতভাগ কি অনিবার্য ছিল?

ভারত সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম সাহেব অনুভব করেছিলেন যে সরকারের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য ব্রিটেনের মতো ভারতেরও একটি প্রতিনিধি সভা চাই। No taxation without representation—এই নীতি অনুসারে প্রতিনিধিসভা প্রয়োজন। তিনি সরকারী পদ ছেড়ে দিয়ে ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাঁদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, বদরুদ্দিন তৈয়বজী প্রমুখ ভারত বিখ্যাত গুণিজন। এঁদের মতে ব্রিটেনের মতো ভারত একটি নেশন। অতএব ব্রিটেনের মতো ভারতেরও একটি পার্লামেন্ট চাই। সেটি হবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে যাবতীয় ভারতবাসী দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি সমূহের প্রতিষ্ঠান।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন অগ্রগণ্য নেতা। তাঁর সমর্থন চাওয়ায় তিনি বললেন, ভারত একটা নেশনই নয়। তার জন্য একটা পার্লামেন্টের তো কথাই ওঠে না। নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে হিন্দু প্রতিনিধিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। পরে তাঁরা চাইবেন ইংলন্ডের মতো একটা সরকার গঠন করতে। সেই সরকারে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তাঁদের ভোট বেশি থাকায় তাঁরা যা বলবেন তা-ই হবে। মুসলমানদের তাতে কী লাভ? ব্রিটিশরাজের চেয়ে হিন্দুরাজ কিসে ভালো? মুসলমানরা নির্বাচন চায় না, চায় নমিনেশন। তাঁর আপত্তি থাকায় মুসলমানরা বড় একটা কংগ্রেস যোগ দিতে রাজি হন না।

তবে একেবারে যোগ দেন না তা নয়। যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না বা ঝীণা। তিনি স্বীকার করতেন যে ভারত একটি নেশন এবং তার জন্য চাই একটা পার্লামেন্ট। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুদের মধ্যে একটা পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হন কংগ্রেসের এক দল সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর টিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও তাঁদের অনুগামিগণ। তাঁদের প্রিয় সঙ্গীত ছিল 'বন্দেমাতরম'। সেটিকে তাঁরা কংগ্রেসের উদ্বোধনী সংগীত করেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ক্রমশ সরকার-বিরোধী হয়ে ওঠে। তাঁরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন তার মধ্যে ছিল বিলিতী পণ্য ও বিদেশী শিক্ষা পরিহার। তাঁদের কারও কারও প্রশ্রয়ে ছেলেছোকরারা বোমাবাজি শুরু করে দেয়। সরকারকে বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে এক প্রকার সমঝোতা করতে হয়। কিন্তু সরকার স্বীকার করেন না তার সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাল রাখার জন্য আবশ্যক হয় একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের। তার নাম মুসলিম লীগ। নেতারা বলেন, তাঁরা আইনসভার নির্বাচনে রাজি, যদি তাঁদের দেওয়া হয় স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র। এইটেই ছিল সরকারের মনের কথা, কিন্তু মুখের কথা মুসলিম লীগ নেতাদের। প্রবর্তিত হয়ে গেল সেপারেট ইলেকটরেট। একজন প্রতিবেশী ভোট দেবেন মুসলিম কেন্দ্র থেকে, আর একজন প্রতিবেশী ভোট দেবেন অমুসলিম কেন্দ্র থেকে। কংগ্রেসকে এটা হজম করতে হল।

কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা নির্বাচন প্রার্থী হলেন মুসলমান কেন্দ্র থেকে আর কংগ্রেসপন্থী হিন্দুরা অমুসলমান কেন্দ্র থেকে। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য তাঁকে হতে হল মুসলিম লীগের সদস্য। তিনি কংগ্রেস লীগ দুই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে একপ্রকার সেতুবন্ধনের কাজ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, আমি কংগ্রেসে রয়েছি ভারতের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে আর মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থের রক্ষার্থে। তাঁর সেতুবন্ধনের ফলে ১৯১৬ সালে লখনৌ শহরে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিষয় হল weightage অর্থাৎ প্রাপ্য আসনের উপরে বাড়তি আসন। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলির উপরে আরও কয়েকটি বাড়তি আসন দেওয়া হয় হিন্দুর খরচে। আর মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে অমুসলমানদের বাড়তি আসন দেওয়া হয় মুসলমানের খরচে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের দেওয়া হয় শতকরা ত্রিশটি আসন, যদিও তাদের লোকসংখ্যা শতকরা বাইশ। এটা হিন্দুদের ভাগ থেকে কেটে নেওয়া হয় হিন্দুদের সম্মতিতে।

সেই সময় কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীর সংখ্যা কম ছিল। জিন্না সাহেব ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেস যোগ দিয়েছিলেন। একবার সভাপতি হয়েছিলেন হাসান ইমাম, জেনারেল সেক্রেটারি ফজলুল হক। মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর যখন তার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন মুসলিম দুনিয়ার খিলাফত বিপন্ন হয়। কারণ তুরস্কের সুলতানই ছিলেন ইসলামের খলিফা। সেই বিপদে ভারতের মুসলমানরা গান্ধীজীকে বলে তাদের আন্দোলনের পরিচালক হতে, যদিও তিনি মুসলমানই নন।

গান্ধীনেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যাগ্রহ নামক একটি পদ্ধতি ব্যাপক আকারে প্রয়োগ। এই পদ্ধতি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুসরণ করে অনেকটা সফল হয়েছিলেন। ভারতেও কয়েকবার পরীক্ষা করেছেন। তখন সেই গান্ধীকেই কংগ্রেস থেকে আহ্বান করা হয় স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করার। মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার স্বরাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য হতাশ ও বিক্ষুব্ধ। গান্ধী তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। তার জন্য তাঁদের ব্যাপক আকারে সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করতে হবে ও প্রয়োজন হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সঙঘবদ্ধ ভাবে আইন অমান্য করতে হবে।

গান্ধীজীর প্রবর্তনায় খিলাফতপন্থীরা স্বরাজপন্থীদের সঙ্গে একজোট হয়ে কংগ্রেসের সভ্য হন। দেখা গেল মুসলিম লীগে যত মুসলমান তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কংগ্রেসে। আর লীগপন্থীরা খিলাফত আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায় ও জেল থেকে দূরে সরে থাকায় তাঁদের প্রভাবও খর্ব হয়। জিন্না সাহেব যদিও গান্ধীর পরমবন্ধু তবু তিনি অসহযোগ সমর্থন করেন না। আর গান্ধীজী যখন গণ-আইনঅমান্য আরম্ভ করতে উদ্যত হন তখন জিন্না সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বোম্বাই থেকে বরদৌলিতে গিয়ে রাত্রিবেলা উপস্থিত হন। গান্ধীজীকে সাবধান করে দেন যে তাঁর গণ-আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ফৌজ প্রস্তুত। সুতরাং বিপজ্জনক পন্থা পরিহার করে গান্ধীজীও চলুন জিন্নাসহেব ও মালবীয়জীর সঙ্গে মিলে বড়লাট লর্ড রীডিং-এর বৈঠকে যোগ দিতে। মিটমাটের একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবেই। গান্ধীজী জিন্নার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনে বুঝতে পারেন যে দেশ

অহিংসার জন্য প্রস্তুত নয়। সুতরাং গণ-আইনঅমান্যের কর্মসূচী ত্যাগ করেন।

এরপর তাঁকে রাজদ্রোহসূচক রচনার জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়। একদল কংগ্রেসি জেদ ধরেন যে তাঁরা আইনসভায় যাবেন। তাঁদের বলা হয় Pro-changer. আর একদল কংগ্রেসিস্থী গান্ধীজীর প্রোগ্রাম থেকে কোনরকম বিচ্যুতি সমর্থন করেন না। তাঁদের বলা হয় No-changer. একদিকে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়, অপরদিকে খিলাফত আন্দোলন আবশ্যকতা হারায়। কারণ কামালপাশা তুরস্কের সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তুরস্কের সুলতানই শেষ খলিফা। ওদিকে Pro-changerরা নির্বাচনে আইনসভায় যান এবং সেই প্রক্রিয়ায় স্বরাজ অর্জন করতে চান। পরে দেখা গেল, স্বরাজ পাওয়া অত সহজ নয়। তখন আবার সেই গান্ধীজীকেই স্মরণ করা হয়। আবার তিনি গণ আন্দোলনে নামেন। লবণ সত্যাগ্রহে নরনারী নির্বিশেষে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড়লাট আরুইনের সঙ্গে গান্ধীজীর একটা চুক্তি হয়। সাধারণ মানুষ লবণ তৈরি করার অধিকার পায়।

গান্ধীজী দ্বিতীয় রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে গিয়ে দেখেন জিন্না প্রভৃতি মুসলিম নেতারা সমবেত হয়েছেন এবং সকলের দাবি আরও বেশি weightage বা বাড়তি আসন। তার মানে হিন্দুদেরকে ওদের ভাগ থেকে আরও বেশি আসন ছেড়ে দিতে হবে। গান্ধীজী বললেন, তাঁর সে অধিকার নেই। মুসলমানরা খুবই অসন্তুষ্ট হন। কেমব্রিজে পঠনরত একটি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলি ইংরেজি বর্ণমালার থেকে সাত অক্ষর নিয়ে একটি শব্দ উদ্ভাবন করেন। পাকিস্তান। সেই শব্দটি কেউ কোনও দিন শোনেনি। তার তাৎপর্য পাঞ্জাব আফগান কাশ্মীর সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এই প্রদেশগুলি মিলে হবে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও স্বাধীন। 'আফগান' মানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। জিন্না সাহেব এটি হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি মনে করেন, এটি অবাস্তব। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে ওঠেন এর নাছোড়বান্দা দাবিদার।

এর কারণ কংগ্রেসের নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার সবাই মিলে স্থির করেন যে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন অনুসারে যেসব আইনসভা গঠিত হবে তার জন্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেবে। গান্ধীজী যেহেতু অসহযোগী সেহেতু কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেন। কিন্তু কংগ্রেসকে প্রয়োজনমত পরামর্শ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে সরকার গঠন করেন। কোন কোন মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানও জয়লাভ করে মন্ত্রী পদ পান। কংগ্রেসের জয়লাভ ও কংগ্রেসপন্থী মুসলমানের মন্ত্রিত্বলাভ মুসলিম লীগের তৎকালীন দলপতি জিন্না সাহেব সহ্য করতে পারেন না। তাঁর প্রত্যাশা ছিল মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী খাড়া করবে না ও নির্বাচিত মুসলিম প্রার্থীকে মন্ত্রী করবে না। কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে সে রকম কোনও অঙ্গীকার দেয়নি। আর তিনিও অঙ্গীকার দেননি যে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের মতো গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনে যোগ দেবেন ও তাঁর অনুগামীদের যোগ দিতে বলবেন। আর মুসলিম লীগের লক্ষ্যও নয় কংগ্রেসের মতো স্বাধীন ভারত। যেখানে উদ্দেশ্য এক নয় সেখানে কোয়ালিশন সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর হলেও দীর্ঘস্থায়ী নয়। কংগ্রেস এর পর আরও দুটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। তাদের মধ্যে একটি মুসলিমপ্রধান। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর নেতা খান আবদুল গফফর খানের ভ্রাতা ডক্টর খান সাহেব। জিন্না সাহেবের আশঙ্কা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হলে সেখানেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে ও একজন কংগ্রেসপন্থী

মুসলমানকে শাসন পরিষদের সভ্য করবে। কংগ্রেসের দিক থেকে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু মুসলিম লীগের দলপতি জিন্না সাহেব সাফ জানিয়ে দেন যে কংগ্রেসকে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে একমাত্র মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তার মানে কংগ্রেস প্রকারান্তরে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস তা স্বীকার করতে রাজি হয় না। সুতরাং দুই দলের মধ্যে ১৯১৬ সালের মতো কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় না। ব্রিটিশ সরকারের পলিসি ছিল হিন্দুপক্ষে কংগ্রেস ও মুসলিম পক্ষে মুসলিম লীগ প্রথমে একমত হবে। তারপরে ভারত ও ব্রিটেন একমত হবে।

তার মানে দাঁড়াল এই : মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে একমত না হয় তাহলে ব্রিটেন কখনও ভারতের সঙ্গে একমত হবে না। জিন্না সাহেব বুঝতে পারলেন, তাঁর হাতেই চাবি। তিনি যদি বলেন, তিনি সংযুক্ত ভারত চান না তাহলে সংযুক্ত ভারত হবে না। কংগ্রেসকে খণ্ডিত ভারত মেনে নিতে হবে, মুসলিম লীগকে পাকিস্তান ছেড়ে দিতে হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না যে ইংরেজরা জিন্নার দাবি মেনে নিয়ে ভারত ভাগে রাজি হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবে কংগ্রেস চেয়েছিল আপাতত একটি সম্মিলিত সরকার ও যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা। বড়লাট রাজি না হওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রীরা প্রাদেশিক সরকার থেকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে কারাবরণ করেন।

জাপানী আক্রমণের সময় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য ক্রিপস একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রস্তাব করেন। যুদ্ধকালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে যুদ্ধে যোগদান করা সমীচীন নয়। কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব খারিজ করে। তখন গান্ধীজী ইংরেজদের বলেন, 'কুইট ইন্ডিয়া' আর জিন্না সাহেব বলেন, 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট।' যুদ্ধের পর একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন মুসলিম লীগ পাকিস্তনের ইস্যুতে স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্রে মুসলমানদের ভোট চায়। প্রায় সব কটি কেন্দ্রেই মুসলিম লীগের জয় হয়। যেমন প্রদেশগুলিতে তেমনই কেন্দ্রে। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র হেরে যান! ব্যতিক্রম কয়েকটি প্রাদেশিক আসন। বঙ্গপ্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। সিন্ধু প্রদেশেও। কিন্তু পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় একক ভাবে সরকার গঠন করতে পারে না। হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিরা মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগ না দেওয়ায় গভর্নর শাসনভার গ্রহণ করেন।

প্রাদেশিক স্তরে সরকার পুনর্গঠন সমাপ্ত হলে কেন্দ্রেও বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম লীগের শতকরা ত্রিশটি আসন ছিল। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে সেই অনুসারে আসন আশা করতে পারত। কিন্তু মুসলিম লীগ চায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে parity অর্থাৎ সমান সমান আসন বণ্টন। কংগ্রেস কিছুতেই রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় মোট চৌদ্দটি আসনের মধ্যে হিন্দুরা পাবে ছয়টি, মুসলমানরা পাঁচটি, শিখ খ্রিস্টান ও পার্সিদের মধ্যে একটি একটি করে মোট তিনটি। এর পরে কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রাপ্য ছয়টি আসন আর মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রাপ্য পাঁচটি আসন দেওয়া হয়। কংগ্রেস সেই ছয়টি আসনের একটিতে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে নিতে চায়। তাতে হিন্দুর সংখ্যা কম হয়, মুসলমানের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু তাতে মুসলিম লীগ প্রচণ্ড আপত্তি জানায়। কারণ শুধু মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কংগ্রেস তা পারে না। বড়লাট ওয়াভেল কংগ্রেসকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন তারা যেন কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে তাদের বরাদ্দ থেকে একটি আসন না দেয়, যদিও সে অধিকার তাদের আছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

বৈঠকে বড়লাটের অনুরোধ গৃহীত হতে চলেছিল।

এমন সময় গান্ধীজীর প্রবেশ। তিনি বললেন, সে কি কথা! কংগ্রেস তো কেবলমাত্র হিন্দুদের দল নয়, কংগ্রেস হচ্ছে হিন্দু মুসলমান সকলের দল। তার জন্য বরাদ্দ আসনের থেকে সে যদি একটি আসন কংগ্রেসপন্থী মুসলমানকে দেয় সেটা অপরের কাছে আপত্তিকর হবে কেন? কংগ্রেসী মুসলমানরা বারবার জেলে গেছে, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছে, কংগ্রেস কি তাদের বাদ দিতে পারে?

সুতরাং কংগ্রেস থেকে পাঁচজন হিন্দুর সঙ্গে একজন মুসলমানকেও রাখা হল। সেই মুসলমানের নাম আসফ আলি। অনেকে জানেন না যে দিল্লীতে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি ছিল। সেটাই একমাত্র ব্যতিক্রম। আসফ আলি সাহেব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। বড়লাট আর কী করেন? অগত্যা কংগ্রেসের কোটায় আসফ আলি সাহেবকেও নিতে হয়। জিন্না সাহেব তো রেগেমেগে টং। তিনি বলে পাঠালেন যে মুসলিম লীগ বড়লাটের আইন সভায় যোগ দেবে না, সংবিধান সভাও বর্জন করবে।

বড়লাট ওয়াভেল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত না করলে নয়। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে যদি করেন তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় প্রতিনিধিবিহীন হবে। সেই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব বড়লাটকে নির্দেশ দেন কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুকে শাসন পরিষদ গঠনের ভার অর্পণ করতে। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছে এবং তার ফলে কলকাতায় দাঙ্গা বেধে গিয়েছে। হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছে। বড়লাট গান্ধীজী ও জওহরলালজীকে বলেন, আপনারা মুসলিম লীগকে কিছু কনসেসন দিন। তাঁরা বলেন, সে কথা আপনার বিবেচ্য নয়। আপনি আমাদের ডেকেছেন শাসন পরিষদ গঠনের জন্য। আপনি এটা না করলে আমরা ফিরে যাচ্ছি। বড়লাট নেহরুর পররামর্শ মতো চলেন। শাসন পরিবদ গঠন করতে রাজি হন।

জিন্নাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেহরু অনুরোধ করেন শাসন পরিষদে সদলবলে যোগ দিতে। জিন্না বলেন, আমি আপনার আহ্বানে যোগ দেব কেন? আপনি কি বড়লাট? নেহরু ফিরে গিয়ে বড়লাটকে বলেন, মুসলিম লীগ আসছে না। মুসলিম লীগের জন্য বরাদ্দ আসনগুলিতে অন্যান্য দলের মুসলমানদের নিতে হবে। কিন্তু তিনি অন্যান্য দলের কাছ থেকেও সায় পেলেন না। দুজন বন্ধুস্থানীয় মুসলমানকে লীগের পরিবর্তে গ্রহণ করেন।

শাসন পরিষদ গঠন করার পরে দেখা গেল সব কটি ভাল ভাল আসন বেহাত হয়ে গেছে। বল্লভভাই পটেল পেয়েছেন হোম আর বলদেও সিং ডিফেন্স। শোনা গিয়েছিল, জিন্না সাহেবের বাঞ্ছিত আসন ছিল ডিফেন্স আর লিয়াকৎ আলির হোম। কিন্তু একবার ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পরে বড়লাটের বিশেষ অনুরোধে, জিন্না সাহেব নন, লিয়াকৎ আলি সাহেব এলেন আর তিনজন লীগপন্থী মুসলমান ও একজন তপশিলি হিন্দুকে নিয়ে। তাঁর নাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। গান্ধীজী হতচকিত। বলেন, ভালই হল, তপশিলিদের দুজন থাকলেন। লিয়াকৎ আলি সাহেব যখন হোম চাইলেন তখন বড়লাট তাঁকে হোম দিতে গেলে বল্লভভাই পটেল বললেন, আমি চললুম। বলে তলপি গোটাতে আরম্ভ করলেন। বল্লভভাই মানে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। তাঁকে হাতছাড়া করতে বড়লাট নারাজ। অগত্যা লিয়াকৎ আলিকে দেওয়া হল অর্থ দপ্তর। সেই পদে ছিলেন একজন খ্রিস্টান অর্থনীতিবিদ। তাঁকে সরানো হল। ডিফেন্স থেকে গেল বলদেও সিং-এর হাতে। কাজেই জিন্না সাহেব পরে মত পরিবর্তনের সুযোগ পেলেন না।

কংগ্রেস আর লীগকে শাসন পরিষদে আনা হয়েছিল ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার সূত্রে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছতে। ব্রিটিশ পলিসিই ছিল প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের অর্থাৎ কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়া। কিন্তু নাটের গুরু গান্ধী আর জিন্না দুজনেই বাইরে। তাঁদের মুখ দেখাদেখি নেই। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পরে কারামুক্ত হয়ে গান্ধীজী সতেরো দিন জিন্না সাহেবের বাড়িতে দরবার করেছিলেন। জিন্নার সেই এক কথা। মুসলিম নেশন চায় তার হোমল্যান্ড পাকিস্তান। গান্ধীজী বলেন, আপনি কি সেই ন্যাশনালিস্ট নেতা যিনি ভারতের একতায় বিশ্বাস করতেন? জিন্নার বোধহয় অভিপ্রায় ছিল কেন্দ্রের তথা প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু গান্ধীজী বলেন, আগে তো কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হোন, তারপর তাঁদের সঙ্গে আপনারা কথাবার্তা বলুন। আমি কংগ্রেসের মেম্বার নই। আমি কথা দিতে পারিনে। জিন্না সাহেবের ধারণা ছিল গান্ধীই সর্বেসর্বা, হাইকম্যান্ড তাঁর হাতের পুতুল। কিন্তু হাই কম্যান্ডের সঙ্গে গান্ধীর এই মর্মে একটা সমঝোতা হয়েছিল যে সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হলে গান্ধীজী হবেন তার সর্বাধিনায়ক। পার্লামেন্টারি ক্ষমতা গ্রহণের সময় হাইকম্যাণ্ড যা করবার করবে। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শ মান্য করা না করা হাই কম্যান্ডের ইচ্ছাধীন।

বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের পর ঘরোয়াভাবে আলাপ- আলোচনার সুযোগ মেলে নেহরু পটেল ও লিয়াকৎ আলি খানের মধ্যে। গান্ধী জিন্নাকে কী পরামর্শ দেন জানা যায় না। তবে এইটুকু শোনা গেল কংগ্রেস ও লীগ 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ মিটমাট হল না। ঘটে গেল চিরবিচ্ছেদ। একেই বলা হয় 'মোমেন্ট অব ট্রুথ'। সত্যের মুহূর্ত। ভারত ভাগ অনিবার্য।

ভবিষ্যতে ক্ষমতার অংশ পাওয়ার আশা নেই দেখে হিন্দু-শিখরা স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবি তোলেন। কিছুদিন পরে বাংলাদেশের হিন্দুরা, বিশেষ করে বর্ণহিন্দুরা ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা নেই দেখে স্বতন্ত্র প্রদেশ চায়। গান্ধীজী কোন প্রকার পার্টিশন সমর্থন করেন না। না বাংলা দেশের পার্টিশন, না পাঞ্জাবের পার্টিশন। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে নেহরু ও পটেল দুই কংগ্রেস নেতার মত মেলে না। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব কংগ্রেসের ভাগে রেখে অবশিষ্ট মুসলিম প্রধান অঞ্চল ও প্রদেশ মুসলিম লীগের ভাগে ছেড়ে দিতে চান। তার মানে দুই কেন্দ্র দুই প্রস্থ প্রদেশ। জিন্না সাহেব রাজি হন না। কিন্তু বড়লাট মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান তৈরি করেন। তাতে দেশ ও প্রদেশ পাকাপাকিভাবে ভাগ করা হয়। তবে মুসলিম লীগ পায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অসমের সিলেট জেলা। কংগ্রেস মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ চলে যায় লীগ মন্ত্রীদের দখলে।

তার আগে একটি গণভোট হয়। তাতে খান আবদুল গফফর খান-এর দলবল ভোট দেন না। গান্ধীজী তাঁর শিষ্য ও বন্ধু খান আবদুল গফফর খান-এর দলকে নেকড়ে বাঘদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু কী করবেন! পার্টিশন'মেনে নিলে সীমান্ত গান্ধীকে বিসর্জন দিতে হয়। গান্ধীজীর পক্ষে এটা এক প্রকার পরাজয়। তা না হলে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা পক্ষপাতদুষ্ট নয়। অধিকাংশ হিন্দুর ইচ্ছায় খণ্ডিত ভারতে কংগ্রেস-রাজ হয়েছে, অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছায় খণ্ডিত পাকিস্তানে মুসলিম লীগ-রাজ হয়েছে। এই দুই বৃহৎ দলকে একজোট করার সামর্থ্য গান্ধীজীর ছিল না। তিনি মেনেই নিলেন যে হিন্দু-মুসলমানকে একসঙ্গে মেলাতে তিনি ব্যর্থ। তবে তাঁর মতে হিন্দুরা যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে, মুসলমানরা

যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। কাউকেই জোর করে দেশান্তরে পাঠানো হবে না। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায় তো সে তা পারবে। এই নীতি গান্ধীজী আপ্রাণ অনুসরণ করেন। এইজন্যই প্রাণ দেন।

গান্ধীজীর জীবনের কাজ ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। সেই কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসকে সমগ্র ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাঁর সাধ্যের বাইরে। অন্তত গণ-সত্যাগ্রহের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন করতে কেউ পারত না। সেটা অবশ্যকরণীয় হলে তার জন্য গৃহযুদ্ধ বাধাতে হত ও অনেক রক্তপাতের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা হয়ত বিজয়ী হত। কংগ্রেস তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেস চেয়েছিল ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর।

কংগ্রেস যা চেয়েছিল তা-ই পেয়েছে। মুসলিম লীগকে একটা ভাগ না দিলেই নয়। হয় শাসন ব্যবস্থার এক ভাগ, নয় দেশের মাটির এক ভাগ। কংগ্রেস নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছিল বলেই দেশের মাটি ভাগাভাগি করে। এতে বহু লোকের জীবনে নেমে আসে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিপদ। কিন্তু আরও অনেক লোকের আরও অনেক বেশি বিপদ হত। সারা ভারতটাই হত একালের কুরুক্ষেত্র।

মৌর্য বা গুপ্ত বা মোগল কোনও আমলেই ভারত এক শাসনাধীন ছিল না। এটা ব্রিটিশ আমলেই সম্ভব হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মূলতত্ত্ব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ব্রিটিশ ন্যাশনালিজমেরই মানস সন্তান। মানস সন্তান আশা করেছিল শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারী হতে সমগ্র ভারতে। হতেও পারত, যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতেন। কিন্তু সেটা তাঁদের পলিসি ছিল না। তাঁরা মুসলিম লীগকেও অপর উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতের অখণ্ডতার ফ্রেমে কংগ্রেস ও লীগকে স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষমতার ভাগ দিতে। সেটা কোনও দলের পছন্দ না হওয়ায় অবশেষে দেশ ভাগ ও বাংলা ভাগ করতে হলো। যেটা হলো সেটা হলো ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। কংগ্রেস রাজ ও মুসলিম লীগ রাজ। গান্ধীজী আপনাকে শূন্যে পরিণত করলেন। তিনি কারও উত্তরাধিকারী হলেন না। তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সাঙ্গ হলো। বাকি রইল তাঁর নৈতিক ভূমিকা।

কংগ্রেসও দ্বিখণ্ডীকরণ চেয়েছিল

সরকারি আমলার পদে ছিলাম বলে স্বাধীনতার আগের প্রস্তুতি যা দেখেছিলাম, জেনেছিলাম, সেখান থেকেই শুরু করছি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাট্লি সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাস শেষ হওয়ার আগেই ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করবে। ইতিমধ্যে যদি ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে একটা মিটমাট করে নেয়, সেই মিটমাট ইংরেজরা মেনে নেবে। এবং সেই মিটমাট অখণ্ড বা দ্বিখণ্ড যে কোন ভারতের ভিত্তিতেই হতে পারে। আর যদি কোন প্রকার মিটমাট না হয় তবে ইংরেজরা যে কোন এক পক্ষের হাতে ভারতের ভার দিয়ে যাবে না। একাধিক পক্ষের হাতে দিয়ে যাবে।

ওদের একটা গোপনীয় প্ল্যান ছিল। সেটার নাম 'অপারেশন বলকান'। বলকান মানে খণ্ড খণ্ড। অর্থাৎ সেখানে যার হাতে সম্ভব সেখানে দিয়ে যাবে। তখন মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলা হত। তো সেই সময় বিহারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সিং, যুক্ত প্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ)-এর ছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ। অবিভক্ত বাংলার ছিলেন সুহরাবর্দি। এইভাবে এক একটা জায়গার ভার সেই জায়গার প্রধানের হাতে দিয়ে দেবে।

কিন্তু কেন্দ্রের ভার কার হাতে দেবে তার কোন পরিকল্পনা ছিল না। কংগ্রেস ভয়ানক ভয় পেত এই পরিকল্পনাটাকে। তাদের মতে দ্বিখণ্ড ভাল, বহু খণ্ড খারাপ। কেন্দ্র সম্পর্কেও তো কোন কথা ইংরেজরা বলছিল না বলে সেটা নিয়েও ওদের চিন্তা ছিল। কংগ্রেস বরং ভারতের দ্বিখণ্ডীকরণই চাইছিল। দুটি কেন্দ্র হবে এবং দুটি কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে দুটি কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে ভারত ভাগ করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ এবং পাঞ্জাবকেও ভাগ করা চাই। কেননা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাব কেউই পাকিস্তানের সঙ্গে সামিল হতে চায় না। কংগ্রেসের দেওয়া এই চিত্র এবং শর্ত বড়লাট মাউন্টব্যাটেন মেনে নিলেন। জিন্নাসাহেবকেও এই বিষয়টা মেনে নিতে বলা হয়। কিন্তু জিন্না অসম্মত ছিলেন। তখন মাউন্টব্যাটেন তাঁকে এই বলে চাপ দেন যে আপনি যদি অসম্মত হন তাহলে আমরা একটাই কেন্দ্র স্বীকার করব। আর আপনি পাকিস্তান পাবেন না।

বলতে গেলে এ ব্যাপারে কংগ্রেসেরই সবচেয়ে বেশি লাভ হয়। যদিও কংগ্রেস উত্তরপশ্চিম সীমান্তর প্রদেশ হারায়। সিলেট জেলাও পাকিস্তান পেয়ে যায়।

মোটের ওপর কংগ্রেস পেয়ে যায় সারা ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ ও অঞ্চল। সেই সঙ্গে দিল্লি।

এরপর মাউন্টব্যাটেন তখনকার দেশীয় রাজাদের বললেন যে ব্রিটেন আর তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কারণ সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাঁর বিদায় হতে হবে। ফলে তাঁদের কংগ্রেস অথবা লীগের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। কংগ্রেস শাসিত ভারতের আয়তন গেল বেড়ে। যেটা আগে কেউ কখনও ভাবতেই পারেনি। সম্রাট অশোক পারেননি। গুপ্ত সাম্রাজ্য এমন কি মোগল সাম্রাজ্যও এত বড় হতে পারেনি। কংগ্রেস তা পেয়ে গেল। সুতরাং আয়তনের দিক থেকে

কংগ্রেস শাসিত ভারতবর্ষ অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী হল।

তাহলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা ও শিখরা কংগ্রেস শাসিত ভারতের বাইরে থেকে যায়। এবং স্বাধীনতার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়। ওদিকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই কল্পিত। কাজেই তারা উল্লসিত হয়েছে। তবু তাদের মধ্যেও কিছু দুঃখ থেকে যায়, যেহেতু শতকরা ৪০ জন মুসলমান পাকিস্তানের বাইরে রয়ে যায়। ভারত ভাগ কার্যত হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে। ভেঙে চুরে দিয়ে জোড়া লাগাবার জন্য প্রস্তাব আসে লোক বিনিময়ের।

কংগ্রেস রাজি নয়। লীগও নারাজ। সুতরাং লোক বিনিময় বেসরকারিভাবে চলতে থাকে।

পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দু এবং শিখরা প্রায় সকলেই ভারতে চলে আসে দু-এক মাসের মধ্যে। দিল্লিতে দারুণ শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের মুসলমানরা দলে দলে পাকিস্তান রওনা হয়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গেও ঘটতে পারত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপদেশ দেন দেশত্যাগ না করতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অভয় দেন। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন সরকার যদিও লীগ সরকার তবুও তারা লোকবিনিময়ের বিপক্ষে ছিল। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানরা খুব কমই পেরেছে ধর্ম অনুযায়ী যার যার জায়গায় চলে যেতে এবং আসতে। আসলে বিভাগটা রাজনৈতিক।

দেশভাগের ফলে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হল কাশ্মীর। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে খুব একটা সুসম্পর্ক তৈরি না হলেও এই রকম কামড়াকামড়ির অবস্থাও হত না যদি কাশ্মীর নিয়ে একটা সুরাহা হত। গোড়াতেই কেঁচে গেল। ইংরেজরা চলে যাওয়ার আগে তৎকালীন কাশ্মীরের রাজা হরি সিংকেও বলেছিল যে কোন একটা পক্ষ নিতে। আর সবাইকে যেমন বলেছিল।

হরি সিং তখনই কিছু বলেন নি। মনে মনে ভেবেছিলেন ইংরেজরা চলে গেলে এমনিতেই কাশ্মীর স্বাধীন হয়ে যাবে। তারপর নিজে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে নিজেই রাজত্ব করবেন। তিনি কোনদিকেই যাওয়ার কথা বলেন নি। এদিকে ইংরেজরা চলে যেতেই পাকিস্তানের কতগুলি ট্রাইব দল বেঁধে আক্রমণ করল কাশ্মীর। হরিসিং-এর সৈন্য বলতে তখন ডোগরা বাহিনী। তাদের না জানা ছিল রণকৌশল, না ছিল যুদ্ধ করবার মত মানসিক প্রস্তুতি। তখন হরি সিং বিপদে পড়ে কংগ্রেস অর্থাৎ জওহরলালের কাছে সাহায্য চাইলেন। নেহরু বললেন, 'আমাদের হাতে আপনার ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স আর কমিউনিকেশনের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে, তারপর সাহায্য।' হরি সিং রাজিপত্র লিখে দিলেন। তখন সৈন্য গেল। ততদিনে অনুর্বর পার্বত্য কাশ্মীরের দখল সেই ট্রাইবেরা নিয়ে নিয়েছে। ভারত পেল সমতল। ওদিকে জিন্না এবং পাকিস্তান গেল ক্ষেপে। ওরা বলল, হরি সিং কেন আমাদের জানাল না। আমরা সাহায্য করতে পারতাম। সেই শুরু হল বিবাদ, সমতল কাশ্মীর নিয়ে। ভিক্টিম হল হিন্দুরা। জওহরলাল আর কংগ্রেসের ওপরে পাকিস্তানীদের রাগের ফল ভুগতে হচ্ছে হিন্দুদের। আজও ওদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের প্রাণ যাচ্ছে সেই কোপে। এই হল ১৯৪৭ সালের পার্টিশনের সময়ের ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক। এখনও কোন পরিবর্তন হয়নি। জানি না কবে হবে।

এবার আসি স্বাধীনতা ও দেশভাগ বিষয়ে আমার কথায়। দেশভাগের আগে আমি ছিলাম ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট জজ। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেশভাগ চাইনি। কারণ বুঝেছিলাম এটা সমাধান নয়, বিবাদের সূত্রপাত। অতুল্য ঘোষের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে আলাপ হয়েছিল। উনি গান্ধীর ওপর একটি বই লিখেছিলেন। আমি প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু এরপরে সেই অতুল্য ঘোষই পরে একটা বই লিখে দেশভাগ এবং বঙ্গভঙ্গকে যখন সমর্থন করলেন, আমি তার সমালোচনা করলাম। হিন্দু মহাসভার পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও দেশভাগ চাইলেন।

যাইহোক, আমি ময়মনসিংহ থেকে বদলি হলাম। কলকাতায় জয়েন করবার কথা ছিল। আমি কলকাতায় ঢুকলাম না। হাওড়ায় জয়েন করলাম ডিস্ট্রিক্ট জজ পদে। তাই স্বাধীনতার ঠিক আগে ব্রিটিশ শাসনের শেষ সাতদিন আমি ছিলাম হাওড়ায়। হাওড়ার সার্কিট হাউসে বাস করছি। তখন প্রতিদিনই দাঙ্গা হত। চিৎকার চেঁচামেচি। সেদিন অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট মধ্য রাত্রে সার্কিট হাউসে আমি যখন আধো ঘুমে, তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম চিৎকারের শব্দ। তবে সেই চিৎকার ভয়ার্ত নয়, বুঝলাম উল্লাসের। স্ত্রী আমায় বললেন, 'স্বাধীনতা এল।' ইংরেজি মতে মধ্যরাত্রে দিন বদলায়। ভারতেরও দিন বদলালো মধ্যরাত্রে।

তখন গভর্নর ছিলেন বারোজ সাহেব। ভাল মানুষ ছিলেন। সেই বছরই জানুয়ারিতে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম, 'আপনি থাকতে এত দাঙ্গা হচ্ছে কেন?' উনি বলেছিলেন, 'হিন্দু মুসলমান যদি লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব? 'আমরা চলে যাচ্ছি।' সেই প্রথম ওঁর মুখে খবর পেয়েছিলাম ব্রিটিশ চলে যাবে। তারপর ফেব্রুয়ারিতে শুনেছিলাম অ্যাট্‌লির মুখে। যে কথা গোড়াতে বলেছি।

ব্রিটিশ চলে যাবে শুনে চিন্তা হয়েছিল এই ভেবে যে আমাদের অর্থাৎ আই সি এসদের ভার কার ওপর দিয়ে যাবে। কেননা স্বাধীন ভারত কে শাসন করবে তার তো স্থির কোন চিত্র ছিল না। তাই সংশয়। অবশ্য পরে অপশন চাওয়া হয়েছিল ভারতে না পাকিস্তানে কোথায় থাকতে চাই। আমি চেয়েছিলাম ভারতে। কিন্তু কোন কোন হিন্দু সরল বিশ্বাসে পাকিস্তানে (পূর্ববঙ্গে) থাকতে চেয়েছে। যেমন আমার পরিচিত চিত্ত মজুমদার মশাই। কিন্তু তিনি সেই অপশন দিয়ে পরে আপসোস করেছেন।

যাইহোক, স্বাধীনতার ভোরে ভাবলাম আমি বদলি হয়েছি। আমি আর সার্কিট হাউসে থাকতে পারি না নৈতিকভাবে। আমায় জানানো হয়েছিল। আগস্টের ভাঙা মাসের অর্থাৎ এক থেকে ১৪ দিনের বিল জমা দিতে। অবিভক্ত বঙ্গ সরকার ভাঙা মাসের মাহিনা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেবে যথাকালে বাকি ১৭ দিনের টাকা। আমাদের মাইনেরও পার্টিশন হয়ে গেল।

হাওড়া থেকে ভোরবেলা কলকাতায় আসতে যাব, এমন সময় আমাকে এসে মুরারিমোহন দত্ত ধরলেন হাওড়া ময়দানে পতাকা তুলতে। আমি তো চমৎকৃত। মুরারিবাবু তখন উকিল ছিলেন, পরে হাইকোর্টের জজ হয়ে সুপ্রিম কোর্টের জজও হয়েছিলেন। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ভোরে পতাকা তুললাম। তবে সরকারি চাকুরে ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে নয়। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় হিসেবে। আর একটা পরিচয়ও ছিল, তা হল গান্ধীভক্ত। তখন খদ্দর পরতাম।

এরপরে একদিন অতুল্য ঘোষ তাঁর হরিতকী বাগান লেনের বাড়িতে প্রাইভেট এক সভায় ডেকে নিয়ে গেলেন। মঞ্চে আমি উপবিষ্ট। নিচে সামনে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজন নতুন মন্ত্রী বসে। সজনীকান্ত দাসও ছিলেন। যাদবেন্দ্র পাঁজা, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, কমলকৃষ্ণ রায়, রাধানাথ দাস প্রভৃতি মন্ত্রী। সকলকে হিতোপদেশ দিলাম। সকলে মাথা নিচু করে ভয়ানক বিনীতভাবে আমার কথা শুনলেন। সেদিন খুব বিনীত দেখেছিলাম ওঁদের। পরে তেজ দেখেছি।

সেদিনও কিন্তু উঁচুপদের সরকারি চাকুরে হিসেবে উপদেশ দিইনি। দিতে হয়ত পারিও না। কিন্তু দিতে পেরেছিলাম একজন গান্ধীভক্ত হিসেবে। যে পরিচয়টার জন্য অতুল্যবাবু ডেকেও ছিলেন। যে পরিচয়ের জন্য ওই মন্ত্রীরাও বিনীত ছিলেন আমার উপদেশ শুনেও।

বাঙালি হিন্দু বাংলাদেশে পরবাসী

ছেলেটির পুরো নাম মনে নেই। পদবী বড়াল। গোপালগঞ্জ মহকুমায় বাড়ি। শান্তিনিকেতনে আমার বাড়িতে নবাত বিক্রি করতে আসে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'নিরাপত্তার জন্য চলে এসেছি। আমার মামা এখানে থাকেন।' সালটা ১৯৬৪। হজরত বাল চুরি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কি এদেশে থেকে যাবে?' সে বলল, 'না, বাবু, এদেশটা নরক, ওদেশটা স্বর্গ। আমি সুবিধে বুঝলেই ফিরে যাব।' কথায় কথায় একথা বলল, 'বেবাক হিন্দু এদেশে চলে আসেনি। এখানে এসেছে যারা, প্রত্যেকেই নিজের বাড়িতে একজনকে রেখে এসেছে।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি কেমন করে যাবে। তোমার তো পাসপোর্ট-ভিসা নেই।' সে বলল, 'ওসব আপনার লাগবে, আমার লাগবে না। বর্ডারে দালাল আছে। তাকে টাকা দিলেই সে পার করে দেবে।' কিছুদিন পরে তাকে আর দেখতে পেলুম না। বুঝতে পারলুম সে দেশে ফিরে গেছে।

আমি পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দুজায়গাতেই কাজ করেছি। খাওয়াদাওয়ার দিক থেকে পূর্ববঙ্গ সেরা। ঔরঙ্গজেব নাকি বলেছিলেন, বাংলাদেশ একটা নরক, কিন্তু সেখানে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে দুজনের ধারণা দুরকম হলেও মোটামুটি এটা ঠিক যে খাওয়াদাওয়ার সুখ পূর্ববঙ্গেই বেশি। কোন্ দুঃখে তাহলে হিন্দুরা অমন দেশ ছেড়ে চলে আসে? সেটা আসলে দেহের নয়, মনের। তারা মনে করে যে পশ্চিমবঙ্গেই তারা নিরাপদ, পূর্ববঙ্গে নয়। পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে।

বড়ালের সঙ্গে কথাবার্তার বেশ কিছুকাল পর পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়। হিন্দুরা আশা করেছিল, এখন থেকে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হলো। এখন থেকে সবাই বাঙালি। সকলেই বঙ্গভাষী। সকলের সমান অধিকার। সকলের সমান মর্যাদা। কিন্তু বছর পাঁচেক পর দেখা গেল যে বাঙালি মুসলমানরা যত না বাঙালি তার চেয়ে বেশি মুসলমান। তাদের ধর্মভ্রাতারা কেউ থাকে মরক্কোতে, কেউ নাইজিরিয়ায়, কেউ সৌদি আরাবিয়ায়, কেউ ইরানে, কেউ মালয়েশিয়ায়, কেউ ইন্দোনেশিয়ায়। ধর্মাভ্রাতারাই ভাষাভ্রাতাদের চেয়ে আপন। তবে বিহারি মুসলমানরা ব্যতিক্রম। তারা উর্দুভাষী বলে অনাত্মীয়।

বাংলাদেশে একটা আইডেনটিটি সংকট চলছে। দেশের নাম বাংলাদেশ, ভাষার নাম বাংলা, অথচ রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম। এর তাৎপর্য হলো ইসলাম যাদের ধর্ম নয় তারা বাঙালি হলেও তাদের অধিকার ও মর্যাদা মুসলমানের সমান নয়। তাহলে কেমন করে কোনও হিন্দু তার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রদের ভবিষ্যৎ ভেবে বাংলাদেশের মাটিতে শিকড় গাড়বে? তারা তো যেকোনও সময়ই ছিন্নমূল হতে পারে। রাষ্ট্র বাংলাদেশের হিন্দুকে বৈমাত্রেয় সন্তানের মতো মনে করছে। আর হিন্দুও রাষ্ট্রকে তার বিমাতা মনে করছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও সে দেশ থেকে হিন্দু চলে আসছে। কতক হিন্দু আসছে নিরাপত্তার অভাবে, কতক আসছে আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে। কতক হিন্দু ওপারেও সম্পত্তি রাখতে চায়,

এপারেও সম্পত্তি করতে চায়। কতক হিন্দু আসছে আর যাচ্ছে, যাচ্ছে আর আসছে। কতক হিন্দু একটা নতুন ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে, তার নাম মাল-পাচার ও মানুষ-পাচার। কতক হিন্দু রাজনীতিবিদ্‌দের প্ররোচনায় অকারণে আসছে, রাজনীতিবিদ্‌দের ভোট বৃদ্ধি করছে। কতক হিন্দু বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। যারা সেতুবন্ধনের কাজ করছে তাদের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

মোটকথা, এপার আর ওপার দুপারেই বাঙালি বাস করলেও তাদের মধ্যে না আছে একতা, না সহমর্মিতা। এক পক্ষের দুঃখে অপর পক্ষ দুঃখিত হয় না। এক পক্ষের সুখে অন্যপক্ষ সুখী হয় না। সব হিন্দু চলে আসবে না ঠিকই. কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা ওপারে দিনকে দিন কমতেই থাকবে। ইতিমধ্যেই হিন্দুরা শতকরা তেত্রিশ থেকে শতকরা এগারোতে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে তাদের মনে একটা অসহায়ভাব জন্মাচ্ছে। একথাও আমার কানে এল যে হিন্দুকে মুসলমান করা কোন কোন স্থানে চলছে। মৌলবাদীরা নাকি বলছে তারা শতকরা তিনজন মাত্র হিন্দুকে রাখবে। আর সবাইকে মুসলমান করবে কিংবা দেশছাড়া করবে।

মৌলবাদীদের ধারণা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু পারছিনে। তার কারণ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে মৌলবাদীদেরই দাপট বেশি। যতদিন না মৌলবাদীদের চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের দাপট বেশি হচ্ছে ততদিন বাংলাদেশে হিন্দুরা ভয়ে ভয়েই থাকবে ও থাকতে না পারলে সীমান্ত পার হবে। এটা একটা অসমাপ্য অধ্যায়। আমরা কেউ জোর করে বলতে পারছিনে যে দুহাজার খ্রিস্টাব্দের পর আর একজনও হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়বে না।

বহু শতাব্দী বাদে মৌলবাদীরা পেয়েছে দার-উল ইসালম। বাংলাদেশ যদি দার-উল ইসলাম না হয় তাহলে তাদের বহু শতাব্দীর প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে। তারা বাংলাদেশকে দার-উল ইসলাম করবেই। তাদের সঙ্গে আপোস অসম্ভব। যেমন অসম্ভব ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই বিরোধ আখেরে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নয়, এটা আখেরে বাংলাদেশ বনাম দার-উল ইসলামের বিরোধ। বাংলাদেশ বলতে প্রগতিশীল বাঙালি মুসলমানকেও বোঝায়, কেবল হিন্দুকে নয় বা খ্রিস্টানকে নয় বা বৌদ্ধকে নয়। বল পরীক্ষায় প্রগতিশীল মুসলমানরা হারবে না জিতবে তা কেউ বলতে পারে না।

বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দু নিজ বাসভূমে পরবাসী। তবে এটাও মানতে হবে যে তারাও যত না বাঙালি তার চেয়ে বেশি হিন্দু।

দন্তের সহিতে জিহ্বার পিরীতি

মনে পড়ে গেল বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পংক্তি : দন্তের সহিতে জিহ্বার পিরীতি সুযোগ পাইলে কাটে। এটাকে একটু বদলে নিয়ে বলতে পারা যায়, বি জে পি-র সহিতে বি এস পি-র পিরীতি সুযোগ পাইলে ছাঁটে। সকলেই জানেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কুমারী মায়াবতী, এক দলিত কন্যা, শুনেছি রজকিনী। রজকিনী রামীকে নিয়ে যদি বৈষ্ণব কবিতা হয় তবে রজকিনী মায়বতীকে নিয়েই বা কেন রাজনৈতিক কবিতা হবে না? আমি ইতিমধ্যে একটা ছড়া লিখেছি। এখন লিখছি একটি নিবন্ধ।

পার্লামেন্টে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের লেবার গভর্নমেন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন কমন্সসভায় সেই সরকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। তাই তাঁকে লিবারল পার্টির সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে গভর্নমেন্ট চালানো যায় না, অথচ কোয়ালিশনেও আপত্তি আছে এরূপ ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পালামেন্টারি পদ্ধতিতে সরকার গঠান করা চলে না। তাহলে কি আবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক? না, সেটাও অনভিপ্রেত। কে জানে, আবার যদি একই রকম ফল হয়। জনমত তো এত অল্প সময়ের মধ্যে বদলে যায় না। সেইজন্য অপর একটি দলের উপর নির্ভর করে লেবার গভর্নমেন্ট গঠন করা ব্রিটেনের পার্লামেন্ট মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু ভারতে দেখতে পাচ্ছি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এমন দলও তার চেয়ে সংখ্যাগুরু অপর এক দলের সৌজন্যে সরকার গঠন করছে, অথচ তার সঙ্গে কোয়ালিশনে আপত্তি। কেন্দ্রে চন্দ্রশেখর সরকার এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সরকার নির্ভর করেছিল রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের উপরে। কংগ্রেস সরে দাঁড়ানোয় চন্দ্রশেখর সরকারের পতন হয়। এর আগে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সরকারও ভারতীয় জনতা পার্টির সৌজন্যে গঠিত হয়েছিল। উক্ত পার্টি সরে দাঁড়ানোয় বিশ্বনাথ প্রতাপ সরকারের পতন হয়। কেন যে এঁরা সংখ্যালঘু সরকার গঠন করলেন, কেন যে এঁরা নতুন নির্বাচন চাইলেন না তার কারণ দেশ অল্প সময়ের মধ্যে বারবার সাধারণ নির্বাচনে রাজি নয়। যেমন দেখা যাচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন হবে তাতে কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না। তখন হয় কোয়লিশন গঠন করতে হবে, আর নয়তো অন্য কোনও দলের সাহায্যে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে পতনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তার মানে আরও একদফা নির্বাচন। মানুষ তিক্তবিরক্ত হয়ে সংবিধান পরিবর্তনের চিন্তা করবে। রাষ্ট্রপতি হবেন সরকার গঠন করার মালিক, প্রধানমন্ত্রী নন।

এবার উত্তরপ্রদেশে যা দেখা গেল সেটা আরও তাজ্জব। যে দলটি ছিল মুলায়ম সিং সরকারের জুনিয়র, পার্টনার সেই দলটি দলছুট হয়ে সরকার গঠন করেছে। মুলায়মের পরম শত্রু ভা জ পা হয়েছে তার গাছে ওঠার সিঁড়ি। তাজ্জব বললুম এজন্যে যে ভা জ পা দলে ভারি। তারই সরকার গঠন করার কথা বহুজন সমাজ পার্টির সমর্থনে। সে নিজে সরকার গঠন না করে একটি ক্ষুদ্র দলকে সরকার গঠন করতে দিয়েছে শুধুমাত্র মুলায়ম সিং যাদবকে আটকানোর

জন্যে। কিন্তু সেই দলের নেতারা ভাবতে পারেননি নতুন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী হবেন পুরাতন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের মতোই ধর্মনিরপেক্ষ। কাশী ও মথুরা দুই জায়গাতেই কুমারী দাপটের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাম্প্রদায়িক অভিযান দমন করেছেন। দেখেশুনে মনে হয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে তিনি মাথা তুলতে দেবেন না। তার মানে ভা জ পা-র পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেবেন। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্তাব্যক্তিরা কতদিন এই দাপট সহ্য করবেন? বেশিদিন করলে তো তাঁরা ভবিষ্যতে নির্বাচনে হেরে যাবেন। অপর পক্ষে আচমকা মই সরিয়ে নিলে মায়াবতী গাছ থেকে পড়বেন সেকথা ঠিক, কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে মুলায়মের জিৎ হতে পারে। তাতে কল্যাণ সিং-এর আর কী লাভ? আমি কংগ্রেসের কথা বলছিনে। কারণ কংগ্রেস এখন কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। মায়াবতী গেলে মুলায়ম সিং, মুলায়ম সিং গেলে মায়াবতী—এছাড়া তৃতীয় কোনও ব্যক্তি হবেন কি না সেবিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। মনে হয় না যে এঁরা কেউ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। অতএব গোঁজামিল ছাড়া গতি নেই, যদি না দু-তিনটে দল মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে, আর নয়তো অন্তহীন রাষ্ট্রপতি শাসন।

যাদব বলে যাঁরা দাবি করছেন, কিছুকাল আগে তাঁদের পরিচয় ছিল তারা গোপনন্দন বা গোয়ালা। যে কারণে কায়স্থরা ক্ষত্রিয় হলেন, বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ সেই কারণে গোয়ালারা বনছেন যদুবংশী ক্ষত্রিয়। এরপর রজকরা কী হবেন দেখা যাবে। একটা অভ্যুত্থান যে ঘটছে এগুলি তার এক একটি দৃষ্টান্ত। এটা হিন্দু সমাজের নিচে থেকে উপরে। সেইসঙ্গে নারীরও অধিকার ও মর্যাদা পুরুষের সমান হচ্ছে। মায়াবতীর উদয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস

আমাদের জাতীয় জীবনে একটা সৃষ্টিশীলতা বরাবরই ছিল। প্রত্যেক শতাব্দীতেই আমরা কিছু না কিছু সৃষ্টি করেছি। কখনও মঙ্গলকাব্য, কখনও বৈষ্ণব পদাবলী, কখনও শাক্ত পদাবলী, কখনও বৌদ্ধ দোঁহা। কোনওদিনই সৃষ্টির বিরাম ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে এর ওপর আমরা সাক্ষাৎ পেলুম ইংরেজি দর্শন ও সাহিত্যের। আমরা দেখলুম, সাহিত্যের বিভিন্ন পথ। নানা দিক খুলে গেল। এপিক লিখতে পারা যায়, লিরিক লিখতে পারা যায়, তা আমরা প্রত্যক্ষ করলুম। নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধের মত বিভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় ঘটল। এ সব জিনিস তো আগে ছিল না। যদি থাকে, তা হলেও ছিল বহু আগে। সেই সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে, বাংলা ভাষার যুগ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে। কিন্তু বাংলা আলাদা একটা ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পরে তার সম্পদ বিশেষ ছিল না। ইংরেজি সাহিত্য আসার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুকরণে বা অনুসরণে বা তার প্রেরণায় হঠাৎ নতুন এক জোয়ার এল। এতদিন আমরা ব্যাপৃত ছিলুম মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী লিখতে। সেটা এবার নতুন এক খাতে বইতে আরম্ভ করল। তারই মধ্যে একটা খাত হচ্ছে উপন্যাস। ইংরেজিতে যাকে বলে নভেল তাই বাংলায় উপন্যাস হল।

আলালের ঘরের দুলাল বা নববাবু বিলাসের মত কিছু কিছু উপন্যাস লেখার চেষ্টা আমাদের হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সার্থক উপন্যাস লিখলেন। তিনি ছিলেন খুব ভাল ইংরেজি পড়ুয়া। খুব ভাল ইংরেজির ছাত্র ছিলেন তিনি। সিদ্ধহস্ত লেখক বলা যায়। তিনি বাংলা লিখতে শুরু করলেন। ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা করেছিলেন, ইংরেজিতেই লেখা শুরু করেন, কিন্তু নিজেকে সেই পরের ভাষায় পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারছেন না দেখে নিজের ভাষা বাংলায় লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু লিখতে আরম্ভ করে দেখেন, কাদের নিয়ে লিখবেন?

প্রেমের উপন্যাস লিখতে হলে যাঁদের নিয়ে লিখতে হয়, তাঁরা হলেন পূর্ণবয়স্ক নারী। কিন্তু আট বছরে যাদের বিয়ে হয়ে যায়, তাদের নিয়ে প্রেমের উপন্যাস লেখা যায় না। বারো-চোদ্দ বছরে যারা বিধবা হয়ে যায় তাদের নিয়েও প্রেমের উপন্যাস লিখতে পারা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখতে হল রাজপুত মেয়েদের নিয়ে, যাদের বিয়েটা একটু বেশি বয়সে হত। তিনি তাও কাল্পনিক গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। কল্পনা করলেন যে বাঙালি সমাজেও নাকি এ রকম বিয়ে হয়েছে আগে। উপন্যাসের উপাদান পেলেন ইতিহাস থেকে এবং কল্পনা থেকে। কিন্তু তাঁর আশপাশের জীবনে কই? আসলে তাঁর আমলে সমাজে সে রকম নারী পাওয়া যেত না। কুমারী এবং বয়স্ক, যে প্রেমে পড়তে পারত, এমন মেয়ে নেই। তাদের সকলের বিয়ে হয়ে বসে আছে। যদি কোনও তরুণী বিধবা হয়ে থাকে তো তার অনেক বিধিনিষেধ আছে। তার প্রেমে পড়া বারণ। বড় জোর হতে পারে একটুখানি মানসিক প্রেম, শরীরের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমের যুগে, প্রেমের উপন্যাস বলে যা পাচ্ছি, তা আধুনিক নয়। সে উনবিংশ শতাব্দীরই নয়, অন্য শতাব্দী থেকে তিনি তৈরি করেছেন।

আধুনিক সমাজ থেকে, আশপাশের জীবন থেকে যদি প্রেমের কাহিনী লিখতে হয় তা হলে

সেই সমাজ, জীবনের ওপর ভাল দখল রাখতে হয়, সেই জীবনের সব খবর রাখতে হয়। সেটা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'চোখের বালি' একেবারে আধুনিক জিনিস। সেটা কোনও পূর্ব ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়নি, একেবারে আশপাশের জীবন থেকে নেওয়া। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সমাজে প্রেমের ব্যাপারে খুব বাধা আছে। ভালবাসা আছে। কিন্তু সমাজ ভালবাসাকে বাগড়া দিচ্ছে। তাই এ ধরনের প্রেমের গল্প কোনওটাই মিলনের গল্প নয়। বিচ্ছেদই প্রাধান্য পাচ্ছে। নারী চলে যাচ্ছে কাশী বা অন্য কোথাও, পুরুষও চলে যাচ্ছে অন্যস্থানে। পুরুষের অন্য অন্বেষণ বড় হয়ে উঠছে। এই ছিল অবস্থা। 'নৌকাডুবি'তে চেষ্টা করা হল একটু দাম্পত্য সম্পর্ক আনতে। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল পরস্ত্রী পরপুরুষ হয়ে গেল তারা। তারা আলাদা হয়ে গেল। মিলনের কোনও প্রশ্নই উঠল না। 'গোরা'তেও দেখা যাচ্ছে তিনি মিলন যা ঘটাচ্ছেন, তা একটা বিবাহ সম্পর্কের পরিণতির প্রতি ঝোঁক থেকে। বিনয়ের সঙ্গে ললিতার পরিণয় তিনি চাইছেন। সুচরিতার সঙ্গে গোরার বিয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু হতে পারছে না। জাতের বাধা আছে, ধর্মের বাধা আছে। গোরা যে আসলে কী তা তো কেউ জানে না।

তিনি ঠিক যে রকম উপন্যাস লিখতে চাইছিলেন, তা লিখতে পারছিলেন না। যে কারণে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। সমাজের বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। হ্যাঁ, 'শেষের কবিতা'য় অনেকটা পেরেছিলেন। আধুনিক যুগ, শিক্ষিত মেয়ে, বয়স বেশি হয়েছে—এ রকম একটা সময়ে 'শেষের কবিতা' লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি সাহস পাচ্ছেন না। অমিত আর লাবণ্যর বিয়ে দিতে পারলেন না। তাদের মধ্যে প্রেম হচ্ছে, কিন্তু মিলনের কোনও ইঙ্গিত নেই।

'চার অধ্যায়' তো রাজনৈতিক ব্যাপার। আরও ছোটখাট উপন্যাস লিখলেন। কিন্তু সমাজের অবস্থা অনুকূল না থাকায়, যা তিনি চাইছিলেন তা করতে পারলেন না। 'নষ্টনীড়' খুব উল্লেখযোগ্য লেখা। কিন্তু সেখানেও মিলনের কোনও ইঙ্গিত নেই। আর বিয়ে তো হতেই পারে না। কারণ, চারু বিবাহিতা। এ শুধু হতে পারে একটুখানি 'কাফ লাভ'। আসলে, খুব একটা ভাল প্রেমের উপন্যাস তিনি লিখতে পারেননি। তার জন্য দায়ী সমাজ। তিনি হিন্দুসমাজকে ভয় পেতেন। তিনি সরাসরি সমাজকে কখনও আঘাত দেননি। অসামাজিক নানা ধরনের ঘটনা তো আশপাশে ঘটত। সে সব তিনি জানতেন। তাঁর পরিবারের মধ্যেও অনেক কিছু ঘটেছে। সে সব কাহিনী তাঁর উপন্যাসে কিন্তু আসছে না। লিখতে পারলে ভাল হত, কিন্তু হল না।

গল্প এগনোর জন্য তিনি সব সময় প্রেমের ওপর নির্ভর করতেন না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'গল্প যদি দেখ এগোচ্ছে না, তা হলে একটা কোনও চরিত্রকে মেরে ফেলবে।' যেমন হয়েছে 'চতুরঙ্গে'। একের পর এক মারা গেল। কেন তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের আগে নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। 'তিনপুরুষে'র তিনটি জেনারেশনে আমরা দেখতে পেলাম গল্প যেভাবে এগোচ্ছে, সেভাবে শেষ হল না। বারবার বদলাল। কারণটা কী? কারণ হল, 'যোগাযোগ' উপন্যাসে তিনি ঠাকুরবাড়ির অনেক কাহিনী নিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ি ছিল গল্পের খনি। নানান ঘটনা ঘটত। গোড়ার দিকে যা লিখলেন, তা ঠাকুরবাড়ির ঘরের কথা। কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা ভাবলেন, এ কী করছ তুমি! আমাদের ঘরের কথা বাইরে আনছ কেন? তাই তিনি থেমে গেলেন। তবু এই উপন্যাসে খানিকটা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা ভাল প্রেমের উপন্যাস আশা করেছিলুম। কিন্তু পাওয়া গেল

না। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে অনেক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কিছু আধুনিক মহিলা চরিত্র নিয়ে এসেছেন। সমাজটাকে দেখিয়েছেন। অভয়াকে নিয়ে এসেছেন। রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে এসেছেন। প্রেমজ বিবাহের কথা আছে। প্রেমের গল্প তিনি অনেক লিখেছেন। গল্প ভাল লিখতেন। কিন্তু সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না।

আমি তাঁর সম্বন্ধে বলব যে, শরৎচন্দ্র বাইরে অনেক সাহস দেখালেও ভেতরে ছিলেন এক রক্ষণশীল বৃদ্ধ। তাঁর মধ্যে একটা ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সংস্কার ছিল, তিনি কিছুতেই বিধবার বিয়ে দেবেন না। রাধারাণী দেবীকে তো বলেওছিলেন যে বিধবার বিয়ে দেবেন না। প্রেম হচ্ছে, সবই হচ্ছে, তবু বিধবার বিয়ে হবে না কেন? আইন আছে। কিন্তু ওই রক্ষণশীলতা। তিনি বলতেন, বিধবার বিয়ে দিলে হিন্দু সংস্কারে বাধবে। সমাজ কী বলবে! অথচ তখন অনেকে বিধবা বিয়ের পক্ষপাতী, কোনও ভয় নেই—তবু। রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তরও বিয়ে হল না। সেই সমাজের ভয়, সংস্কারের ভয়। প্রেমের জন্য স্যাক্রিফাইস তো দরকারই। সে না থাকলে আর কী দাঁড়াল?

সম্ভাবনা ছিল একটা 'গৃহদাহে'। কিন্তু সবদিকে শেষ পর্যন্ত সামলে দেবার কথাই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবলেন। সুরেশকে না মেরে উপায় ছিল না, কারণ অচলাকে ডিভোর্স তাঁর পাঠিকারা পছন্দ করতেন না। যদিও ব্রাহ্ম বিবাহে ডিভোর্স আইনসম্মত ছিল। অচলা ও মহিম ব্রাহ্ম। এত জায়গা থাকতে মহিমকে তিনি ঠিক সময়ে গৃহশিক্ষকরূপে নিয়ে এনে ফেললেন অচলার কাছে। যাতে অচলা শেষ পর্যন্ত এত কিছুর পরও ঘরে ফিরতে পারে। 'চরিত্রহীনে' দিবাকর আর কিরণময়ী পালাল বটে, কিন্তু সেখানেও বিয়েটা হতে পারল না। সাহসের পরিচয় অবশ্য এই পালানটাতেই আছে। তবে কিরণময়ী দিবাকরের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিল।

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার সে কারণে বিশেষ কোনও নালিশ নেই। ইলোপ করেছে, নায়ক-নায়িকা কিন্তু বিয়ে করতে পারছে না, সামাজিক বাধা আছে—এসব হয়ই। যেমন 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী। বিয়ে হতে পারত না। আর্টের দাবি মেটাতে হবে। যেমন 'শেষ প্রশ্ন'। কমল স্বাধীন নারী। সে বিধবা। তাকে একজন ভালোবাসে, সে তাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র দিলেন না। কী কৈফিয়ত দেওয়া যাবে? বলছেন, যদি বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকি তা হলেই প্রেম থাকবে। তা হলে আইডিয়াটা হল, লিভিং টুগেদার উইদাউট ম্যারেজ। কিন্তু অন্যরা তো বিয়ে করছে। তারা তো সুখে আছে, প্রেমের অভাব নেই। আসলে এসব কোনও কথা নয়, তাঁর আপত্তি আছে বিবাহে। বিধবার বিবাহটাই তিনি মেনে নিতে পারবেন না। স্বাধীন নারী কিন্তু বিধবার মত কৃচ্ছ্রসাধন করেই কাটাতে হবে। এ আবার কী? লিভিং টুগেদার তখনই সমর্থন করা যায় যখন সামাজিক বিয়েতে বাধা আছে। সুযোগ থাকলে মা হতে আপত্তি কী? আর্ট কী দাবি করে? সংস্কারের কাছে আর্টের দাবি হেরে যাচ্ছে। বঙ্কিমের মত সংস্কার।

আমরা যখন লিখতে শুরু করলুম, জোর দিলুম প্রেমের পর বিবাহের ওপর। বিয়ে করতে হলে আগে প্রেমে পড়তে হবে। সে সধবা হতে পারে, বিধবা হতে পারে, কুমারী হতে পারে। আমার 'সত্যাসত্যে' সধবা উজ্জয়িনীর প্রেমে পড়েছিল দে সরকার। 'ক্রান্তদর্শী'তে বিধবা বিবাহ দিয়েছি। প্রেম কোনও বাধা মানে না। সধবার প্রেমও তাই স্বাভাবিক। তবে সমাজের বাধার জন্য সব ক্ষেত্রে বিবাহ সম্ভব হয়নি। সধবাকে বিয়ে করতে গেলে ডিভোর্স চাই। ডিভোর্সের আইন আছে, কিন্তু ডিভোর্স সহজে পাওয়া যায় না। হিন্দু বিবাহে ডিভোর্স তো ছিলই না।

পরের দিকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আমার প্রিয় হচ্ছেন সতীনাথ ভাদুড়ি। খুব শক্তিমান লেখক। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এক আশ্চর্য উপন্যাস। 'জাগরী'ও খুব ভাল উপন্যাস। আমার

স্ত্রী অনুবাদ করেছিলেন 'জাগরী'। সতীনাথ আমার সাকসেসর। উত্তরাধিকারী। আমি মিন্টো মহমেডান হস্টেলে যে ঘরে থেকে এম এ পড়েছিলুম সে ঘরেই তিনি থাকতেন। আমাকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনার উত্তরাধিকারী।' আমি ওঁর পাঠক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও খুব বড় লেখক।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমি পছন্দ করি খুব। কিন্তু বিভূতি কোনও সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাননি। জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখ—এসব নিয়ে অনেক লিখেছেন, ভালই লিখেছেন। কিন্তু কোনও একটা সমস্যার ব্যাপারে আলোকপাত করতে তিনি পারেননি। আমাদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। বৌদ্ধিক সমস্যা, প্রেমঘটিত সমস্যা, সামাজিক সমস্যা তাঁর লেখায় খুব পাওয়া যাবে না। বিবরণ খুব ভাল দিতে পারতেন। নায়ক নায়িকার প্রেমও আছে, কিন্তু তা হার্মলেস। ত্রিকোণ প্রেম বা অন্যান্য জটিল সম্পর্কগুলো কোথায় গেল! বিভূতি খুব ঘরোয়া জীবন লিখতে ভালবাসতেন।

তারাশঙ্করও গ্রামের জীবন নিয়ে অনেক লিখেছেন। গ্রাম চিনতেন। বেশ ভাল জানতেন চরিত্রগুলোকে। গ্রামের জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখেছি, কোনও বৃহৎ ঘটনার মধ্যে কোনও বৃহৎ সমস্যা আসছে না। যেমন এসেছিল 'গোরা'য়। একটা বড় সমস্যা। বড়ভাবে লেখা। সে জিনিস বা তার ছায়া তারাশঙ্করের কোথায়! 'কবি', 'কালিন্দী' আমার ভাল লাগে।

একটা কথা বলি, এ লেখায় সাহিত্যিকদের কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা কিন্তু করিনি। যে যাঁর মত লিখেছেন। তিনি যেটা লিখতে চেষ্টা করেছেন, সেটা পেরেছেন কি না তাই-ই বিচার্য। আমি যে রকম লিখি অন্যরা তো সে রকম লেখেন না। তাই মিল খুঁজতে চাওয়া ঠিক নয়।

মৌলবাদ একদিন মিলিয়ে যাবেই

খবরের কাগজ : ভারতে বাংলাদেশ উৎসব হয়ে গেল, এই সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? এরকম উৎসব কি প্রতি বছর হওয়া প্রযোজন?

অন্নদাশঙ্কর রায় : বাংলাদেশ উৎসবের খবর জেনে আমার খুবই ভাল লেগেছে। প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমি বাংলাদেশ উৎসবে যেতে পারিনি। উৎসব হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। শুধু এরকম নয় আরো ব্যাপকভাবে উৎসবের আয়োজন করা উচিত। ইতিপূর্বে রায়মঙ্গল, পদ্মাগঙ্গা প্রভৃতি বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ ও ভারতের সাংস্কৃতিক উৎসব করার চেষ্টা করেছে। এরশাদ আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করলেও যেতে রজি হইনি। যদিও কলকাতা থেকে অনেকেই তাঁর নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঢাকা গিয়েছেন। একজন জেনারেল ক্ষমতা দখল করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রকে হত্যা করা। গণতন্ত্র হত্যাকারীর আমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমেই দেখতে হবে কে বা কারা নিমন্ত্রণ করেছেন। নিমন্ত্রণকারীর গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করবে যাওয়া না যাওয়া। বাংলাদেশ থেকে গ্রহণযোগ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিমন্ত্রণ পাঠালে সুন্দর হয়। যেমন— বাংলা একাডেমি। আমরাও নিমন্ত্রণ পাঠাতে পারি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে। এই আকাদেমির সভাপতি হিসেবে বলছি, বাংলাদেশ থেকে কেউ আসতে চাইলে আমাদের আকাদেমিকে জানিয়ে এলে আমরা সেই ব্যক্তি বা সংগঠনকে সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা দেব। যে দেশ থেকেই নিমন্ত্রণ করা হোক না কেন তা যদি রাজনীতিমুক্ত সংগঠন থেকে করা হয়, তবে সেটাই হবে সুন্দর, গ্রহণযোগ্য, উত্তম।

খঃ ক: কবি শামসুর রাহমানকে গত ৩১ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ডি-লিট প্রদান করেছে, এ খবর পেয়ে আপনার কেমন লেগেছে?

অঃ শঃ রায়: আমি মনে করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই অনারারি ডি-লিট ডিগ্রী বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যকে প্রদান করেছে। শামসুর রাহমানকে আমি দীর্ঘদিন থেকে জানি। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাছাড়া শামসুর রাহমানের নাম আমার প্রিয় লেখকদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। শামসুর রাহমানকে যাদবপুর ডি-লিট দেওয়ায় আমার খুব ভাল লেগেছে। ইতোপূর্বে রবীন্দ্র ভারতী মনসুর উদ্দীনকে ডি-লিট দিয়েছিল, সে সংবাদও আমাকে আনন্দ দিয়েছে। বাংলাদেশে ও আরো কয়েকজনকে ডি-লিট দেয়া উচিত।

খঃ কা: তাঁদের নাম বলবেন কি?

অঃ শঃ রায়: না, তাঁদের নাম বলব না। যেসব প্রতিষ্ঠান ডি-লিট দেবে তারাই যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে নেবে। শামসুর রাহমানের কাজ শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যের জন্যে নয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। দেশ ভাগ হলেও সাহিত্য এবং বাঙালি জাতি ভাগ হয়ে যায়নি। আমরা এখানে যারা কাজ করছি তাদের সৃষ্টিও সমগ্র বাংলা সাহিত্যের।

খঃ কা: উপমহাদেশে মৌলবাদের যে ভাবে উত্থান ঘটছে তাতে আপনি বর্তমান ও পরবর্তী

প্রজন্মের কথা ভেবে কি চিন্তিত?

অঃ শঃ রায়: মোটেই চিন্তিত নই। আমি বিশ্বাস করি মৌলবাদ একটি খারাপ হাওয়া, যা একদিন মিলিয়ে যাবেই।

খঃ কা: মৌলবাদীদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হলেও। এদের রুট কোথায় বলে আপনি মনে করেন?

অঃ শঃ রায়: মৌলবাদের রুট হচ্ছে শাস্ত্র। আর এক শ্রেণীর অবুঝ, স্বার্থান্বেষী, উম্মাদ লোক ওদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। মৌলবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীনকে ধরে রাখা। এরা পড়ে রয়েছে মধ্যযুগে। প্রগতিশীল, আধুনিক চিন্তাকে এরা সব দেশে, সব সময়ে বাধা দিয়ে আসছে। এরা আমাদেরকে স্বকীয় বিশ্বাস নিয়ে থাকতে বাধা দিচ্ছে। মৌলবাদীরা প্রগতিশীল ব্যক্তিদের জেলে দিতে চাইছে, ফাঁসি দিতে চাইছে। শুধু হিন্দু বা মুসলিম মৌলবাদীই নয়, খ্রিস্টান, ইহুদী প্রভৃতি মৌলবাদীরাও প্রাচীন শাস্ত্রে বিশ্বাসী। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, সব মৌলবাদের উদ্দেশ্য এক। কোন প্রগতিশীল ব্যক্তি কিন্তু মৌলবাদীদের আঘাত করছে না। আমরা আধুনিক চিন্তা চেতনা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। মৌলবাদ যত শক্তিশালীই হোক-না, তা ক্ষণস্থায়ী। কারণ ওঁর ভিত্তি অবৈজ্ঞানিক, মধ্যযুগীয়।

খঃ কা: আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার দেশ যে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছিল, তা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাঙ্গে স্মরণ করবে বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ, পক্ষান্তরে জামাতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। স্বাধীনতার দুই যুগ পরে সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামাত আওয়ামী লীগের শরিক দলগুলোর একটি, এটা আপনি কীভাবে নেবেন?

অঃ শঃ রায়: যদিও ব্যাপারটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবুও বলছি কাজটি মোটেও ভাল হচ্ছে না। কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে জামাত শেয়ার চাইবে। ওরা মূল্যহীন করে দিতে চাইবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে। ভূলুণ্ঠিত করে দিতে চাইবে স্বাধীনতার আদর্শকে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপমানিত করতে চাইবে। রাজাকার নেতাকে বি এন পি-র শরিক দলের ভূমিকা পালন করে জামাত পুনর্বাসিত করেছে। আবার ওরা এখন আওয়ামী লীগের পিছু পিছু হাঁটছে, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য রয়েছে এতে। আমার মনে হচ্ছে জামাতকে শরিক দল করে আওয়ামী লীগের ক্ষতিই হচ্ছে। ওদের কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

খঃ কা: এবার আপনার কাছে একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে জানতে চাইছি। ভারতের পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশের বাজার অনেকাংশে দখল করে ফেলেছে। কিন্তু তার শতাংশও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসছে না। এটা কেন হচ্ছে?

অঃ শঃ রায়: দেখ, আমি মনে করি সীমান্ত হচ্ছে কৃত্রিম। মানুষের চাহিদার প্রবল বেগকে এই কৃত্রিম সীমান্তের পক্ষে আটকে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের এখানে বাংলাদেশের জামদানী, বালাম চাউল, পদ্মার ইলিশ ইত্যাদির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাহিদা অনুযায়ী এখানে বাংলাদেশের পণ্য পাঠানো। তোমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনও দেশের সরকারেরই নিষেধাজ্ঞা থাকা অনুচিত।

খঃ কা: বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় আমরা চাইলেই ভারতের বই পত্রিকা ম্যাগাজিন কিনতে পারি। কিন্তু কলকাতায় বাংলাদেশের বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিনের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও

তা আসছে না। এই ব্যাপারটি আপনি কিভাবে দেখছেন?

অঃ শঃ রায়: পূর্ব পাকিস্তান আমলে আমি কিছু বই আনার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা আটকে দিয়েছিল। আমি এখানকার ডেপুটি হাইকমিশনকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছি বাংলাদেশ থেকে বই পত্রিকা কেন আসছে না, আপনারা আনার উদ্যোগ নিন। শেখ মুজিবের শাসন আমলে বাংলাদেশ থেকে এখানে নিয়মিত পত্রিকা-বই আসত। আমি তখন বাংলাদেশের একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা পত্রিকা প্রতিদিন রাখতাম। সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা রাখতাম' নিয়মিত। আমি এখনো বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা কিনতে উদগ্রীব। 'রায় মঙ্গল' বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী করেছিল। আমি শুনেছি প্রদর্শনীতে খুব ভিড় হয়েছিল।

ডলার/পাউন্ডের সিস্টেম থাকা অনুচিত, অন্তত বই পত্রিকা আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে। টাকা ও রুপির একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার বেঁধে দিলে ভাল হয়। সহজও হবে বইপত্রিকা আসা যাওয়ায়।

খঃ কা: আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সপরিবারে নিহত হবার খবর শুনে আপনার মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল? বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার আজো হচ্ছে না, আপনি কিভাবে নিচ্ছেন এই ব্যাপারটি?

অঃ শঃ রায়: (২/৩ মিনিট নির্বাক থাকলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল) আমাদের জাতীয় দিবস ছিল সেদিন। আনন্দবাজার অফিসে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। দুপুর ২/৩ টার দিকে আনন্দবাজারের সম্পাদক সপরিবারে শেখ মুজিবকে হত্যা করার সংবাদ জানান আমাকে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। বাসায় ফিরে এলাম 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখলাম, প্রবন্ধটি 'দেশ'-এ পাঠালাম। কিন্তু সাগরময় ঘোষ প্রবন্ধটি না ছেপে ফেরত দিল, কেন ছাপালে না সাগরময়কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু ছাপতে নিষেধ করেছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলাম। চিঠি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আমাকে ফোন করে তাঁর অফিসে যেতে বললেন। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বললেন, আপনার এই লেখা ছাপা হলে বাংলাদেশ থেকে এক কোটি হিন্দু এখানে চলে আসবে। তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখুন। আমি তাঁকে বললাম, একজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আমি তো শুধু সেই কথাই লিখেছি। এটা তো কোন রাজনৈতিক লেখা নয়। লেখাটি ছাপা হলে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাই চলে আসবে এটা কেমন কথা! তখন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আপনার লেখাটি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিছুদিন পরে ইন্দিরা গান্ধীর একটি চিঠি এলো। তিনিও লেখাটি না ছাপানোর জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন। 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' কোন পত্রিকায় আর ছাপা হলো না। এর কিছুদিন পরে একজন প্রকাশক প্রবন্ধটি বই আকারে ছাপানোর প্রস্তাব দিলে আমি আরো কিছু প্রবন্ধ এক সাথে করে প্রকাশককে ছাপতে দিই।

আমি চাই বাংলাদেশে শেখ মুজিব হত্যার বিচার হোক এবং বাংলাদেশের জন্যই এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া খুবই প্রয়োজন। আমি আরো চাই ঢাকাতে তাঁর স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হোক। গান্ধীজীর জন্যে যেমন দিল্লীর রাজঘাটে স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়েছে। শেখ মুজিব হত্যার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আমি বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।

খঃ কা: কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্ট্যাচু রয়েছে। বাংলাদেশে কি

এরকম উদ্যোগ নেওয়া উচিত?

অঃ শঃ রায়: স্ট্যাচু নির্মাণ করার আগে তা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তবে স্ট্যাচু করার চেয়ে তাঁদের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এমনকি শহর বা গ্রামও হতে পারে।

খঃ কা: যুগ যুগ ধরে মানুষ যা উপলব্ধি করতো, কিন্তু বলার সাহস পেতো না। সেই সত্য বলার সাহস দেখিয়েছেন তসলিমা নাসরিন। আপনি নাসরিনকে এজন্যে কিভাবে নিচ্ছেন?

অঃ শঃ রায়: তসলিমা নাসরিন যা লিখেছে সত্য লিখেছে, আমি সব সময়ই সত্যের পক্ষে। 'খবরের কাগজ'কে আমি ধন্যবাদ জানাই তসলিমা নাসরিনের সাহসপূর্ণ লেখাগুলো ছাপানোর জন্যে। আমি আগে বলেছি, এখনো বলছি, তসলিমা নাসরিনের জন্ম নেওয়ার কথা ছিল একুশ শতাব্দীতে, সে জন্মেছে এই বিংশ শতাব্দীতে। ওর জন্ম হবার কথা ছিল ইউরোপে। সে জন্মেছে বাংলাদেশে।

পরশু আমাকে ফোন করেছিল। সব সময় পুলিশ প্রহরায় রাখা হচ্ছে ওকে। কারো সাঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারছে না, এজন্য হাঁপিয়ে উঠেছে। সে বাংলায় কথা বলার জন্য উদগ্রীব। ঢাকা অথবা কলকাতায় আসতে চায় বাংলায় কথা বলার জন্য। সেখানে কোন বাঙালির সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তসলিমা নাসরিনকে ধৈর্য ধরে এখন সেখানেই থাকতে বলেছি।

খঃ কা: বাংলাদেশের জন্যে আপনার কোন শুভেচ্ছা বার্তা?

অঃ শঃ রায়: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হচ্ছে ঐক্যের ভিত্তি। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য এই ঐক্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকুক, এটা আমি সব সময় কামনা করছি।

প্রবাসী বাঙালির সমস্যা

[১৯২৭ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সারা ভারতে প্রথম স্থানাধিকারী অন্নদাশঙ্কর চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেন ১৯৫১ সালে। প্রধান কারণ, পূর্ণ সময়ের জন্য সাহিত্য করা।]

প্রশ্ন : নানা প্রয়োজনে বাঙালিরা বহুদিন ধরে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। তরুণ বয়সে আপনাকেও বেশ কিছু কাল বিদেশে বসবাস করতে হয়েছে। ফলে আমরা পাঠকরা 'পথে প্রবাসে'র মতো অমূল্য গ্রন্থটি পেয়েছি। কিন্তু বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোনও মোহ কি তখন আপনাকে আচ্ছন্ন করেনি?

উত্তর : আমাকে দু'বছর ইংল্যান্ডে গিয়ে থাকতে হয়েছিল। ১৯২৭-এ গিয়েছিলাম। শিকড় আমার ভারতীয় মাটিতে, সেটা ছিঁড়ে ফেলতে চাইনি কখনও। সে-সময় অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এঁরা সব পাকাপাকিভাবে বিদেশে বসবাসের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। আবার অনেকেরই, তাঁদের সংখ্যাই বেশি, শিক্ষান্তে ফিরে আসতেন দেশে। ফিরে এসে নিজেদের দেশের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন—এমন অনেক খ্যাতনামা মানুষ ছিলেন সেই আমলে। কঠিন পরিশ্রম করে এঁরা বিদেশে শিক্ষা অর্জন করতেন। আর্নিং অ্যান্ড লার্নিং। বাঙালি কোথায় ছিলেন না তখন। অমিয় চক্রবর্তী (কবি অধ্যাপক) ব্রিটিশ গায়নাতে স্থায়ী বসবাসকারী একজন বাঙালির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আমি কিন্তু দেশে ফিরব বলেই ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম। আমেরিকায় যাওয়া হয়নি। ঘটনাচক্রে এক মার্কিন তরুণী ভারতে আসেন। অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ এবং 'লীলা রায়' নাম গ্রহণ করে আমার ঘরণী হন।

প্রশ্ন : অতীতের তুলনায় আজকের কৃতী সন্তানরা দেশে ফেরার আগ্রহ কম দেখান। সেকাল ও একালের বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গির এমন তফাত কেন?

উত্তর : পরিস্থিতি এখন অনেক বদলেছে। পেশাগত ঝুঁকি মানুষ নিতে চাইবে কেন কাজের পরিসর যখন অনেক প্রশস্ত বিদেশে? তবু ফিরে আসেন অনেকে। এসে আবার চলেও যান কেউ কেউ। তাঁদের মধ্যে আবার অনেক যান প্রধানত সন্তানদের কারণে। বিদেশে জন্মানো সন্তানদের এখানে মানিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা কম। তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাও আছে। তুলনায় ক্ষীণ হলেও দেশের দিকে ফেরার স্রোতটা এখনও বহমান।

প্রশ্ন : মূল্যবোধ ক্ষয় হচ্ছে, পরিবর্তিতও হচ্ছে দ্রুত। নানাভাবে আদর্শের বিচ্যুতি ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবাসের বাঙালিরা দেশের ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত হবে কী ভাবে?

উত্তর : দেশের প্রতি অনুগত থাকাটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। অনেকদিন বিদেশে থাকলেও দেশের প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে—এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচুর পাওয়া যায়। প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে যা খবর পাই, দেশের প্রতি অনুগত থাকার প্রবণতা কম নয়। দেশের মহান ঐতিহ্যকে অনেকেই মনেপ্রাণে লালন করেন।

প্রশ্ন : বিদেশে যেসব বাঙালির সন্তান জন্মেছে, তাদের সঙ্গে বাবা-মা'র প্রজন্মগত ব্যবধান তৈরি হয় অনেক সময়। এই ব্যবধান কমিয়ে আনার কোনও পথ আছে কি?

উত্তর : ব্যবধান তৈরি হচ্ছে অবশ্যই। দেশের সম্পর্কে কতটুকু জানার সুযোগ পায় বিদেশে জন্মানো সন্তানেরা? তাদের সমস্যা কিছু কম কঠিন নয়। যে দেশের নাগরিক, ধরো আমেরিকার, সেখানে সমান আমেরিকান হতে হবে। না হলে সেখানকার সমাজে, পরিবেশে মানাতে পারবে না। তা ছাড়া সহজলভ্য আনন্দের জীবনের আকর্ষণ তো রয়েছেই।

প্রশ্ন : নতুন প্রজন্মকে মাতৃভূমির প্রতি আকৃষ্ট করার উপায় কী?

উত্তর : বাঙালিদের অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া দরকার বিদেশে বাংলা বিদ্যালয়, সংস্কৃতিকেন্দ্র স্থাপন করা। রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতীয় আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের মতো। আমাদের দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতির মতো মূল্যবান অবলম্বনগুলির সঙ্গে আরও বেশি করে পরিচিত হতে হবে নতুন প্রজন্মকে। সন্তানদের শুধু শুধু দোষ দিয়ে লাভ হবে না। দেশের নানান সম্ভার তাদের সামনে মেলে ধরতে হবে। প্রবাসী বাবা-মা সন্তানকে নিয়ে সুযোগ-সুবিধেমতো দেশ থেকে ঘুরে যেতে পারেন, ঘোরেনও তাঁরা। ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের মিশিয়ে দিতে হবে। দায়িত্ব সব তরফেরই রয়েছে। তাদের দেশে যাতায়াতের স্পৃহা বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন : দেশের ও প্রবাসের বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তৈরি করার সেরা উপায় কী? বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিদেশের বাঙালিদের মধ্যে প্রসারের সঠিক পথটিই বা কী?

উত্তর : সংস্কৃতির যোগসূত্র তৈরির উপায় তো কঠিন নয়। যোগসূত্র তো স্থাপিত হচ্ছেই। সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, লেখকদের ওঁরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যাচ্ছেন কেউ কেউ। পরিকল্পিতভাবে এই সূচিটি গ্রহণ করলে লাভের মাত্রা বাড়বে। ওখানকার লেখক-শিল্পীদেরও খুঁজে বের করে নিয়মিতভাবে দেশে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

এখানকার বইপত্র নিয়ে বিদেশে কেনা ও পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দান, উপহার হিসেবেও আমরা বইপত্র বিদেশে পাঠাতে পারি। ওখানকার বাঙালিরাও বেশ কয়েকটি পত্রিকা বের করেন। হাতে আসে কিছু কিছু। সেসবের প্রচার বেশি হলেই মঙ্গল। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখক তো বেরিয়েছেন ওখান থেকেই।

প্রশ্ন : কোন পথে গেলে বাঙালি আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে?

উত্তর : এই মুহূর্তে খুব স্বচ্ছ কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা রেখে পরিশ্রমী হতে হবে। মনটা বিক্ষিপ্ত করে রাখলে কোথাও এগনো যায় না। ধ্যান করার মতো কাজ করে যেতে হবে। যে বিষয়টা নিয়েছি তাতে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। অন্তত শ্রেষ্ঠত্বের কাছাকাছি যেতে হবে। এই একটা সঙ্কল্প, ধ্যান। নন্দলাল বসু চিত্রকর, জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানসাধক, স্যার যদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক। এঁরা নিজেদের বিষয় নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন। অন্য পাঁচটা বিষয়ে মন দেননি। এখন নিজের বিষয়ে কেউ যদি পাঁচ মিনিট দেন তো পাঁচ মিনিট যায় টেলিভিশনে। তারপর আবার অন্য কিছু শস্তার রঙ্গ। এসবের থেকে নিজেকে আলগা রাখতে হয়। কী বিষয়ে কাজ করব, সেটা জানতে হবে। দেখতে হবে কোন্‌টা কার ক্ষেত্র। সেই অনুযায়ী ধ্যান, পরিশ্রম। তাহলে এমন কিছু মানুষ পাব, যাঁদের নিয়ে গর্ব করতে পারব বাঙালি বলে। সত্যজিৎকে নিয়ে গর্ব করতে পারছি, রবিশঙ্করকে নিয়ে গর্ব করতে পারছি। কথা হচ্ছে, তুমি তোমার কাজ করে যাবে, সাধনা চালিয়ে যাবে। নীরব সাধক রয়েছেন। একেবারে নেই, ও-কথা বিশ্বাস করি না। তাঁরাই উঁচুতে তুলতে পারেন দেশকে।

প্রশ্ন : এখন যদি আপনি আবার প্রবাসে যান বাঙালিদের সবার আগে কী বলবেন?

উত্তর : বলব, যেখানে বাস করছ সেখানকার সঙ্গে একাত্ম হবে। তাঁদের গান-বাজনা-নাটক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হবে। নিজের শিকড়ের প্রতি টান থাকবে, সেটা লালিতও হবে। আমেরিকানরা শিকড়ের টানেই ইউরোপে যান, তাঁদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের টান অনুভব করেন। প্রবাসে বসবাসকারী নতুন প্রজন্ম, আগামী প্রজন্মের বাঙালিরা দেশের প্রতি টান উপেক্ষা করতে পারবেন না। এক সময়ের বাঙালিরা ইউরোপীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না, এখন তো পারছেন। আদানপ্রদানের ব্যবস্থার উন্নতিতে অনেক কিছুই গ্রহণ করা যায় এখন। এই উন্নতি আরও বাড়বে। বাড়াতে হবে গ্রহণ ক্ষমতা। (হাসতে-হাসতে) আমার ছোট বৌমা বহু বছর বিদেশে, কিন্তু বাড়ির গাছের লঙ্কা দিয়ে রান্না করেন।

প্রশ্ন : প্রবাসী বাঙালিদের জন্যে আপনার বিশেষ কোনও পরামর্শ বা উপদেশ আছে?

উত্তর : যোগসূত্র রাখবেন। দেশকে ভুলবেন না। যেখানে আছেন খাপ খাইয়ে নিন। বাহিরাগত ভাববেন না নিজেকে—কী আচরণে, কী চিন্তায়। ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করে যান।

সাক্ষাৎকার : অভী সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমি এখনও অতিক্রম করতে পারিনি।

টলস্টয়ের ২৩টি গল্পের সঙ্কলন আমি বাল্যকালে স্কুল থেকে পুরস্কার রূপে পেয়েছিলুম। সে বয়সে আমি সে গল্পগুলির মহত্ত্ব বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারি। সে রকম মহৎ গল্প লিখতে পারলে আমি ধন্য হতুম। সম্পূর্ণ অলঙ্কারহীন সরল, সহজ ভাষায় লেখা গল্প। কিন্তু হৃদয়কে অভিভূত করে। সে রকম গল্প না লিখে আমি ছড়ায় মন দিয়েছি। আমি ছড়া লিখতে শুরু করি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে। কিন্তু তাঁর অনুকরণে নয়। তাঁর ছড়ার মধ্যে চাতুরি ছিল। সোফিস্টিকেশন ছিল। কিন্তু আমাদের সাবেককালের ছড়ার স্বতঃস্ফূর্ত আর অকৃত্রিম। সে রকম ছড়া মুখে মুখে তৈরি হয়। একজনের মুখ থেকে চলে যায় আরেকজনের মুখে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, জনগণের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে। গান দিয়ে অনেক দূরে তিনি গিয়েছিলেন। হয়ত আরও অনেকদূর যেতেন। কিন্তু তাঁর গান বাউলের গানের মত সাধারণ মানুষের প্রাণে সাড়া জাগায় না। সাধারণ মানুষ বলতে আমি বুঝি—গ্রাম্য সাধারণ। নাগরিক সাধারণ নয়। নাগরিক সাধারণ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে, সানন্দে গ্রহণ করেছে।

গান্ধীজী গ্রাম্য জনগণের অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। কিন্তু এমন কিছু লিখে যাননি যা টলস্টয়ের সেই ২৩টি গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি সাহিত্যিকই নন। তিনি একজন সন্ত। তাঁর সন্তসুলভ অনেক উক্তি আছে। একত্র করলে একটি ধর্মগ্রন্থের মত হতে পারে। আমার জীবনের ওপর তাঁর প্রভাব পড়েছে। সাহিত্যেও দু-একটি চরিত্র তাঁরই আদর্শে সৃষ্টি করেছি। যেমন, 'সত্যাসত্য'র সুধী ও 'ক্রান্তদর্শী'র সৌম্য। সন্তের গান, রাম-সীতার গানই ছিল গান্ধীর মতে সংস্কৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ভিন্ন। সংস্কৃতি ছাড়া তো সমাজের রূপবিকাশ ঘটে না। যেমন গান্ধীজী আধ্যাত্মিক, নৈতিক ছাড়া চলেন না। রবীন্দ্রনাথ অন্যরকম সংস্কৃতির কথা ভাবতেন।

এই তিনজনই ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব। এখন আর সে রকম দেখি না। গড়পড়তা সুশিক্ষিত মানুষ আগের চেয়ে বেশি দেখা যায়। কিন্তু অসাধারণদের সংখ্যা আগের চেয়ে কম। তবে কোনও সমাজেই রবীন্দ্রনাথের মত বিশাল মাপের ব্যক্তিত্ব সহজে পাওয়া যাবে না। তিনি ছবি আঁকছেন, গান লিখছেন, কবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। কোনও সমাজেই এ রকম মানুষ শত শত মিলবে না। কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছে এমন মানুষও তো এখন সব দেশেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নিজের দেশেই জগদীশচন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন, জবাহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, মহম্মদ ইকবাল এঁরাও তো যে যাঁর ক্ষেত্রে উচ্চ স্থানের অধিকারী। কিন্তু এঁদের পরের জেনারেশনে যাঁদের নাম করা যেতে পারে, তাঁদের উচ্চতা এঁদের মত নয়। অন্যান্য দেশেও আমরা আগেকার মত দিকপাল বড় একটা দেখতে পাই না। তবে গড়পড়তা বিদ্বান ও বিদগ্ধদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে।

এ রকম মানুষ আর এ যুগে হবে না। গান্ধীজী খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তিনি চরকা কাটতে বলেছিলেন যাতে সমস্ত মানুষ না হোক, অনেক মানুষের উপার্জন ঘটে। কিন্তু তা হয়নি। মিলের কাপড় সে বাজার কেড়ে নেয়। আমি গ্রামে গিয়ে দেখেছি, যারা চরকা কাটছে তারাই চরকায় কাটা সুতোর কাপড় পরতে চায় না। অর্থাৎ, চরকা বাঁচাতে গেলে ভদ্রজনের ওপর

নির্ভর করতে হবে। কেন করবে তারা? স্বার্থত্যাগ করা সোজা কথা নয়। দিনের পর দিন স্বার্থত্যাগ করা খুব শক্ত। বিশেষত স্বাধীনতার পর।

রবীন্দ্রনাথের মত মানুষও আর এ যুগে হবে না। সে রকম বাপ নেই, সে রকম পরিবার নেই। সে রকম অর্থসম্পদ নেই। এখনকার মা-বাবারা তো ছেলেকে পিটিয়ে পাঠায় স্কুলে। স্কুল পালান ছেলে কই? যদি থাকে কোন্ বাবা তা সহ্য করবে? রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষিত, তবে তা সাধারণ স্কুলের শিক্ষা নয়।

একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত আমার সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। তারপর আর নেই। আমার নিজের কথা আমি নিজের মত করে বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথের মত করে নয়। ছেলেবেলায় সকলেই বলে বাবার মত হব, কিন্তু বড় হলে আর বাবার মত হতে চায় না। নিজের মত হতে চায়। আমিও নিজের মত হতে চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে আমি কিছু চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছিলুম। 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' পড়ে মনে হয়েছিল শেষটা ঠিক হয়নি। চরিত্র ও ঘটনার পরিণতি অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল। তাই আমি এগুলো আমার মত করে লিখতে চাইলুম। কিন্তু পারলুম না। কাহিনী নিজের মত চলে। তার দাবি অনুপেক্ষণীয়। আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমার শাসন মানছে না। আমি তাদেরকে তাদের ইচ্ছেমত বাঁচবার স্বাধীনতা দিই। তবে আমার উপন্যাসের ending আমার নিজের মতে ঠিক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলোর অনেকগুলিই কিন্তু হয়নি। আমার কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বদলেছে। আমার চরিত্ররা রবীন্দ্রনাথকে উপন্যাসের গোড়ায় যেভাবে দেখেছে, পরে দেখেছে অন্যভাবে। কারণ, জীবনের নিয়মই তো বদল। যে বদলাচ্ছে, সেই বেঁচে আছে। আমার চরিত্ররা সব জীবন্ত। তবে 'পথে প্রবাসে' লিখেছিলুম অল্পবয়সে। তার কথা আলাদা। সে লেখার অনেক মতই আমার পরে বদলেছে। সেখানে লিখেছিলুম, রবীন্দ্রনাথই শেষ মহাকবি। এখন আর তা বলতে পারি না। সময়ই সবকিছুর বিচার করে। সময়ই এর উত্তর দেবে।

গুরুদেবের নিজের লেখাও কি বদলায়নি? তাঁর গোড়ার দিকের উপন্যাস আর পরের দিকের লেখায় অনেক তফাত। 'ঘরে বাইরে'-তে বিমলা চরিত্রের পরিণতি আমার ভাল লাগেনি। শুনেছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুরুদেবকে বলেছিলেন, স্বামীর টাকা চুরি করে বিমলা যে লজ্জা পেয়েছে তা হিন্দু স্ত্রীর চরিত্রোপযোগী নয়। হিন্দু স্ত্রী মনে করেন, স্বামীর টাকা আমারই টাকা। তা ছাড়া, স্বামী থাকলেও অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম তো হতেই পারে। এ তো স্বাভাবিক। তবে সে যাই হোক, পরে আমরা অন্য রবীন্দ্রনাথকে পাই। 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী চরিত্রটি খুবই আধুনিক। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর স্বজনদের পড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন সবাই তটস্থ হয়ে শোনেন। কেউ কোন মন্তব্য করতে সাহস করেননি।

গুরুদেব আমাকে একটা লেখা লিখতে বলেছিলেন। সে আর হয়ে উঠল না। মহাভারতে কৃষ্ণ মারা যাবার পর তাঁর ষোল হাজার স্ত্রীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার সময় অর্জুনকে পরাভূত করে দস্যুরা। কৃষ্ণের স্ত্রীদের নিয়ে পালিয়ে যায় ওই দস্যুরা। কিন্তু কৃষ্ণের স্ত্রীরা দস্যুদের সঙ্গে যাবার সময় খুব আনন্দ পেয়েছিল। কারণ, গুরুদেব বলেন, ওই দস্যুরা ছিল ছদ্মবেশী প্রেমিক। এই কাহিনীটা নিয়ে তিনি আমাকে একটি নাটক লিখতে বলেন। আমি বললুম, আপনি এই 'আনন্দের' খবর কোথায় পেলেন? উনি বললেন, মহাভারতেই। ফিরে এসে মহাভারত খুলে দেখি, সত্যিই কৃষ্ণের স্ত্রীরা দস্যুদের দ্বারা অপহরণের সময় এঁদের কেউ কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ছদ্মবেশী প্রেমিক কি না সে সম্বন্ধে মহাভারত নীরব।

প্রসঙ্গ : কবিতা, ছড়া ও ব্যালাড

প্রশ্ন : ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর এই ৫৩ বছরে বাংলা সাহিত্য তার বিভিন্ন ধারায় কতটা অগ্রসর হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের বিস্তৃতি বিপুল। তাই এক কথায় এর অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা কখনই বলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রভৃতি নানা ধারায় বিভক্ত সেখানে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে অতি সহজেই কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়। এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম, তথ্যানুসন্ধান ও বিশেষ করে গবেষণা আবশ্যক। সব চাইতে বড় কথা হল আমিই বা বলার কে?

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্যচিন্তা ও কর্মের পেছনে ছিল বিশ্বজনীনতার দৃপ্ত আবাহন। আপনার সাহিত্যকর্মের মধ্যেও আমরা এই ব্যাপারটি প্রতিফলিত হতে দেখি। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

উত্তর : প্রথমেই বলব বাংলা সাহিত্য হল মূলত বাঙালিদের। তাই বাঙালিদের সন্তুষ্ট না করে বিশ্বকে কখনই সন্তুষ্ট করা যায় না। এখন এই বাঙালিদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম ভাগ হল বাংলাদেশের বাঙালি ও দ্বিতীয় হল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। এই দুই বাঙালির সাহিত্যিক মান যথেষ্ট উন্নত। এখন এদেরকে সন্তুষ্ট করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এদেরকে সন্তুষ্ট করেই তবে বিশ্বসাহিত্যর আঙিনায় প্রবেশ করতে হবে। এই কাজটা যিনি যতটা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন সেই ব্যক্তিই ততটা সফল সাহিত্যিক পদবাচ্য হয়ে উঠবেন। আর বাংলা সাহিত্য তখনই বিশ্ব আঙিনায় তার বিজয় কেতন ওড়াতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন : বাংলা কবিতা ও ছড়ার পার্থক্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি নিরূপণ করেছেন। আপনার কাছে 'কবিতা' ও 'ছড়া' কিরূপে প্রতিভাত হয়।

উত্তর : ছড়া জিনিসটি মূলত মুখে মুখে বানানো হয়। যার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে লোকমুখে প্রচলিত অসংখ্য ছড়ার ভান্ডার। যা কখনও কখনও লেখনীর মধ্যে দিয়ে বা কখনও প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে, বাংলা লোকসাহিত্যের ধারাকে পুষ্টি দান করেছে। যে কোন হাল্কা বিষয়ের ওপরই ছড়া রচিত হয় রসিক মানুষের মুখে মুখে। সেখানে কবিতা একটু গুরুগম্ভীর রসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কবিতা বিষয়গত, ভাবগত ও কবির কল্পনার অন্বয় সাধিত হয়ে কায়া গঠন করে। এখন আমরা যে ছড়া লিখি তা সাহিত্যে লিখিত রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু ছড়ার সার্থকতা মানুষের মুখে মুখে বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচনেই নিহিত আছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। এই যে তুমি শার্ট প্যান্ট পরে আছ, বা ধুতি পাঞ্জাবি পরে আছ, এই পোশাক কিন্তু সবাই পরতে পারে না বা স্বচ্ছন্দও বোধ করে না। অথচ লুঙ্গি কিন্তু সবাই সহজেই পরতে পারে। কবিতা ও ছড়ার পার্থক্যও ঠিক এই রকম।

প্রশ্ন : কবিতা ও ছড়া কোন মাধ্যমটির রচনায় আপনি বেশি আনন্দ পান?

উত্তর : আমি প্রথম জীবনে কবিতাই লিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম লোক

সাহিত্যর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না পারলে আমার সাহিত্যকর্ম সম্পূর্ণতা পাবে না। তাই লোক-সাহিত্যর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই ছড়া লিখতে শুরু করি। লিখতে গিয়ে দেখলাম ছড়া ও কবিতা লেখায় বিস্তর তফাত। যিনি সার্থক কবি তিনি ছড়া লিখতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন, আবার যিনি ছড়া রচনায় সার্থক তিনি কবিতা লিখতেও অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন। এই জন্য আমি প্রথমে কিছু ছড়া লিখে আবার কবিতায় ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু পরে আবার কবিতা থেকে ছড়ায় ফিরে যাই। এই ফিরে যাওয়াটা মাটির টান। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণই আমাকে টেনে নিয়ে যায়। আমার ছড়ায় তাই জন্তু-জানোয়ারের অবস্থিতি যেমন দেখতে পাবে তেমনি মানুষের অবস্থিতিও আছে। এটা সম্ভব হয়েছে লোক-সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি বাংলা আকাদেমিতে সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনাকে ছড়া লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেরণা আপনাকে ছড়া লেখায় কতটা সাহায্য করেছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি যখন রাজশাহীর জেলাশাসক ছিলাম সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার পর আত্রাই ঘাট থেকে নাটোর আসার সময় ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে "আমি ছড়া লিখছি, তুমিও লেখ না কেন"। আমি উত্তরে বলেছিলাম, "আমার দ্বারা ছড়া সম্ভব হবে না।" পরবর্তীকালে যখন বুদ্ধদেব বসুর 'একপয়সায় একটি' সিরিজে লেখা শুরু করি তখন আপনা থেকেই ছড়া হতে থাকে। এর পেছনে রবীন্দ্রনাথের সেদিনের উক্তি আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যে আপনি গদ্য, পদ্য, ছড়া রচনার পাশাপাশি প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনীও লিখেছিলেন। এই বিভিন্ন ধারায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে আপনি কোন পর্বের রচনায় লিখে ও পাঠককে পড়িয়ে বেশি আনন্দ লাভ করেছেন?

উত্তর : কবিতা রচনাতেই আমি বেশি আনন্দ পাই। এছাড়া অন্যান্য সকল ধারাতেই রচনা, সে তো আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। তাই সেগুলোকে অস্বীকার করি কী ভাবে? তাই কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারলেই আমার আনন্দ। যখন পারি না তখন ভেতর থেকে না পারার এক যন্ত্রণা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যতক্ষণ আমি সাহিত্যর কোন ধারায় সেই অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে না পারি ততক্ষণ আমার এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই। তাই নতুন সৃষ্টির মধ্যেই আমি আমাকে নতুনভাবে খুঁজে পাই।

প্রশ্ন : বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্পর্ক প্রায়ই একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্য আগের মতন পাঠকের মনে প্রভাব ফেলতে পারছে না। এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন?

উত্তর : এই প্রশ্নটায় আমি সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারলাম না। কারণ বইমেলাগুলো লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে অগণিত মানুষের ঢল প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে বইমেলা প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রেখেছে। এঁদের প্রতি লক্ষ করে এই কথাটি কিন্তু বলা যায় না। হ্যাঁ, এঁরা হয়তো সবাই পাঠক নন কিন্তু তবুও এঁরা গ্রন্থ প্রেমিক, বইপত্র পত্রিকার বিশাল সম্ভারে এঁরা কিন্তু নিছকই আড্ডা দিতে বা ঘুরতে আসেন না। এঁরা এই বিশাল ভাণ্ডার থেকে এঁাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই গ্রন্থটির খোঁজেই আসেন! এই বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম এই প্রশ্নের যৌক্তিকতাকে কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত করে দেয়। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে পারি। বর্তমান কালে বেশ কিছু মানুষ খোঁজেন কমিকস্, রহস্য-রোমাঞ্চকর কাহিনী, গোয়েন্দা

কাহিনী। এখন যিনি সত্যিকারের সাহিত্যিক তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এই সকল কাহিনী লেখা। এখানেই লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা চিন্তাশক্তির ফাঁক থেকে যায়। তারপর বইয়ের দামও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগে যে বই পাঁচ টাকায় পাওয়া যেত তা এখন পঁচিশ টাকাতেও পাওয়া যায় না। বইয়ের এই অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধিও কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করে। আরও একটা বিষয় হল জীবনী সাহিত্য। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেখানে তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের জীবনী গ্রন্থ পেলেও বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রভৃতির জীবনী গ্রন্থ তুমি সেরকমভাবে পাবে না। এই কারণটিও পাঠকদের গ্রন্থের প্রতি অনীহা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই লেখক, প্রকাশকদের দায়িত্ব থেকে যায় এই সকল সার্থক সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশে আরও বেশি করে মনোনিবেশ করা ও পাঠকদের সেই গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা।

প্রশ্ন : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লেখকদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : বর্তমান কালের লেখকরা সকলেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন ভালো সাহিত্য রচনার জন্যে। তাদের সেই চেষ্টা সফলও হচ্ছে। তবে আমি আগেও বহুবার বলেছি, এখনও বলব যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যর সঙ্গে অন্বয় সাধন করতে হবে। আমরা প্রাচীন ভারতের সেইসব মূল্যবান সাহিত্য কীর্তির প্রতি যদি লক্ষ না দিই, তাকে অস্বীকার করি, তাহলে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের সাহিত্যকর্ম কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। এমন সাহিত্য রচনায় মনোবিকাশ করতে হবে যেখানে সাধারণ মানুষের কথা বেশি করে ধরা পড়বে এবং তার প্রকাশ মাধ্যম হবে সহজ সরল ভাষায়, কিন্তু সেই ভাষায় থাকতে হবে শিল্প সুষমার শোভা। এখন মানুষ সিনেমা বা টেলিভিশনের পর্দায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রতিনিয়তই পরিচিত হচ্ছে। সেখানে সাহিত্যেও এর ছাপ থাকা প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণকে যদি আমরা টানতে না পারি এর চাইতে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে। এখানে একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে তা হল ভাষা, যার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হবে। তাই বলে আমরা অ, আ, ক, খ লিখব বা সহজ পাঠ লিখব তা নয়। যা উচ্চমার্গের সাহিত্য অনেক সহজ সরল রূপে রূপদান করাই হবে সত্যিকারের সাহিত্যিকের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন,' 'মুক্তধারা', প্রভৃতি রচনাগুলোর কথা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। এর জন্য সব মানুষের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মিশতে হবে। জানতে হবে তাদের সংস্কৃতি, আচার, আচরণের বিধি আর সব চাইতে যেটা বেশি জরুরি সেটা হল একজন সার্থক সাহিত্যিককে যতটা রচনা করতে হবে তার চাইতে অধিক পরিমাণে পড়াশুনো করতে হবে। যিনি সবচেয়ে ভাল পাঠক তিনিই হবেন ততোধিক ভাল লেখক।

প্রশ্ন : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

উত্তর : এ সম্পর্কে বলতে গেলে আমি একটু আমার অতীত জীবনকে স্মরণ করব। আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমার ঠাকুরমা বলেছিলেন এই কটা হাড় ও একটি মাথা এই রকম একটি দুর্বল শিশুকে কী করে মানুষ করব? আমার মা ৩৫ বছর বয়সে মারা যান। আমিও ভেবেছিলাম আমার আয়ুও এই ৩৫ বছর। তাই জীবনে একটা পরিকল্পনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেছিলাম। এই পথেই চলতে চলতে আমি সান্নিধ্য পেলাম লীলা রায়ের। যাঁকে সহধর্মিণী হিসেবে পেয়ে যাঁর ভালোবাসায় আমি ৮৮ বছর বয়স পার করি। এখন ৯১ বছর বয়সে পৌঁছে গেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি আমার সাহিত্য কর্মকে চালিয়ে যেতে পেরেছি আমার স্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে। বাংলা সাহিত্য গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা, ছড়া

অনেক লিখেছি। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন ছিল। বাংলা সাহিত্যে কেন সার্থক ব্যালাড রচনা করা যাবে না? আমাদের দেশে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বলে যে কথিকাগুচ্ছ প্রচলিত তা সার্থক ব্যালাড নয়। তাই আমার ইচ্ছা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বাংলা ভাষায় একটি সার্থক ব্যালাড ও নভেল রচনা করা। রচনা করব বলেও রচনা করতে পারছি না, যদি পারি তবে এটাই হবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার নবতম সংযোজন এবং এটাকেই মনে করতে পারেন আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

সাক্ষাৎকার : শৌভিক পাণ্ডা

গান্ধী ও নেহরু

সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে গভর্নর আসেন ময়মনসিং সফরে। ডিনারে ডাকেন। সেদিন তাঁর মুখে শুনি ইংরেজরা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে। "হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন থাকব রিং ধরতে?" মানে সার্কাসের রিং।

"আরো বললেন, আমরা ভেবে দেখেছি যে বাণিজ্যেই লাভ। আয়ারল্যান্ড স্বাধীন হবার পর থেকে সে দেশে আমাদের বাণিজ্য বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষেও তাই হবে।"

একদিন যেমন ওরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরেছিল তেমনি শর্বরী পোহালে রাজদণ্ড ছেড়ে মানদণ্ড ধরবে। এখন শর্বরী পোহালে হয়।

মহাত্মা তখন নোয়াখালিতে শর্বরীর অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলছিলেন। কোনও দিকে একটুকু আলোর ছটা দেখতে পারছিলেন না।

আমার অন্তরেও তখন একটা মন্থন চলছিল। ইংরেজ তো আপনা হতে যাচ্ছেই, তাকে গলা ধাক্কা দিতে হবে না। বিদ্রোহ বিপ্লব গণসত্যাগ্রহ সবই এখন নিষ্প্রয়োজন। যেটা সত্যিকারের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে দুর্জনের হাত থেকে সুজনকে রক্ষা করা।

গান্ধীজী আমার তরুণ মনে যে একটি স্বপ্নের বীজ বুনেছিলেন তার একটি ছিল নৈরাজ্য আর একটি সত্যাগ্রহ। একটি ছিল এণ্ড আর একটি মীনস। অন্যান্য নেতারা কেউ আমার মনে তেমন কোন স্বপ্নের আবাদ করেননি। আপাতত তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন মীনসের উপরে, সত্যাগ্রহের উপরে। তাঁর কথা হলো মীনস যদি ঠিকমতো অনুসরণ করা হয় তবে এণ্ড তারই ভিতর থেকে আসবে। এণ্ড নিয়ে আমরা যেন অকারণে মাথা না ঘামাই। কিন্তু এই অরাজকতাই কি সেই নৈরাজ্য? আলেয়া কি আলো? না, তা নয়। শুনতে কতকটা একই রকম, আসলে অন্য জিনিস।

দুশো বছরের সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন দিকে দিকে অরাজকতা দেখা দেয়। মোগল সাম্রাজ্যের শেষেও দেখা গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাত বারোটা বাজার আগেও দেখা যাচ্ছে। নানা যুগে নানা দেশে এর নজির মেলে। এর নাম সত্যাগ্রহ সাপেক্ষ নৈরাজ্য নয়। এর জন্যে এদেশের লোক আটাশ বছর কাল সাধনা করেনি।

এটা অন্য জিনিস। বেশ, তা না হয় হলো, কিন্তু এখন এর সম্মুখীন হই কী করে? অরাজকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে আমার হাতে কী থাকবে? রাজদণ্ড, না সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র? আমাকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হলো যে সত্যাগ্রহ দিয়ে অরাজকতার প্রতিরোধ করা কাজের কথা নয়, প্রতিরোধ করা চলে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির, তার অসহনীয় অন্যায়ের, তার অন্তহীন অধীনতার, তার ভিত্তিমূলে অবস্থিত হিংসার, তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাহুবলের।

তত্ত্বের দিক থেকে এটা হয়তো ঠিক যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির চেয়ে অরাজকতা কি এত ভয়ংকর যে সত্যাগ্রহের দ্বারা তার প্রতিরোধ অহিংসাব্রতীর অসাধ্য? তা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারত, কিন্তু তর্কের জন্যে আমাদের হাতে সেদিন সময় যথেষ্ট ছিল না। গভর্নর ময়মনসিং

ছাড়ার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে। ক্ষমতা কার হাতে হস্তান্তর করা হবে সেটা নির্ভর করবে ভারতীয়দের একমত হওয়া না হওয়ার উপরে। একমত না হলে একাধিক হাতে।

একমত হওয়া যে একান্ত জরুরী এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সময় বয়ে গেলে আদর্শ সমাধানও অবাস্তব হয়ে যায়। সুতরাং সময় থাকতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা হয়তো আদর্শের দিক থেকে খাটো, কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কার্যকর। সে সিদ্ধান্ত আর যাই হোক, অরাজকতা নয়।

সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকেই বসাতে হবে। সেই যে নতুন রাজশক্তি তার অধীনেও সৈন্য পুলিস আদালত ও জেল থাকবে। রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে দিয়ে বা তাকে ভেঙে যেতে দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর কার কোন্ কাজে লাগবে? সে যেন গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া। অমন একটা অসহায় গভর্নমেন্ট অরাজকতা রোধ করতে অক্ষম হবে।

গান্ধীপন্থীদের প্রত্যেকের জীবনে সে এক অগ্নিপরীক্ষা।

ওঁরা চেয়েছিলেন সাত লক্ষ গ্রামে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠবে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে উপরিতন আঞ্চলিক রেপাবলিকে। তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ অর্পণ করবে কেন্দ্রীয় রেপাবলিককে। ইংরেজ যদি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অপর এক রাজশক্তিকে হস্তান্তর না করে চলে যায় তা হলেই সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। নতুবা একবার হস্তান্তর হয়ে গেলে তারপর যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সেই হবে ক্ষমতার মালিক। সে হয়তো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কিয়দংশ প্রদেশকে দেবে, তারপর প্রদেশ হয়তো প্রাদেশিক ক্ষমতার কিয়দংশ অঞ্চলকে দেবে, তারপর অঞ্চল হয়তো আঞ্চলিক ক্ষমতার কিয়দংশ গ্রামকে দেবে। একেবারে বিপরীত প্রোসেস।

শাসনের দিক থেকে ক্ষমতার ভাণ্ডারে এক প্রকার শূন্যতা না হলে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠতে পারে না। অপর পক্ষে শূন্যতা হয়েছিল বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শত শত দেশীয় রাজ্য গজিয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা তাদের সংখ্যা কমাতে কমাতে প্রায় ছ'শোটিতে দাঁড় করিয়েছিল। আবার এক শূন্যতা সৃষ্টি হলে কে জানে ক'হাজার বলকান রাজ্য মাটি ফুঁড়ে ওঠে। সেইজন্যে শূন্যতার উপরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাস ছিল না। সে ঝুঁকি তাঁরা নিতেন না।

লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে যেমন পরিণয় হয় না তেমনি ইতিহাসও হয় না। বেশ বুঝতে পারছিলুম যে ইংরেজ চলে যাচ্ছে। নেতারা একমত হতে না পারলে ক্ষমতার হস্তান্তর একাধিক হাতেই হবে। একাধিক মানে দুই হাতও হতে পারে। কুইট ইণ্ডিয়া ট্যু গড অর অ্যানার্কি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজদের একটি স্কীম ছিল, তাকে বলতো র‍্যালিয়িং পয়েন্ট স্কীম। কোথাও বিদ্রোহ বাধার লক্ষণ দেখলে জেলার সব জায়গার ইংরেজরা এক জায়গায় জুটত। তাদের সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতো। সাতচল্লিশ সালে সেই জাতীয় একটা স্কীম প্রস্তুত করেন বড়লাট ওয়াভেল। সারা ভারতের সব প্রদেশের ইংরেজ এক প্রদেশে জমায়েত হবে ও মিলিটারি প্রোটেকশন পাবে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন গুটিয়ে আনা হবে। এ পরিকল্পনা যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির কাছে পেশ করা হয় তখন তিনি সেটা নাকচ করে ওয়াভেলকে সরিয়ে দেন।

এর পর মাউন্টব্যাটেন আসেন বড়লাট হয়ে। তিনি দেখেন ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের

ভিত্তিতে নেতারা একমত হবেন না। বৃথা চেষ্টা। কিন্তু ওয়াভেলের মতো হাল ছেড়ে না দিয়ে তিনি নতুন করে কথাবার্তা শুরু করেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে কোয়ালিশন ভেঙে যাওয়ায় ও বিকল্প সরকারের আশা না থাকায় গভর্নরের শাসন চলছিল। হঠাৎ হিন্দু শিখদের তরফ থেকে দাবি ওঠে, পাঞ্জাব পার্টিশন করা হোক। এ দাবি পাঞ্জাব থেকে বাংলায় ছড়ায়। এ দাবি ওঠার আগে পাঞ্জাবে একদফা দাঙ্গা হয়ে গেছে। তেমনি বাংলায় একদিকে মুসলিম লীগ দাবি করছে ভারতবর্ষের পার্টিশন, অপর দিকে পাঞ্জাব বাংলার হিন্দু শিখ দাবি করছে স্ব-স্ব প্রদেশের পার্টিশন। নেতাদের সঙ্গে কথা বলে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন যে দোতরফা যদি হয় তবে পার্টিশনে রাজি আছেন বল্লভভাই ও জবাহরলাল। সেই মর্মে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান তৈরি হয়। ক্ষীণা ওরফে জিন্নাকে রাজী করানোর ভার নেন মাউন্টব্যাটেন। সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রেফারেন্ডাম হবে আশ্বাস পেয়ে জিন্না অবশেষে সায় দেন, কিন্তু গান্ধী সায় দেন না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গান্ধীজীর আপত্তির হেতু ছিল অসমের ভাগ্য। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তাঁর আপত্তির কারণ ছিল বাংলার ভাগ। বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্য তিনি বাঙালিদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু ও শহীদ সুরাবর্দী সেই লাইনে কাজ করছিলেন। সে চেষ্টা সফল হলে দুটোর জায়গায় তিনটে ডোমিনিয়ন হতো। তাতে কংগ্রেসের আপত্তি। কংগ্রেসিদের ভিতরে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস পছন্দ করতেন না। এতে ইংরেজদের মনে খটকা ছিল যে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত সফল হবে না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মতো ভেস্তে যাবে। সেই কথা ভেবে তারা একটি গোপন পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিল। নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যর্থ হলে সেই গোপন পরিকল্পনা কার্যকর হতো। বড়লাট এক একটা প্রদেশ এক একটা দলের হাতে সঁপে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলতে বিশেষ কিছু টিকে থাকলে অবশিষ্ট ক্ষমতা তার হাতে দিয়ে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন। তার পরে কাকে কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে তা ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করবেন।

কাউকে না জানিয়ে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনায় একটি ধারা যোগ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি বাংলার হিন্দু মুসলিম একমত হয় তা হলে বাংলা অখণ্ড থাকবে ও একাই একটি রাষ্ট্র হবে। সম্ভবত ওরা একমত হতো না। তবু তার জন্যে একটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। বিলেত থেকে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্জুরি পেলে মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ্যে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করতেন। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্রামের জন্য সিমলায় যান। নিভৃতে কথাবার্তার জন্যে নেহরুকে অতিথি হতে আমন্ত্রণ করেন। একদিন খানার পরে পিনার সময় কী মনে করে দলিলটি নেহরুকে দেখতে দেন। বড়লাটের ধারণা ছিল জিন্না আপত্তি করতে পারেন, নেহেরু করবেন না।

কিন্তু জবাহরলাল তা পড়ে প্রথমে লাল, তারপরে সবুজ। দলিলটা ফেরত দিয়ে বলেন, "এ জিনিস চলবে না। আমি তো নয়ই, কংগ্রেসও না, ভারতও এটা গ্রহণ করবে না।" এর পরে তিনি বড়লাটকে এক কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হলে তার ফল হবে ভারতবর্ষের বলকানীকরণ ও গৃহযুদ্ধ। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। এতদিন মাউন্টব্যাটেন তাঁর ইংরেজ পারিষদদের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন। এবার তাঁর সহায় হন তাঁর ভারতীয় পারিষদ ভি. পি. মেনন। এই ভদ্রলোক অনেকদিন আগেই সর্দার বল্লভভাইকে বাজিয়ে দেখেছিলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে ভিত্তি করে পার্টিশন হলে সে পার্টিশনে তিনি রাজী হবেন, যদি স্বাধীনতা তার ফলে ত্বরান্বিত হয়। মেনন তাঁর কথাবার্তার উপর ভিত্তি করে

সেই মর্মে একটা পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে সেটা ভালো করে মুসাবিদা করে সিমলায় পেশ করেন। নেহরুকে সেটা দেখানো হয়। এবার জবাহরলাল সম্মতি দেন।

তখন তারই নাম হল মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা দুই স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন প্ল্যান। সঙ্গে সঙ্গে বড়-লাট লন্ডনে উড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল করে পরবর্তী পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। এর পরে নেতাদের একত্র করে তাঁদের সবাইকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নেবার দায় মাউন্টব্যাটেনের। বিশেষ করে জিন্না বা ঝীণাকে দিয়ে।

বেশ বোঝা যায় যে ব্রিটিশ পক্ষের স্বার্থ ছিল কংগ্রেসকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্মত করানো। যেই সেটি হাসিল হলো অমনি বাংলাও পাঞ্জাবের পার্টিশনে ইংরেজদের যে আপত্তি ছিল তাঁদের সে আপত্তি দুর হলো, বাকী রইল মুসলিম লীগের বাধা। সে বাধা মাউন্টব্যাটেনই খণ্ডন করলেন। তখন ভারতবর্ষ সেই পিঠে ভাগের মতো দু'ভাগ হলো। ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার ঠিক আছে দেখে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রাতারাতি স্বাধীনতা বিল পাশ করে দিলেন।

পরাধীন দেশে যার নাম ডিভাইড অ্যান্ড রুল স্বাধীন দেশদ্বয়ে তারই নাম ব্যালেন্স অভ্ পাওয়ার। দুই দেশ ডোমিনিয়ন না হয়ে এক দেশ ডোমিনিয়ন হলে কিন্তু এ নীতি বজায় রাখা কঠিন হতো। জবাহরলাল দীর্ঘকাল চেষ্টা করেছিলেন ডোমিনিয়ন স্টেটাস ঠেকাতে। দৃঢ় থাকলেন না এই জন্যে যে সেই গোপন পরিকল্পনা অনুসারে অবিভক্ত পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। তা হলে দিল্লী বিপন্ন হতো।

বাংলা যাতে অবিভক্ত থাকে তার জন্যে মহাত্মার বিশেষ মাথাব্যথা ছিল। কিন্তু উল্টো বুঝলি রাম। আমাদের এক সাবজজ আমাকে শুধান, 'আচ্ছা বাংলার সেই সব বিপ্লবী ছেলেরা গেল কোথায়? গান্ধীকে কেন কেউ গুলি করে না?' আমি তো হতবাক। অতি শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষটির হঠাৎ এমন মতিভ্রম প্রত্যাশা করিনি। তিনি বিষম উদ্বেগের সঙ্গে বলেন 'বাংলা ভাগ না হলে বাঙালি হিন্দু বাঁচবে কী করে?' অর্থাৎ মুসলিম লীগ তো অবাধে সাবাড় করবে।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করে মুসলিম লীগ যে হিংসা প্রতিহিংসার পরম্পরা পয়দা করেছিল তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারত মহাত্মার অহিংসা। কিন্তু সেই সঙ্কটকালে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় হাতের কাছে ছিল না বলে বাঙালি হিন্দু বাংলা ভাগকেই ঠাওরায় নিরুপায়ের উপায়। সে মুহূর্তে হিংসাবাদীরা এগিয়ে এসে অভয় দিতে পারতেন। কিন্তু সেদিন তাঁদের হিংসাও ছিল নিষ্ক্রিয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা ভ্রাতৃরক্তপাত করেননি।

দোসরা জুন রাত বারোটার একটু আগে দিল্লীর বড়লাট ভবনে ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় শেষ হয়। ভারত ভাগ্যবিধাতার এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে সংগ্রামের আটাশ বছর যিনি সকলের পুরোভাগে, সন্ধির দিন তিনিই সবার পিছে। মাউন্টব্যাটেনের শঙ্কা ছিল যে গান্ধী সেদিন ইচ্ছা করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তিনি তো পার্টিশনে সায় দেননি।

পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া শক্ত ছিল না। ছোট্ট একটি 'না' বলাই যথেষ্ট। কষ্ট করে অনশনও করতে হতো না। কিন্তু কাঁচিয়ে দিলে তাঁকে শূন্যতার সঙ্গে পাঞ্জা করতে হতো। ইংরেজশূন্যতার সঙ্গে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যে সশস্ত্র ফোর্স তার সঙ্গে ম্যাচ করবার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স নামক নিরস্ত্র ফোর্স। যাকে তিনি বলতেন ম্যাচিং ফোর্স। কিন্তু ইংরেজ রাজা যদি উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে না যান তা হলে যে

উত্তারাধিকারের যুদ্ধ বেধে উঠবে তার সঙ্গে ম্যাচ করবার মতো নিরস্ত্র ফোর্স কই তাঁর তূণীরে?

উত্তরাধিকারের যুদ্ধের উত্তর গণসত্যাগ্রহ নয়। তিনি বোধ হয় কল্পনা করেছিলেন যে মুসলিম লীগকে মসনদে বসিয়ে দিলে সে কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি করবে। নয়তো লীগ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একদিন গণসত্যাগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ বিশ্বাস করতেন না যে মসনদে বসলে লীগের স্বভাব শোধরাবে। গুণ্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কি সত্যি কোনো ফল হতো? হলে সে ফল নোয়াখালিতে প্রত্যক্ষ করা যেত।

যে অহিংসার সঙ্গে দেশের লোক এতদিন পরিচিত ছিল সে ছিল কারাবরণের শৌর্য ও সৎসাহস। কিন্তু গৃহযুদ্ধের দিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে রক্ষা করার জন্যে যে অহিংসার প্রয়োজন হতো সে অহিংসা হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মরণ বরণ। অথচ মরণব্রতী সত্যাগ্রহীর সংখ্যা সেদিন হাজার হাজার তো নয়ই, শত শতও নয়। এমন কী দশ বিশটিও নয়। যে দু-চারজনকে পাওয়া গেল তাঁরা ধরিত্রীর লবণ। কিন্তু সেই ক'জনকে নিয়ে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া যায় না।

তছাড়া গান্ধী ছিলেন মুক্তার জহুরী। স্বাধীনতার মুক্তাটি সাচ্চা না হয়ে ঝুটা হলে নিশ্চয় তিনি বাধা দিতেন। মুক্তাটি যে ঝুটা নয়, সাচ্চা, এ বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ এক না হয়ে দুই হলো বলে তিনি সাচ্চা স্বাধীনতাকে ঝুটা বলে প্রত্যাখ্যান করতেন না। তবে অন্তর থেকে মেনে নেওয়া ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ভালোবাসার জিনিসকে ভেঙে দু'খানা করা কি সহ্য হয়? বিশেষ করে বাংলাকে?

আসলে স্বাধীনতা আর পার্টিশন ছিল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একপিঠকে খারিজ করলে অন্যপিঠকেও খারিজ করা হয়। কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটাও ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

ঐতিহাসিক নিয়তি

অনেকে গান্ধীজীকে দোষ দেন এই বলে যে তিনি ইচ্ছে করলে অনশনের দ্বারা পার্টিশন বন্ধ করতে পারতেন। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে অনশনের প্রয়োজন হত না, মুখের একটি বাক্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি সেই বাক্যটি উচ্চারণ করলেন না এতে মাউন্টব্যাটেন আশ্চর্য হয়ে যান। আসলে যা হয়েছিল তা এই, ব্রিটিশ শাসন শেষ করে দেওয়া যত সহজ কংগ্রেস শাসন কায়েম করা তত সহজ ছিল না। অবিভক্ত বঙ্গে সুহরাবর্দি সরকার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অমান্য করতেনই। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকার বা বিধানচন্দ্র রায় সরকার প্রবর্তন করা গণতন্ত্র বিরুদ্ধ তো হতোই, কাণ্ডজ্ঞান বর্জিতও হতো। নোয়াখালির মতো ঘটনা সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে ঘটত। গভর্নর রাজগোপালাচারি হতেন অসহায় দর্শক। কেন্দ্রীয় সরকার একজন জবরদস্ত গভর্নর পাঠিয়ে দিয়ে মিলিটারির সাহায্যে অগণতান্ত্রিক শাসন চালাতে গেলে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। ইন্ডিয়ান আর্মির মুসলিম রেজিমেন্টগুলো উত্তেজিত হয়ে মিউটিনি ঘটাত। গান্ধীজীর মরণপণ অনশন মুসলিম ফৌজের মন গলাতে পারত না। গণসত্যাগ্রহ এরূপ ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। ইংরাজ বর্জিত ভারতবর্ষে কংগ্রেস কর্তৃক অখণ্ড ভারত তথা অবিভক্ত বঙ্গ শান্তিপূর্ণভাবে শাসন করা অবাস্তব এটা উপলব্ধি করেই তিনি নেহরু ও পটেলকে ভারতের যতখানি ও বাংলার যতখানি এবং পাঞ্জাবের যতখানি অধিকাংশ ভোটে শাসন করা সম্ভবত ততখানি হাতে রেখে বাকি অংশ মাউন্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় মুসলিম লীগকে ছেড়ে দেন।

মাউন্টব্যাটেন ছাড়া আর কেউ ঝীণা অর্থাৎ জিন্না সাহেবকে খণ্ডিত পাকিস্তান নিতে রাজি করাতে পারতেন না। সুতরাং মাউন্টব্যাটেনকে অপ্রস্তুত করা গান্ধীজী সমীচীন মনে করেননি। নেহরু-পটেলকে অপ্রস্তুত করাও তেমনই অসমীচীন ছিল। তার মানে এই নয় যে গান্ধীজী পার্টিশন সমর্থন করেছিলেন। না, তিনি পার্টিশন সমর্থন করেননি। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মৌন অবলম্বন করেছিলেন। কথায় বলে মৌন হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ; কার্যত তাই। কিন্তু নীতিগত ভাবে তা-ই নয়। তাঁর শেষপর্যন্ত এই বিশ্বাস ছিল যে পার্টিশন একটা ব্লান্ডার। আশ্চর্যের ব্যাপার, জিন্নাসাহেবও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর চিকিৎসককে বলেছিলেন যে পার্টিশন হচ্ছে তাঁর জীবনের গ্রেটেস্ট ব্লান্ডার। ইতিহাসে এরকম ব্লান্ডারই ঘটে থাকে।

সম্প্রতি ম্যাকনামারাও কবুল করেছেন যে ভিয়েতনামে যুদ্ধ ছিল আমেরিকার পক্ষে এক ব্লান্ডার। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড আমেরিকায় বহু বুদ্ধিজীবী বলতে আরম্ভ করেছেন যে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ ছিল আমেরিকার পক্ষে ব্লান্ডার। মানব ইতিহাস ব্লান্ডার দিয়ে ভরা। সুতরাং ভারত ভাগের জন্যে একে ওকে কি তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমার নিজের মতে, নিশ্চয়ই এটা একটা ব্লান্ডার। কিন্তু তার জন্য একক ভাবে কেউ দায়ী নয়। ব্যাপকভাবে অধিকাংশ হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান দায়ী। অধিকাংশ মুসলমান চেয়েছিল ভারতভাগ, অধিকাংশ হিন্দু-শিখ চেয়েছিল পাঞ্জাব ভাগ, আর অধিকাংশ হিন্দু চেয়েছিল বাংলা ভাগ।

ময়মনসিংহে একজন হিন্দু সাবজজ ছিলেন। তাঁর পদবী উকিল ব্যানার্জি। ভদ্রলোক অত্যন্ত

নিরীহ গোবেচারি। আমি তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেছি। পার্টিশন প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি হঠাৎ জ্বলে উঠে বললেন, "আমাদের সেই সোনার চাঁদ ছেলেরা গেল কোথায়? তারা কেউ গুলি করে গান্ধীকে হত্যা করে না কেন?" আমি আঁতকে উঠে বললুম, "কেন, গান্ধীর কী অপরাধ?" এর উত্তরে তিনি বললেন, "গান্ধী কেন পার্টিশনে বাধা দিচ্ছেন? তিনি কি বোঝেন না যে বাংলার পার্টিশন না হলে হিন্দু বাঁচবে না?" ওদিকে দিল্লীতে গান্ধীজী এক সাক্ষাৎকারে বহরমপুরের শশাঙ্কশেখর সান্যালকে দুঃখ করে বলেছিলেন, "বাঙালী হিন্দুরা কি বুঝতে পারছে না বাংলাভাগ চেয়ে তারা কী বিপত্তি ডেকে আনছে?" পার্টিশনের পরে বিপত্তিটা যখন প্রত্যক্ষভাবে এসে উপস্থিত তখন সেই গান্ধীজী এসে কলকাতায় সুহরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিবারণ করেন। সেদিন ১৫ আগস্ট কলকাতায় দাঙ্গা হলে পূর্ব পাকিস্তান জ্বলত। এটা আমি আগেই শুনে এসেছিলুম ময়মনসিংহ থেকে। জ্বলল না যে তার কারণ কলকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা। এর কিছুদিন পরে একদিন স্বদেশী যুগের একজন বিশিষ্ট নেতা আমাকে বলেন, "গান্ধীজীর মরা উচিত। তাঁর নেতৃত্বের জন্যই বাংলার এই অবস্থা। কেন তিনি পার্টিশন হতে দিলেন!" একজন হিন্দু তাঁকে মারতে চেয়েছিলেন তিনি পার্টিশনে বাধা দিচ্ছিলেন বলে। আর একজন হিন্দু তাঁকে মারতে চান, কেন তিনি পার্টিশনে বাধা দেননি বলে। উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দুরাই তাঁর মৃত্যুকামনা করছিলেন। নাথুরাম গোডসে নামে একজন হিন্দুর দ্বারা তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হল। সেই রাত্রে বহরমপুরে কয়েকজন হিন্দুর বাড়িতে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছিল, পরের দিন আমি শুনতে পাই। অপর পক্ষে পরের দিন সকালে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শোকমিছিল বেরোয় ও শত শত হিন্দু এই মিছিলে যোগ দেয়। সন্ধে বেলায় নদীর ধারে স্বতঃস্ফূর্ত শোকসভা হয়। গান্ধী সম্বন্ধে বাঙালি হিন্দু জনমত আজ অবধি দ্বিধাবিভক্ত।

এবারে একটু জিন্না সাহেবের দিক থেকে বিষয়টা চিন্তা করা যাক। তিনি গোড়া থেকেই বলে রেখেছিলেন যে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিস্টেম চলতে পারে না। ও দেশে একবার রক্ষণশীল দল সরকার চালায় তো একবার উদারনৈতিক দল গভর্নমেন্টের হাল ধরে। সাধারণ নির্বাচনে একবার এরা যদি মেজরিটি পায় তো আর একবার ওরা মেজরিটি পায়। ওদেশের রাজনীতিতে মাইনরিটি বলে কোনও রাজনৈতিক দল নেই। কিন্তু এদেশে আছে। মুসলিম লীগ কখনও ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একক ভাবে মেজরিটি পেতে পারে না, সুতরাং একক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতেও পারে না। অধিকাংশ প্রদেশেও তার পক্ষে একক ভাবে সরকার গঠন অসম্ভব। সুতরাং জিন্না সাহেব চান মেজরিটি ও মাইনরিটির যৌথ সরকার বা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। তার জন্য প্রয়োজন কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ইংরেজ যখন চলে যাবে তখন কংগ্রেস ও লীগ একজোট হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তো চালাবেই, যেখানে সম্ভব সেখানে প্রাদেশিক সরকারও—এই আশা তিনি দীর্ঘকাল পোষণ করে এসেছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক স্তরে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস এককভাবে সরকার গঠন করায় তিনি উপলব্ধি করেন যে কংগ্রেসের পলিসি, কোনওখানেই কোয়ালিশন নয়। যেসব প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন চায় না, সেসব

প্রদেশে অপোজিশনে থাকা পছন্দ করে। তাহলে কেন্দ্রে যখন ইংরেজ থাকবে না তখন কে থাকবে? শুধুমাত্র কংগ্রেস? কোনও দিন কি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ মেজরিটি লাভ করতে পারবে?

জিন্না সাহেবের মতে মুসলিম লীগই হচ্ছে ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা তামাম ভারতের সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তেমনই জিন্না সাহেবের মতে কংগ্রেস হল সারা ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গান্ধীজী একমত ছিলেন না। নেহরু, পটেল, আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খানও একমত ছিলেন না। এঁদের মতে কংগ্রেস হল সারা ভারতের হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লীগের বাইরেও মুসলমানদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিল, যেমন বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি ও পাঞ্জাবের ইউনিয়নস পার্টি। এছাড়া ছিল আহরার পার্টি ও খাকসার পার্টি। কাজেই কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিতে পারে না। অপর পক্ষে মুসলিম লীগও কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে পারে না। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল জিন্না সাহেবকে বলেছিলেন, কে কার প্রতিনিধি তার উপর জোর দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস তার নিজের সদস্যদের প্রতিনিধি, তেমনই লীগও তার নিজের দলের প্রতিনিধি। লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। জিন্না বাদে।

কিন্তু কোয়ালিশন সরকারের প্রধান শর্ত হল কালেকটিভ রেসপনসিবিলিটি বা সমবেত দায়িত্ব পালন করা। মুসলিম লীগ একেবারেই তাতে রাজি হয় না, সমস্তক্ষণ ঝগড়াঝাটি করে। গান্ধীজী কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন ইস্তফা দিতে ও নতুন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে পরামর্শ দেন জিন্না সাহেবকে সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান করতে। নেহরু, পটেল ও মাউন্টব্যাটেন—কেউই গান্ধীজীর পরামর্শে রাজি হন না। এর বিকল্প হল, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুই ভাগে বিভক্ত করা এবং এক ভাগ কংগ্রেসকে ও আর এক ভাগ মুসলিম লীগকে দেওয়া। প্রদেশগুলিকেও দুই সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। তার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করতে হল। কোয়ালিশনের বিকল্প হল পার্টিশন। এই ব্যবস্থায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই সমর্থন ছিল। সুতরাং এটা একটা গণতান্ত্রিক সমাধান। মুসলিম লীগকে সারা ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া মোটেই গণতান্ত্রিক হত না। অথবা কংগ্রেসকে মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলির উপর। ক্যাবিনেট মিশন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একটা স্কীম দিয়েছিল। সেই স্কীম কি কংগ্রেস ও লীগকেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক করতে পারত? শরিকে শরিকে কোঁদল বাধতই। তখন ভারত খণ্ড খণ্ড হত। অখণ্ড ভারতের শর্ত ছিল কংগ্রেস-লীগ দ্বৈরাজ্য।

জিন্না একদা চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও শেষপর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন। যদি কোয়ালিশন সম্ভব না হয়, যদি ইংলন্ডের মতো রোটেশনও অসম্ভব হয় তাহলে বাকি থাকে পার্টিশন। তাঁর ধারণা ছিল মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বলে সমগ্র বঙ্গ প্রদেশটাই পাবেন তিনি। তেমনই মুসলিমপ্রধান বলে গোটা পাঞ্জাবটা তো তিনি পাবেনই, কোণঠাসা বলে কংগ্রেস শাসিত অসম আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও তাঁর ভাগে পড়বে। তাছাড়া মুসলিমপ্রধান সিন্ধু প্রদেশ তথা ব্রিটিশ বেলুচিস্তান এই দুটি প্রদেশও তাঁর প্রাপ্য।

তাঁর ভরসা ছিল, যাবার আগে ইংরেজরা তাঁকে তাঁর পরিকল্পিত পাকিস্তান হস্তান্তর করে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু বাদ সাধলেন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের মিটমাট ছিল তাঁর কাছে আরও বেশি জরুরি। কংগ্রেসের দিক থেকেও ইংরেজের সঙ্গে মিটমাটও সমান জরুরি ছিল। গান্ধীকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস বাংলা ও পাঞ্জাবের পার্টিশন চায়, অসমকেও কোণঠাসা হতে দেয় না, তবে সিলেটের মায়া কাটায়। আর কোণঠাসা বলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসপন্থী পাঠানদেরও বিসর্জন দেয়। খান আবদুল গফ্ফার খান ছিলেন যথার্থ গান্ধীপন্থী। তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে গান্ধীর প্রতিও অনাস্থা। কিন্তু এটাও গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটাতে পারবে না। তুমুল অশান্তির জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে হবে। আখেরে কোনও লাভ হবে না। কারণ লীগপন্থী মুসলমানরা কেন্দ্রে বা প্রদেশে কোনও স্তরেই কংগ্রেসকে ইংরেজের মতো মান্য করবে না। তাদের দিক থেকেও আসবে আইন অমান্য আর সেটা নেবে জঙ্গি রূপ। গান্ধীজী যদি কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন স্বেচ্ছায় গদি ছাড়তে তাহলে কংগ্রেস তাঁর পরামর্শ গ্রাহ্য করবে না। কারণ একবার গদি ছাড়লে তার পরে ফিরে আসা দুঃসাধ্য হবে। যদি না কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করে। তেমন মিটমাটের প্রথম বলি হবে কংগ্রেসপন্থী মুসলমান। সেটাও কি গান্ধীজী সহ্য করতে পারবেন?

মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান মেনে নিলে তবু কতক মুসলমানকে কংগ্রেস সরকারের স্থান দিতে পারা যাবে কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক উভয় স্তরেই। সুতরাং মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান বানচাল করা আদৌ বিজ্ঞতা নয়। গান্ধীজী নিজেকেই সরিয়ে নিলেন। ব্রিটিশ অপসারণের পূর্বেই ঘটে গেল রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে গান্ধীজীর অপসরণ। যেদিন শেষ ব্রিটিশ সৈনিকটির ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে অপসরণ সেইদিন গান্ধীজীর দিল্লীর রাজঘাটে শেষকৃত্য সম্পাদন। মনে হয়, ব্রিটিশ অপসরণ তথা গান্ধীজীর অপসরণ নিছক কাকতালীয় নয়, ঐতিহাসিক নিয়তি। তিনি ভারতের মুক্তির জন্য এসেছিলেন, মুক্তি দিয়ে গেলেন, যদিও তার ঐক্যবদ্ধ শাসনের বিনিময়ে। ইংরেজরা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ শাসন দিয়েছিল পরাধীনতার বিনিময়ে।

আমরা পরাধীনতার অন্ত চেয়েছিলুম। কল্পনা করিনি, সেটা হবে ঐক্যবদ্ধ শাসনের অন্ত। এর জন্য মূলত দায়ী হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক বিবাদ। ইংরেজরা সেই বিবাদের সুযোগ নিয়ে রাজত্ব করে গেল, কিন্তু বিবাদটা তাদের সৃষ্টি নয়। এইরকম বিবাদ যেসব দেশে দেখা যায় সেসব দেশেও পার্টিশন ঘটে। যেমন জার্মানিতে ও অস্ট্রিয়ায় তথা আয়ার্লান্ডে। ওঁরা সবাই খ্রিস্টান। তবু সাম্প্রদায়িকতায় বিদীর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে ভারতভাগ প্রদেশভাগ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়নি, হয়েছে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই দুই দলের মধ্যে। আরও স্পষ্ট করে বললে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড ও লীগ হাই কম্যান্ডের মধ্যে। এটা এড়াবার একমাত্র উপায় ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় স্তরেই কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে চিরস্থায়ী কোয়ালিশনের ব্যবস্থা করা। অথচ কংগ্রেসের দাবি, সে ধর্ম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আর মুসলিম লীগের দাবি, সে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি। এই দুই দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব ছিল। সেইজন্যে ব্রিটিশ সরকারের উদ্‌যোগে গঠিত কেন্দ্রীয় স্তরে অন্তর্বর্তী সরকার বেশিদিন স্থায়ী হতে পারল না। প্রাদেশিক স্তরে সেইরূপ

সরকার স্থাপন করলে তারও দশা হতো তথৈবচ। যেখানে মিলেমিশে কাজ করার অভিজ্ঞতা ইংরেজ থাকতেই শান্তিপূর্ণ ছিল না সেখানে ইংরেজ বিদায়ের পরে সেটা অবশ্যই শান্তিশূন্য হতো। সেজন্যই ইংরেজ থাকতে দেশ ও প্রদেশ ভাগাভাগি করে নিতে হল। এই ভাগাভাগির ফলে কংগ্রেস শাসিত ভারতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা সর্বসম্মতিক্রমে সম্ভব হল। নয়তো মুসলিম লীগ পদেপদে বাগড়া দিত। এমনসব উদ্ভট প্রস্তাব আনত যে কংগ্রেস কখনও সেসব মেনে নিতে পারত না। যেমন প্যারিটির দাবি, যার মানে বিচার বিভাগে সমানসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান, সৈন্য দলে সমানসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান, সিভিল সার্ভিসে সমানসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান, পুলিশে সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান, মন্ত্রীমণ্ডলীতে সমানসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান। মুসলিম লীগের কাছে মুসলিম মন্ত্রীমাত্রেরই আনুগত্য, কংগ্রেসের কাছে কেবলমাত্র হিন্দুমন্ত্রীরই আনুগত্য। মন্ত্রীমণ্ডল কোনও বিষয় দ্বিমত হলেই বিদেশী মধ্যস্থতা অর্থাৎ প্রকারান্তরে বিদেশীদের অধীনতা। সেটা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য হলে মুসলিম লীগের প্রত্যেকটি দাবির কাছে কংগ্রেসের আত্মসমর্পণ। ভারতীয় ঐক্য কি এতই মূল্যবান যে তার জন্য ভারতের স্বাধীনতা তথা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিসর্জন দিতে হবে? সুতরাং কংগ্রেসকে ভারত ভাগে রাজি হতে হল। সেটা কিন্তু বিনা শর্তে নয়। কংগ্রেস আদায় করে নিল পাঞ্জাবের এক ভাগ ও বাংলার এক ভাগ। এটা হিন্দু ও শিখের অনুরোধেই। তারা ভারতীয় হিসেবে ভারতের সর্বত্র যাওয়ার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল, কেবলমাত্র দুটি বিচ্ছিন্ন প্রান্তে কোণঠাসা হতে চায়নি। তবে এটাও ঠিক যে সব হিন্দু ও শিখ পশ্চিমবঙ্গে তথা পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসতে পারত না। যারা চলে আসত তারা তাদের পুরাতন বাসভূমি হারাত। তাদের দিক থেকে পার্টিশন একটা ট্র্যাজেডি।

ভবিষ্যতে ভারত, পাকিস্তান, ও বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় একটি ইউনিয়ন গঠন করতে পারে। যেমন ফ্রান্স জার্মানি ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করেছে ও ক্রমশ আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছে। কারণটা প্রধানত আর্থিক। এর ফলে প্রত্যেকেরই আর্থিক লাভ হচ্ছে। নতুবা আর্থিক ক্ষতি হতো। তেমনই ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনসাধারণ ক্রমশ উপলব্ধি করবে যে সবাই মিলে একটি কনফেডারেশন গঠন করলে সবাইকারই আর্থিক উন্নতি হবে, নতুবা আর্থিক ক্ষতি। পার্টিশনের সময় ধর্মই হয়েছিল নিয়ামক। এতদিন পরে দেখা যাচ্ছে, সর্বত্র অধিকাংশ লোক দরিদ্র। যেমন ভারতে তেমনই পাকিস্তানে তেমনই বাংলাদেশে। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ বাধ্য হয়ে পার্থিব কারণে এক প্রকার কনফেডারেশন চাইবে। তাতে যোগ দেবে নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। সেই অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সাউথ এশিয়া অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিয়োনাল কো-আপারেশন। তবে এই পথেও বাধা যথেষ্ট। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না করলে পাকিস্তান অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির দিকে তাকাবে। তেমনই গঙ্গার জল বণ্টন সমস্যার সমাধান না করলে বাংলাদেশও ভারতের প্রতি বিমুখ হবে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য যেটা দরকার সেটাকে ইংরাজিতে বলে স্টেটসম্যানশিপ। ভারতের এখন স্টেটসম্যানশিপের অভাব। এই অভাব কবে পূরণ হবে, কার দ্বারা হবে তা আমরা কেউ জানি না। আমরা শুধু আশা করতে পারি যে এই প্রাচীন ও মহান দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান স্টেটসম্যানেরও আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর পাশে এই উপমহাদেশের অন্যান্য নেতারাও দাঁড়াবেন। মিলনের ডাকে সাড়া দেবে সমগ্র জনসাধারণ। এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে। কিন্তু কবে?

আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে

প্রশ্ন : এ বছর অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে আপনি আনন্দ পুরস্কার পেলেন আপনার সদ্য প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সমগ্র'র জন্য। এছাড়াও আপনি একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকও বটে, এইসব লিখতে গিয়ে কোন কোন বিষয় আপনাকে বেশী ভাবিয়ে ছিল এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন —

উত্তর : প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে একটা সমস্যা, যা বলতে গেলে জটিল, সেই নরনারীর চির দিনের, সেই সমস্যাকেই আমি প্রবন্ধে বেশী স্থান দিয়েছি যা আমাকে বরাবরই ভাবিয়ে ছিল। আমি এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই নারীর প্রেম, বিবাহ, মুক্তিরই সন্ধান খুঁজেছি।

'খোলামন ও খোলাদরজা' প্রবন্ধ বইটিতে প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় আট শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি। ১৯৬৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাই ভ্রমণ বিষয় লেখার জন্য, বইটির নাম 'জাপানে'। ১৯৮৩ সালে প্রফুল্লকুমার সরকার আনন্দ পুরস্কার পাই ঔপন্যাসিক হিসাবে। 'সত্যাসত্য', 'রত্ন শ্রীমতী', 'অসমাপিকা' প্রমুখ গ্রন্থের জন্য।

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে আধুনিক সাহিত্য ঠিক কোন অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে আপনার মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আধুনিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙক্ষা, লড়াই, এবং বাঁচার এক দীর্ঘ সংগ্রামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন : আজকাল পাঠক পাঠিকারা বড় বেশি মিডিয়া কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এই বহুমুখী মিডিয়ার সমাজে কতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আপনি মনে করেন? এর সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন আমরা কিভাবে করব? এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য যদি রাখেন—

উত্তর : তুমি যা বললে তার ভিত্তি করেই আমি বলছি। হ্যাঁ, অবশ্যই মিডিয়ার প্রয়োজনীতা আছে। যেমন তোমার কথা অনুযায়ী মিডিয়া বলতে টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, এবং নানা ধরনের ম্যাগাজিনই এর প্রধান বিষয়। আমরা আকৃষ্ট হচ্ছি দিনে দিনে। হয়ত বা কোনো সূক্ষ্ম আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। ভালো মন্দ তো থাকবেই। তাই বলে সাহিত্যচর্চাকে অবহেলা করলে চলবে না।

প্রশ্ন : অপসংস্কৃতির দিক থেকেও রেহাই পাচ্ছে না সাহিত্য। এখন অঙ্গুলি উঠেছে সেইসব সাহিত্যকলার ওপর যা সমাজকে অল্প অল্প করে অনেক বেশি স্বেচ্ছাচারী করে তুলছে। লাগাম ছাড়া অসামাজিক কাজকর্ম নাকি আজ এই সাহিত্যের কিছু অংশের দ্বারা প্রভাবিত। নানা সেমিনার এবং বিতর্কে ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছে মিডিয়া ও সাহিত্যের দ্বন্দ্বময় প্রসঙ্গগুলি। আজকের এই যুগে সাহিত্যের দায়বদ্ধতা ঠিক কতটুকুনি যা সাহিত্যিকরা সৃষ্টি করেন?

উত্তর : তোমার কথার প্রসঙ্গ টেনে আমি শুধুই একটি কথা বলব, একে যদি অপসংস্কৃতিই বলা হয় তবে সেটা সংস্কৃতিই নয়।

প্রশ্ন : আজ বিশ্বে সর্বত্র সাহিত্যিকদের ওপর মৌলবাদীদের আঘাত নেমে আসছে এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এত পরিবর্তন ওরা সহ্য করতে পারছে না। এত ব্যাপক পরিবর্তন প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে যে ওরা মানে ঐ মৌলবাদীরা তা সহ্য করতে পারছে না। ওদের গোঁড়ামী বা অন্ধ বিশ্বাসই এর মূল কারণ। ওরা পরিবর্তনের বিরোধী।

প্রশ্ন : আধুনিক শব্দটা আজ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর যখন প্রসঙ্গ টা নারীকে ঘিরে। এই আধুনিকা নারী কথাটা আপনি কী অর্থে দেখেন? যদি এই কথাটির তাৎপর্য একটু বুঝিয়ে বলেন।

উত্তর : দেখো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটির একটি বিশেষ মাত্রা আছে। বিগত শতাব্দী-গুলির দিকে আমরা তাকালে কেবলই দেখব নারী বন্দী। কোনো এক সংস্কারের বশে সে ক্রমাগতই মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তার চার দেওয়ালের অন্তরালে। তাই নারীর বহিঃপ্রকাশ হয়নি। আজ নারী খোলা আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারে আর জানালা দিয়ে সে বায়ু নেয় মুক্তমনে। আমি চাই নারীর মুক্তি। প্রকৃত অর্থে মুক্তি।

প্রশ্ন : এর সঙ্গে আরো একটা কথার সংযোজন করলাম, তা হল, আজকের এই নারীমুক্তি এবং নারী আন্দোলনের মাধ্যমে মহিলারা কি এই শেকল পরানো বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে পারছেন, পুরুষ শাসিত সমাজের বন্ধন থেকে?

উত্তর : একদিনেই তো মহিলারা আন্দোলন করে শেকল ছিঁড়ে মুক্তি পেতে পারে না বা সম্ভবও নয়। তবে একটু একটু করে তার পরিবর্তন হচ্ছে, হয়ত বা একদিন তারা চিরমুক্তি পাবে, তার জন্য সময় লাগবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের উপন্যাস 'লজ্জা' আজ আর উপন্যাস নয়, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থারই এক লজ্জা। যেখানে দেশের একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ লেখিকার নিরাপত্তায়, এর সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? আপনি তো কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও লেখকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন পেন (PEN)-এর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি।

উত্তর : হ্যাঁ, অতি অবশ্যই সভাপতি আমি এই ভারত উপমহাদেশের। তাই আমার সভাপতি হিসাবে একটা দায়বদ্ধতা রয়েছেই। আমি কেবল একটি কথা বারংবারই বলব। লেখিকা এমন কিছু বলেননি যার জন্য তাঁর প্রাণটা যায় আর মৌলবাদীদের মৃত্যু ফতোয়া জারি, আবার মোটা টাকার অঙ্কে, তা সত্যিই নিন্দনীয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন পেন (PEN) তার নিন্দা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। (PEN) পেন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপে বাংলাদেশ সরকার লেখিকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে ফ্রান্সে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন সরকার। ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুদিন কলকাতায় থাকেন। সেই সময় 'স্টেটসম্যান' কাগজের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন তাতে নাকি ইসলামের অবমাননা ঘটেছিল।

কিন্তু সেটা তিনি অস্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে আবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। এবং এর খবর পেয়ে লেখিকা আত্মগোপন করেন। এবার আন্তর্জাতিক চাপে সরকার তাঁকে জামিন দিয়ে দেশত্যাগের ব্যবস্থা করেন। এতে (PEN)-এর কিছু হাত ছিল, আমারও। কাজেই আমি খুব খুশি। তবে তাঁর বিপদ সম্পূর্ণ কাটেনি, মামলাটা তাঁর অনুপস্থিতিতে চলবে। তাতে তাঁর শাস্তি হতে পারে, তাঁর কারাদণ্ডও হতে পারে। দেশে ফিরে এলেই তাঁকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশের জেলখানা এমন এক জায়গা যেখানে তাজউদ্দিন সমেত চারজন নেতা মধ্যরাতে খুন হয়ে গেলেন অথচ খুনিদের শাস্তি হল না। সুতরাং কারাদণ্ড মানে তসলিমার প্রাণদণ্ডও হতে পারে। আমার মতে তাঁর উচিত হবে মামলাতে খালাস না হওয়া পর্যন্ত দেশে না ফেরা। তারপরেও তিনি মৌলবাদীদের রোষ থেকে নিস্তার পাবেন কি না সন্দেহ। তাহলে আরো অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে তসলিমার দেশে ফেরা নির্ভর করছে মৌলবাদের পরাজয়ের ওপর। সে পরাজয় সুদূর পরাহত।

প্রশ্ন : কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লেখার জগতে কেন আমরা বেশি করে নতুন প্রজন্মকে পাচ্ছি না? যেমন তরুণ-তরুণী কবি বা ঔপন্যাসিককে।

উত্তর : উত্তরটা, মনে হয়, তুমিই খোঁজ। তুমি তো কবি, কবিতা যখন লিখছ তখন একটু ভেবেই দেখো না, কেন তোমাদের প্রজন্ম সাহিত্যচর্চায় বিমুখ। তোমরাই পারবে একটু গভীরভাবে খুঁজলে এই প্রজন্মের সমস্যাটা কী তা জানতে।

প্রশ্ন : আপনি তো ত্রিকালদর্শী। এপার বাংলা ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের মধ্য দিয়ে আপনি আজও স্বপ্ন দেখেন দ্বিখণ্ডিত বাংলার একটি সূত্রে গাঁথা মনকে ও প্রাণের রূপকে। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গজননীর দুইটি ভগ্ন হৃৎপিণ্ড আপনাকে সারাটি জীবন কেবলই বেদনা যুগিয়েছে। এই এপার বাংলা, ওপার বাংলার বঙ্গ সংস্কৃতি আমাদের কতটুকু একাত্ম করতে পেরেছে বলে আপনার মনে হয়। আপনার অভিমত কী? আপনার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সামান্য কিছু আমরা শুনতে চাই।

উত্তর : আমায় তুমি ত্রিকালদর্শী বলো না। আমি ঋষি নাকি! ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী একটা সাহিত্য মেলা করেছিলাম শান্তিনিকেতনে। ঐদিন ওপার বাংলা থেকে পাঁচজন সাহিত্যিক এসেছিলেন। তারপর বহু চেষ্টা করেছি ওপারের সাহিত্যিকদের নিয়ে আসতে, কিন্তু তারা পাসপোর্ট' বা অনুমতি পাননি। মাত্র একদল এসেছিলেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ওঁরা এপারে এসেছিলেন এবং আমরাও ওপারে গিয়েছিলুম, কিন্তু মুজিব নিধনের পর এই আসা-যাওয়ার স্রোত আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে ওপার থেকে এপারে ছাত্রছাত্রীরা আসছেন পড়াশুনা করতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, আবার এপার থেকে অনেকে ওপারে নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন গান করতে বা আবৃত্তি করতে। রবীন্দ্রসংগীত চর্চা হচ্ছে ওপারে ব্যাপক আকারে প্রায় ঘরে ঘরে। এপারে সাহিত্যকদের লেখা ওপারে আগের তুলনায় অনেক বেশি যাচ্ছে, ওপার থেকে কিছু কিছু এপারে আসছে, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

প্রবল বাধা সংবাদপত্রের বেলায়। আগে তো আমি কলকাতায় বসে ঢাকার অনেক সংবাদপত্র কিনতে পেতুম। এখন একটিও দেখতে পাই না। শুনেছি ঢাকাতেও নাকি একইরকম হাল। এসব বাধা দূর করতে হবে, তা না হলে ভাববিনিময় ব্যাহত হবে। তবে রেডিও খোলা রয়েছে দুপারেই। মাঝে মাঝে রেডিও শুনি ওপারের।

ওপারের টেলিভিশন প্রোগ্রামও দেখি। একটা মজার ব্যাপার কি জানো—বহরমপুরের দূরদর্শন শাখা থেকে প্রচারিত আমার ছবি রাজশাহীতে (অধুনা বাংলাদেশ) দেখা যাচ্ছে। আজ আমি না গেলেও একদা আমি রাজশাহীতে ছিলাম, ওরা এখন আমায় দেখতে পাচ্ছে টেলিভিশনের দৌলতে।

'সাহিত্যরূপা'র পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নেন শান্তনু সেন।

অনুপ্রবেশ

অনুপ্রবেশের সমস্যা সব যুগে ও সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। একদা শক হূণরাও ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল, পশ্চিম থেকে। তেমনই অহমরা, পূর্ব থেকে। সুতরাং আজকের দিনে বাংলাদেশ থেকে কতক লোক ভারতে অনুপ্রবেশ করছে এটা নজিরবিহীন ঘটনা নয়। এরকম অনুপ্রবেশ তো অহরহ ঘটছে আমেরিকায় মেকসিকো থেকে, পোরটোরিকো থেকে। তেমনই জার্মানিতেও ঘটছে ক্রয়েশিয়া, বসনিয়া, সার্বিয়া, পোল্যান্ড, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ থেকে। ফ্রান্সে ঘটছে আলজিরিয়া থেকে। এসব আগন্তুকদের সীমান্ত রেখায় আটকে রাখা যাচ্ছে না। তা করতে গেলে বিরাট এক রক্ষীবাহিনী দরকার। এদের বহিষ্কার করতেও পারা যাচ্ছে না। আইন অনুসারে ডিপোর্ট করতে গেলে আদালতে সোপর্দ করতে হয়। আদালতের উপর সরকারের জোর খাটে না। সেখানে উভয়পক্ষের উকিলরা তর্কবিতর্ক করতে করতে অনেক সময় নেন। সেই সময়টা ধৃত ব্যক্তিদের জেলখানায় বিনাপরিশ্রমে আহার জোগাতে হবে। হিসেব করলে দেখা যায়, তাদের ডিপোর্ট করার চেয়ে না করাতেই কম খরচ। কারণ তারা নিজেরাই খেটেখুটে খায়। সরকারের সাহায্য চায় না। ছোটখাট অনেক রকম কাজ থাকে যা করার জন্যে তাদের সস্তায় খাটিয়ে নিতে পারা যায়। তাদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। তারা সঙ্ঘবদ্ধ নয়। অথচ তারা ভিক্ষুকও নয়। তাহলে তাদের বহিষ্কারের কী উপায়? চরমপন্থী দলগুলো বলবে, মেরে তাড়িয়ে দাও। কিন্তু মেরে তাড়াবে কে? পুলিশ, না গুণ্ডা? পুলিশ বেআইনিভাবে কাউকে মেরে তাড়াতে পারে না। তার আগে জানতে হবে লোকটা বাস্তবিকই বহিরাগত কি না। ভুল করে কোনও নাগরিককে যদি মেরে তাড়ানো হয় তাহলে পুলিশেরই শাস্তি হতে পারে। তাহলে শেষপর্যন্ত দাঁড়ায় যে কাজটা করতে হবে গুণ্ডাদের দিয়ে। রাজনৈতিক ভাষায় তাদের বলা হয় নাৎসি কিংবা ফাসিস্ত। আজকের দিনে আমরা নাৎসি বা ফাসিস্ত বাহিনীকে প্রশ্রয় দিতে পারিনে। আমাদের দেশে তারা সম্প্রদায়ের নামে চিহ্নিত।

তা বলে বাংলাদেশ থেকে যারা অনুপ্রবেশ করছে তারা সকলেই কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক নয়। বহুক্ষেত্রেই তারা হিন্দু। তারা বলে তারা শরণার্থী হিসেবে এসেছে। তাদের বিদায় করে দিলে তারা প্রাণে মরবে। তাদের কথা সত্যমিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই আমাদের। সুতরাং তাদেরকে বেনিফিট অব ডাউট দিতে হয়। তাদের আদালতে সোপর্দ করলে তারা বেনিফিট অব ডাউট পাবে। কোনও কোনও ব্যক্তি মুসলমান হলেও মৌলবাদী মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতিত। কাজেই তারা যদি বলে তারা শরণার্থী ও সেই সুবাদে অ্যাসাইলাম চায় তবে তাদের বেলাও ভাবনাচিন্তা করতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েক হাজার মুসলমান বুদ্ধিজীবী কলকাতায় এসে হাজির হন। তাঁদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা করেন। এটা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য। মুক্তিযুদ্ধের পরেও কতক বুদ্ধিজীবী মুসলমান বিপন্ন হয়ে কলকাতায় চলে আসেন, কতক চলে যান ইংলন্ডে, কেউ কেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশে বা আমেরিকায়। কারও কারও পাসপোর্ট থাকে, কারও কারও তাও থাকে না। এদেরকে সরকার

থেকে রেসিডেন্ট পারমিট দেওয়া হয়। কিন্তু নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। এরাও নিজেদের চেষ্টায় কিছু কিছু রোজগার করেন। সরকারের বা পাবলিকের মুখাপেক্ষী হন না। তারপর যখন দেশের অবস্থা অনুকূল হয় তখন ফিরে যান। এ ব্যাপারটা অন্যান্য দেশে দেখা যায়।

শেষপর্যন্ত সমস্যাটা গরিব মুসলমানদের নিয়ে। যারা প্রাণের দায়ে নয়, পেটের দায়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে এসেছে। ছাড়পত্র নিয়ে আসেনি। অনেক সময় এরা আপনা থেকে ফিরেও যায়। কেউ কেউ যায় আর আসে, আসে আর যায়। ছোটখাট নানা খুচরো কাজে এরা রুজি-রোজগার করে। বেশ কিছু মেয়ে হিন্দু নাম নিয়ে গৃহস্থের বাড়িতে কাজের লোক হয়। সীতা নামে একটি মেয়ে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করত। পরে জানা গেল তার নাম রাবেয়া। প্রথমে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে তাকে সেধে ডেকে আনা হয়। তাকে রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করতেও দেওয়া হয়। কিন্তু ঠাকুরঘরে ঢোকা বারণ। রাবেয়ার তাতে আপত্তি নেই। সে ঠাকুরদেবতা মানে না। উভয়পক্ষ উভয়পক্ষকে নিয়েই সন্তুষ্ট। যেমন বিলেতফেরত বাঙালিরা মুসলমান বাবুর্চিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত আর বাবুর্চিরা বাঙালি সাহেবদের নিয়ে।

আমাদের সীমান্ত-রেখাটা কাগজের পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ, ভূপৃষ্ঠে তার অস্তিত্ব নেই। হাজার পাহারা দিলেও বিস্তর ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে ওপার থেকে এপারে মানুষ চলে আসে। এপার থেকে যে কেউ যায় না তা নয়। হিন্দুরাও যায় নানান প্রয়োজনে। কুষ্টিয়া থেকে একজন হিন্দু ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলুম আমার চাকরির সময় নদীয়া সদর থেকে কুষ্টিয়ায় যেমন গোরুর গাড়ি যেত এখনও তেমনই যায়। সীমান্তে কেউ আটকায় না। এমনই অনেক তাজ্জব কাহিনী আমি শুনেছি। দুপক্ষের সীমান্তরক্ষীদের খুশি করে দিলে সবকিছুই পার হয়ে যায়। যেমন আগেকার দিনে নিখরচায় হত। সীমান্ত হয়ে দুই সরকারের কতক কর্মচারীর লাভের ফোয়ারা খুলে গেছে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই এপার বাংলার লোক ওপার বাংলায় আর ওপার বাংলার লোক এপার বাংলায় চলাচল করে এসেছে। মাল চলাচলও দুই পারেই সচল। জলস্রোতের মতো জনস্রোতকেও কোনও রাজা বা সুলতান বা লাটসাহেব বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারেননি। আটকাবার কথা ভাবতেও পারেননি। লর্ড কর্জন যখন বাংলা ভাগ করেন তখন সরকারটাই ভাগ হয়, নাগরিকত্ব ভাগ হয় না। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন বাংলা ভাগ করেন তখন এক ভাগ ভারতকে আর অপর ভাগ পাকিস্তানকে দেন। তখন নাগরিকত্বও ভাগ হয়ে যায়। গোড়ার দিকে পাসপোর্ট ও ভিসা ছিল না। পরে উভয়পক্ষের ইচ্ছায় পাসপোর্ট-ভিসার প্রবর্তন হয়। মুশকিলটা হল যারা পাসপোর্ট পায় না বা পাসপোর্ট পেলেও ভিসা পায় না তাদের নিয়ে। তারা যদি নিজের দেশে দানাপানি না পায় বা নিরাপদ বোধ না করে তবে তো তারা পেটের দায়ে বা প্রাণের দায়ে সীমান্তের ওপারে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন বা প্রাণের ভয় থেকে মুক্তি চাইবেই। এসব ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা দুঃসাধ্য তো বটেই, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। মানুষ হয়ে মানুষের দুর্ভাগ্য আমরা চোখে দেখতে পারিনে। সেইজন্যে আমরা অনুপ্রবেশ বন্ধ করার অনৈতিক বা অযৌক্তিক উপায় সমর্থন করতে পারিনে। মূল কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ছে অন্নবস্ত্র সেই পরিমাণে বাড়ছে না। অন্নবস্ত্রের অভাব যত বাড়ছে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধও তত বাড়ছে। মৈমনসিং থেকে আমার পুরনো এক সহকর্মী এসেছিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম যে দেওয়ানি মামলা খুব কমে গিয়েছে, ফৌজদারি মামলা খুব বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের অবস্থা যাতে স্বাভাবিক হয় তার জন্য ভারত সরকারের উচিত বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে নানাভাবে

সহযোগিতা করা, যাতে কৃষির উন্নতি হয়। শিল্পের উন্নতি হয়, বাণিজ্যের উন্নতি হয়, শাসনব্যবস্থার উন্নতি হয়, সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে অনুপ্রবেশ আপনা আপনি কমে আসবে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত ভারত সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি পুননবীকরণ এবং সেটা অন্তর থেকে। দেশভাগ হয়ে গেলেও মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক অভিভক্ত ও অবিভাজ্য একথা নিত্য স্মরণ রাখতে হবে।

মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের মুসলিমসংখ্যা বেশ বাড়ছে ও তার ফলে ভবিষ্যতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে একথা প্রচার করে চলছে একদল হিন্দু। এটা একটা সুদূর সম্ভাবনা—এত সুদূর যে এর আগে এক শতাব্দী পার হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিটাই লোপ পেয়ে যেতে পারে। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ একথা জেনেও তো আমরা কিন্তু বাংলা ভাগ চাইনি কার্জনের আমলে। না, ১৯৪৭ সালের আগেও না। মিলেমিশে একসঙ্গে বাস করেছি। মাঝে মাঝে দাঙ্গা ঘটলেও মেলামেশা বন্ধ হয়নি। তাতে উভয়পক্ষেরই সুবিধা, উভয়পক্ষেরই সমৃদ্ধি। সব চেয়ে খারাপটার কথা ভেবে প্রথম থেকে ভয় পাব কেন? কই আমেরিকানরা তো ভয় পাচ্ছে না। জার্মানরাও ভীত নয়। ভয়টা কি শুধু ভারতের হিন্দুদেরই?

ইহুদী বনাম আরব

বেঁচে থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব হতে দেখা যায়। সেদিন 'কেব্‌ল' টিভিতে দেখলুম ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের লনে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী য়িটজহাক রাবিন ও প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান য়িসের আরাফত করমর্দন করছেন। তা ছাড়া উভয়পক্ষের হয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করছেন যথাক্রমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেস ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মাহ্‌মুদ আব্বাস। বক্তৃতাও শুনলুম রাবিনের ও পেরেসের। চমৎকার ইংরেজি। যদিও দু'জনেই পোল্যান্ডের ইহুদী। জন্মভূমি থেকে পালিয়ে এসেছেন পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের গঠন বা পুনর্গঠন সূত্রে।

পুনর্গঠন বলেছি এইজন্যে যে ইহুদীরা প্রায় সকলেই দেশছাড়া হয় প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমানদের দখলে অতিষ্ঠ হয়ে। শরণার্থীরা ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। পরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। তখন থেকেই তাদের প্রতিদিনের প্রার্থনার সঙ্গে তারা একটি বাক্য জুড়ে দেয়, "আমরা যেন আবার জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারি।" এই দুরাশার পূরণ হয় বিংশ শতাব্দীতেই যখন ইসরায়েল নামক রাষ্ট্র গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়। ইহুদীদের অবর্তমানে আরবরা প্যালেস্টাইনে গিয়ে প্রায় তেরো শ' বছর ধরে বসবাস করে কায়েমি স্বত্ব অর্জন করেছে। তারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রমেদিনী ছেড়ে দেবে কেন? যুদ্ধের ফল হয় জেরুজালেমের পশ্চিম ভাগ ইহুদী রাষ্ট্র, ইসরায়েলের পূর্ব ভাগ আরব রাষ্ট্র ট্রান্স জর্ডানের। তেমনি জর্ডান নদীর পশ্চিম অঞ্চল আরব রাষ্ট্রের, অবশিষ্ট ইসরায়েলের। গাজা বন্দর দখল করে মিশর।

বলা বাহুল্য, ইহুদীদের সঙ্গে আরবদের সংঘর্ষের অবসান ঘটে না। বিশ বছর বাদে আবার লড়াই। এবার ইসরায়েল দখল করে সমস্ত পূর্ব জেরুজালেম তথা জর্ডান নদীর পশ্চিম অঞ্চল। আবার যুদ্ধ বাধে। গাজা দখল করে ইসরায়েল ও আরবদের উপর শাসনভার চাপিয়ে দেয়। দখলী এলাকায় বহিরাগত ইহুদীদের বসানো হয়। সব শুদ্ধ প্রায় আট লক্ষ আরব দেশছাড়া হয়।

তখন থেকে আরবদেরও প্রতিদিনের প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত, "আবার যেন আমরা জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারি। আবার যেন আমরা সারা প্যালেস্টাইনে ফিরে যেতে পারি।"

যুদ্ধ একদিন আবার বাধতই। আরবরা আপাতত প্রস্তুত নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে মৌলবাদীরা দিন দিন সংখ্যায় বাড়ছে, পরে নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করতে পারে। যারা এখন ইসরায়েলের মিত্র রাষ্ট্র আমেরিকার মিত্র আরব তারাও কালক্রমে শত্রু আরব হবে। যুদ্ধ আবার বাধলে আমেরিকাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ানরাও। চতুর্থবারের যুদ্ধ মহাযুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে। ইরাক ও ইরান তাতে থাকবেই। সিরিয়া, জর্ডান, লেবাননও বাদ যাবে না। মিশরও। মৌলবাদী মিশরীরা ইতিমধ্যে আমেরিকায় গিয়ে নিউ ইয়র্কের ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আমেরিকার জনমত বদলে যাচ্ছে।

অপরপক্ষে আরব গেরিলা নেতা আরাফতেরও আশঙ্কা যে মৌলবাদী মুসলমানরা একদিন তাঁর অর্গানাইজেশন হস্তগত করবে। মনে রাখা দরকার যে আরাফতের সহকর্মীদের অনেকেই জাতিতে আরব হলেও ধর্মে খ্রিস্টান। পয়গম্বরের পূর্বেও আরবদের মধ্যে খ্রিস্টান ছিল। এখনো রয়েছে। জর্জ হাবাশ খ্রিস্টান। তিনি চরমপন্থী। শিরহান বলে সেই যে ছেলেটি রবার্ট কেনেডিকে গুলি করে সেও খ্রিস্টান আরব। আর হান্নান আশরাভি বলে যে মহিলাটি ওয়াশিংটনে আররদের দলের মুখপাত্রী তিনি খ্রিস্টান প্রটেস্টান্ট ঘরানা। আরবমাত্রেই মুসলমান নয়। বিখ্যাত কবি খলিল জিব্রান ছিলেন লেবাননের খ্রিস্টান্। ইরাকের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তারিক আজিজ মুসলমান নন, খ্রিস্টান। মৌলবাদী মুসলমানরা প্রবল হলে খ্রিস্টান আরবদের মন ভেঙে যাবে। এমন কী, আরাফতের নিজের স্ত্রীরও। বিবাহসূত্রে তিনি মুসলমান হলেও জন্মসূত্রে খ্রিস্টান। তাঁর ঘরানা গ্রীক অর্থোডক্স। তিনি নিজে মুসলমান হলেও তাঁর আত্মীয়রা তো খ্রিস্টান।

সেকুলার আরবদের এই হচ্ছে শেষ সুযোগ। যেমন শান্তিপ্রিয় মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসীদেরও। মার্কিন ইহুদীদের মধ্যেও অনেকে আর যুদ্ধ চান না। কট্টর ইসরায়েলীরা এখন আর তাঁদের সমর্থন পাচ্ছেন না। সুতরাং রাবিন আর আরাফত দু'জনের মানসিকতা এখন মিটমাটের জন্যে প্রস্তুত। বেশ কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে গোপন শলাপরামর্শ চলছিল নরওয়েতে সেখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যস্থতায়। ওয়াশিংটনে প্রকাশ্য কথাবার্তা তো প্রায় অচল হয়ে এসেছিল জেরুজালেমের প্রশ্নে। কোনো পক্ষই জেরুজালেমের উপরে ঐতিহাসিক দাবি ছাড়তে চান না। সেটা যেমন রাজা ডেভিডের রাজধানী, তেমনি মক্কা ও মদিনার পরে মুসলমানদের পবিত্রতম তীর্থস্থান। আর আরব খ্রিস্টানদের মানবরূপী ভগবান যিশুর তিরোধানের সঙ্গে যুক্ত। কেবলমাত্র ইহুদীরাই তার মালিক হবে এটা তারাও কি চায়?

যতদূর মনে পড়ে ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেছিলেন জেরুজালেমকে দুই পক্ষের শাসনমুক্ত ফ্রী সিটি করতে। সেটাই শেষ পর্যন্ত হবে, যদি বিশ্ব জনমত জেরুজালেমের ইস্যুতে আর একটা মহাযুদ্ধ এড়াবার সিদ্ধান্ত নিতে ইউনাইটেড নেশনকে একবাক্যে অনুরোধ করে। আধাআধি বখরা আরবরা মেনে নিলেও ইহুদীরা মানতে নারাজ। তারা কি আমেরিকার কথায় কর্ণপাত করবে? যদিও আমেরিকা তাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর একটা হেস্তনেস্ত দেখা যাবে পাঁচ বছর বাদে। আপাতত আরব নেতা আরাফত জেরিকো আর গাজার স্বশাসনের ভার পেয়েই সন্তুষ্ট। আপাতত অধিকৃত ভূখণ্ডে তিনি পা রাখার ঠাঁই পাচ্ছেন। যদিও ইসরায়েলই তাঁর সরকারের উপরওয়ালা থাকছে। তবে তিনি আমেরিকা তথা ইউনাইটেড নেশনের সঙ্গে যোগসূত্র অটুট রাখছেন। আমার মনে হয় তাঁর সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র টিউনিসেই থাকবে। ইসরায়েলের আওতার বাইরে।

এটা ভুল ধারণা যে ইউরোপ আমেরিকার ইহুদীরা সকলেই আদি বাসভূমিতে ফিরে যেতে সত্যি সত্যি আগ্রহী ছিল। ইসরায়েলে যত ইহুদী গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে আমেরিকায় ও রাশিয়ায়। তা ছাড়া ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে। যারা গেছে তারা সাধারণত পূর্ব ইউরোপ পোল্যান্ড জার্মানীর ইহুদী। নাৎসীরা যদি ষাট লক্ষ ইহুদীকে বাঁচতে দিত তা হলে তারা জার্মানীতেই থেকে যেত ও তাদের সংখ্যা ইসরায়েলে ইহুদীদের চেয়ে বেশি হতো। ইসরায়েলের উন্নতির সম্ভাবনা এত বেশি নয় যত ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলিতে তথা আমেরিকায়। তাদের প্রগতিতে সাহায্য করেছে ইহুদীদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় আগ্রহ,ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থনিয়োগ, সঙ্গীত নাটক চিত্রকলা স্থাপত্য দর্শন ও

সাহিত্যে অনুরাগ। তাদের তুলনায় আরবরা তো ঘোর অন্ধকারে। সংস্কৃতির দিক থেকে ইসরায়েল ইউরোপের একটি দেশ, যার অধিবাসীরা ইউরোপীয়। এক টুকরো ইউরোপ যেন ছিটকে পড়েছে আরব দুনিয়ায়। নিজের অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা নেই, মাঝখানে প্রায় হাজার বছরের ফাঁক। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাব-বিনিময় নেই। অন্তহীন বিবাদ। ইসরায়েলকে প্রাচীন ইসরায়েলের সমগ্র ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে। অপর পক্ষে আরবদেরও ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে তার পুনর্গঠনের সময় যে সীমানা আন্তর্জাতির ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছিল সেই সীমানার পরিপ্রেক্ষিতে। রাবিন ও আরাফাত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। উভয়পক্ষের চরমপন্থীরা যদি প্রবলতর হয় তবে চুক্তি অকেজো হবে। তবে তার সম্ভাবনা কম।

ইসরায়েল চায় আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তার অর্থনীতিকে মজবুত করতে। আর প্যালেস্টাইনের অধিকৃত এলাকার মানুষ চায় সর্বপ্রকার উন্নয়ন। যাতে ইসরায়েলের সমকক্ষ হতে পারে। এর জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি প্রচুর অর্থ সাহায্য করবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তহবিল তৈরি করতে আসরে নামবেন। ধনী আরব দেশগুলিও দানসত্র খুলবে। শরণার্থীরা যদি নির্বাসন থেকে বাড়ি ফিরে আসতে পারে ও তাদের যদি অন্নসংস্থান হয় তবে আপাতত স্বায়ত্তশাসনেও বহুলোক সুখী হবে। তবে আখেরে স্বাধীনতা চাইবে ইসরায়েলের অধিকৃত এলাকার সর্বসাধারণ। সেই সঙ্গে জেরুজালেমের আরব অংশ। সেখানেই হবে তাদের রাজধানী। এতে যদি ইসরায়েল রাজি হয় তো চরমপন্থীরা দু'পক্ষেই কোণঠাসা হবে। আর নয় তো যুদ্ধবিগ্রহের জড় থেকে যাবে।

আরাফতের সঙ্গে বিবাদটা মিটে গেলে সিরিয়ার সঙ্গে বিবাদ, লেবাননের সঙ্গে বিবাদ, জর্ডানের সঙ্গে বিবাদও মিটে যাবে। যেমন মিটে গেছে মিশরের সঙ্গে। পরের ধাপটা আরব ইসরায়েল ইকনমিক কমিউনিটি গঠনের চেষ্টা। তাতে তুরস্ক তথা ইরানও যোগ দিতে পারে। যুদ্ধের চেয়ে শান্তিই সকলের পক্ষে শ্রেয়।

ম্যাজিক লণ্ঠন

আমি যখন ছোট ছিলুম আমাদের বাড়িতে অনেক পত্রিকা আসত। সেসব পত্রিকার আসল বিষয় ছেড়ে আমি পড়তুম কেবল বিজ্ঞাপন। আর বিজ্ঞাপনের মধ্যে সেই বিজ্ঞাপন অনুসন্ধান করতুম যার শীর্ষে থাকত "বিনামূল্যে"। বিনামূল্যে সোনার ঘড়ি ও চেন, বিনামূল্যে ভৌতিক আয়না, বিনামূল্যে গানের বই, চুলের কলপ, দাঁতের মাজন, গুপ্ত মন্ত্র, অক্ষয় কবচ। এর সবগুলো অবশ্য আমার কাজে লাগবার নয়। তবু পাওয়াই যচ্ছে যখন বিনি পয়সায় তখন নিয়ে রাখলে ক্ষতি কী?

বাবাকে গিয়ে বলতুম, বাবা, একখানা পোস্টকার্ড দাও। কাকে চিঠি লিখব জিজ্ঞাসা করলে বলতে লজ্জা করত সোনার ঘড়ি কোম্পানিকে। অগত্যা মিথ্যা বানিয়ে বলতুম ছোট মাসিকে। কিংবা শ্রীরামপুরের সেই বন্ধুকে।

পোস্টকার্ড চাইলেই পাওয়া যেত। আর পেলেই নিজের হাতে লিখে স্বয়ং ডাকঘরের বাক্সে দিয়ে আসতুম। তারপর একদিন আসত ক্যাটালগ বা বিনামূল্যে ঘড়ি পাবার শর্ত। বাবার হাতে পড়লে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, তোর নামে কে এসব পাঠায়? আমি বলি, তাই তো। শ্রীরামপুরের বন্ধু নয় তো?

ক্রমে বুঝলুম বিনামূল্যে জিনিস পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় জিনিসের মূল্যতালিকা। অতএব বিনামূল্যে অন্বেষণে ক্ষান্তি দিলুম। এবার আমার লক্ষ্য হলো অল্প মূল্যে কী কেনা যায়।

পূজাপার্বণে হাতখরচ যা পেতুম তার থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে ঠাকুমার কাছে গচ্ছিত রাখতুম আমি ও আমার ভাই তিনু। আমাদের দুই ভাইয়ের নামে এমনি করে প্রায় চার টাকা ও দু টাকা জমা ছিল। তা ছাড়া আমাদের পিসতুতো ভাই কিরণও আমাদের বাড়ি থেকে লেখাপড়া করত। তার নামে জমা ছিল টাকা তিনেক। তিন জনে মিলে ঠিক করলুম তিনজনের তিন টাকায় আমরা কিনব একটা ম্যাজিক লণ্ঠন।

ম্যাজিক লণ্ঠন! ওঃ! তার মত বিস্ময়কর আর কী আছে! বাপ রে বাপ রে বাপ! ম্যাজিক লণ্ঠন! পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! এক দিকে থাকবে আলো, অন্য দিকে পর্দা, পর্দার উপর ছবি ফুটে উঠবে, জীবন্ত ছবি। ঠাকুমাকে আভাস দিয়ে রাখলুম কোম্পানীর কল আসছে, পৃথিবীর যা কিছু দেখতে চাও ঘরে বসে দেখতে পাবে। "তাই নাকি। কালীঘাটের কালী?" "নিশ্চয়। নিশ্চয়। কালীঘাটের কালী। আলীপুরের চিড়িয়াখানা। যাদুঘর।"

আমরা আজকাল চুপি চুপি পরামর্শ করি। কাউকে কাছে ভিড়তে দিইনে। পাছে ফাঁস হয়ে যায়। বাবা জানলে কপালে অনেক দুঃখ আছে। পড়াশুনা ফেলে আমরা এই নিয়ে ক্ষেপেছি। এর ক্ষমা নেই। লণ্ঠন এলে সেটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখব, কোথায় পর্দা খাটানো হবে, সবাইকে কোথায় বসাব এসব ভেবে আমাদের বিষম উদ্বেগ।

মনের আগুন চাপা থাকে না। পাশের বাড়ির বীরেন সুরেনরা আমাদের শত্রু। তবু তারা কেমন করে টের পেল আমরা ম্যাজিক লণ্ঠন আনাচ্ছি। অমনি তাদের সুর বদলে গেল। "হ্যাঁরে,

খবরটা কি সত্যি? আমরাও দেখতে পাব তো। একদিন কিন্তু আমাদেরও ধার দিতে হবে।" আমরাও রাজি হয়ে গেলুম। আমার মাথায় এক নতুন বুদ্ধি উদয় হলো। বাবাকে বলা যাবে লণ্ঠনটা ওদের, আমরাই ধার করেছি।

বীরেনের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ চলতে থাকল। তার প্রতিভার তুলনা নেই। সে বললে, "হুঁ হুঁ। এ বড় সামান্য কল নয়। সামনেই রথযাত্রা। আমরা যাত্রীদের কলের বাজি দেখিয়ে অনেক টাকা রোজগার করব। এক এক আনা করে টিকিট। তারপর সেই টাকায় আমরা কিনব বায়োস্কোপ। পাঁজিতে লিখেছে ত্রিশ টাকায় বায়োস্কোপ হয়।"

তিন টাকায় ম্যাজিক লণ্ঠন থেকে ত্রিশ টাকার বায়োস্কোপ। এ যে বিড়াল বিক্রয়ে বড়মানুষ। শুধু তাই নয়। খোঁড়া কার্তিকের সঙ্গে হবে আমাদের প্রতিযোগিতা। সেও রথের সময় ম্যাজিক দেখায়। কিন্তু তার তো কল নেই, আছে একটি লোহার শিক যা সে জিভের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেয়, একটি ফুটো ঘটি যা দিয়ে জল পড়ে না, এই সব।

বীরেন বললে, "দ্যাখ, কল তো এসে পড়ল বলে। কিন্তু পিয়ন যদি সোজা তোর বাবার হাতে দেয়।" তা হলে তো চিত্তির। আমরা স্থির করলুম পিয়নকে মাঝ রাস্তায় পাকড়াব। কিন্তু একটিমাত্র পিয়ন। সে যে কখন কোন পথ দিয়ে যায়, তার সাথে সাথে ঘোরা তো চলে না। তখন আমরা পরামর্শ-পরিষৎ ডেকে সাব্যস্ত করলুম ডাকঘরের কেরানি বাবুর সঙ্গে ভাব করব। বীরেনই সে ভার নিল। তিনি পার্সেলটাকে পিয়নের হাতে দেবেন না, ইন্টিমেশনও আটক করবেন। বীরেন রোজ একবার খোঁজ নেবে সেটা এসেছে কিনা।

একদিন সকাল বেলা বীরেন আমার দিকে একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আর ভয় নেই। এর নাম ইন্টিমেশন। তিন টাকা দু আনা সমেত এখানা দাখিল করলে পার্সেলটি তোর।"

এতকাল কেবল ক্যাটালগই আসত। এবার আমার নামে জলজ্যান্ত একটা পার্সেল এসেছে, আমার নামে। যা তা জিনিস নয়। ম্যাজিক লণ্ঠন। এখুনি ডাকঘর থেকে আনিয়ে নিয়ে এই বেলা পর্দা খাটিয়ে বাজি দেখাব। রাত্রের জন্য তুলে রাখব না। বীরেন বললে, "দল বেঁধে সবাই যদি ডাকঘরের দিকে রওনা হই নির্ঘাত ধরা পড়ব। একবার ভেবে দ্যাখ্, কলকাতা থেকে আড়াইশো মাইল দূরে এসে কলটি ফেরত যাবে।" স্থির হলো কেউ যাবে গলি দিয়ে, কেউ বড় রাস্তা দিয়ে, কোনো দলে দুজনের বেশী থাকবে না।

আমরা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ নিলুম। আর পিছনে থাকল কিরণ, ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা আদায় করার ভার পড়ল তার উপরে।

এই যে ডাকঘর দেখা যাচ্ছে। বীরেন পৌঁছে গেছে। জানালার এপার থেকে কেরানিবাবুর সঙ্গে কথা কইছে সে। হয়তো এতক্ষণে পার্সেলটাও সিন্দুক থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু কই, কিরণ যে আসে না। তিনু আর আমি এগিয়ে যাব কি ছুটে গিয়ে কিরণকে তাড়া দেব, এই ভাবছি এমন সময় পিছন থেকে ডাক শুনলুম বাড়ির চাকর নবীনের। "খোকাবাবু, বাবা ডাকছেন।" সর্বনাশ। যা ভয় করেছিলুম তাই। বাবা জানতে পেরেছেন। আমরা দু ভাই পার্সেলের মায়া কাটিয়ে হেঁট মুখে বাড়ি ফিরলুম। বাবার সামনে দাঁড়ালে তিনি চোখ পাকিয়ে শুধালেন, "পার্সেলের জন্যে কে চিঠি লিখেছিল?" এই বিপদে বীরেনের নাম করে থাকি তো পাঠকরা আমার মিথ্যাবাদিতার দোষ ধরবেন না। উত্তরকালে যারা গল্পলেখক হয় মিথ্যা বানিয়ে বলাই তাদের শিক্ষানবীশী।

বাবা হয়তো বিশ্বাস করলেন, কিন্তু কাকা ইতিমধ্যে একগাছি লকলকে বেত সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যার প্রয়োগ না করে তিনি নিরস্ত হবেন এতটা ত্যাগ স্বীকার তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ তিনি তখনো ছাত্র। আমাদের দুই ভাইকে চাবকাতে চাবকাতে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি নিয়ে গেলেন। পাছে আমাদের মনে ক্ষোভ থাকে এজন্যে তিনি কিরণকেও বঞ্চিত করলেন না।

আমার মা আমাদের হাতে তিনটে আতা দিলেন। আমরা মারের যন্ত্রণা ভুলে আতার আস্বাদনে মন দিলুম। ওদিকে বেচারা বীরেন অশেষ ধৈর্যের সহিত আমাদের প্রতীক্ষা করে পরিশেষে চরের মুখে শুনল যে আমরা ধরা পড়ে মার খেয়েছি। তখন সেও চোখের জলে ভেসে বাড়ি ফিরল। সেই থেকে আবার আমাদের সঙ্গে তার আড়ি।

ম্যাজিক লণ্ঠন ওয়াপস্ গেল। আর আমাদের দুই ভাইয়ের টাকাও হলো বাজেয়াপ্ত। যার টাকা নেই তার বিজ্ঞাপন পড়ে কোন সুখ? আমি বিজ্ঞাপন ছেড়ে আসল বিষয় পড়লুম। পড়তে পড়তে মৌতাত ধরল। তখন মনে হল এই তো ম্যাজিক। চুরি করে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী পড়লুম। বুঝি আর না বুঝি, প্রত্যয় হলো, ম্যাজিক হচ্ছে এই। সহিত্য হচ্ছে ম্যাজিক লণ্ঠন। স্লাইড তার অসংখ্য, বিচিত্র, সবাক, বহুবাক, সজীব, অমর। পৃথিবীর প্রথম এবং চরম আশ্চর্য হচ্ছে সেই।

তারপর ক্রমে আবিষ্কার করলুম যে আমিও স্লাইড বানাতে পারি। এমন কি কোনো কোনো স্লাইড আমার হাতেই বনে ভালো। তখন আমি সাহিত্যের কারিকর হলুম।

১৯৩৩

প্রাচীন কবি

প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধিৎসা ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা নয়, জাতীয়গৌরববাদীর নয়, ধর্মগৌরববাদীর নয়। এই জীবন কোন কবির চোখে কেমন লেগেছিল তাই আমার জিজ্ঞাসা। প্রাচীন কবিদের সন্ধান হচ্ছে নয়নী জনের সন্ধান। আমার চোখে তো আমি অনেক দেখলুম, তাঁদের চোখেও দেখতে চাই।

সাহিত্যবিশারদ সাহেব বোধহয় আমার মন জেনে আমাকে একখানি বই দিলেন, বইখানি দুজনের লেখা, তাঁর ও ডক্টর এনামুল হক সাহেবের। বইখানি নাম রাখা হয়েছে "আরকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য।" যে কয়জন কবির পরিচয় তাতে আছে তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম প্রসিদ্ধ। তাঁরা দৌলত কাজী, মাগন ঠাকুর ও আলাওল। আরো তেরো জনেরও সংবাদ আছে, তাঁদের কেউ কেউ বেশ প্রতিভাবান। এই একখানি বই লিখে বিশারদ ও ডক্টর সাহেবান ছুটি পাবেন, তা নয়। এইসব কবিদের বিস্তৃত পরিচিতি প্রয়োজন।

কবি দৌলত অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর কীর্তি "সতী ময়না"। এই কাব্য তিনি অসমাপ্ত রাখেন, সমাপন করেন আলাওল। আলাওলের নিজের কীর্তি "পদ্মাবতী"। আমাদের গ্রন্থকারদ্বয় বলেন "পদ্মাবতীর" উপাখ্যান একটি হিন্দী কাব্য থেকে নেওয়া। মালিক মুহম্মদ জৈসীর "পদুমাবৎ" সেকালের এক বিখ্যাত বই। কিন্তু পদ্মাবতী বা পদ্মিনীর কাহিনীও সেকালের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। আলাওল নিছক তর্জমাকার ছিলেন না, স্বাধীন কবি ছিলেন, যদিও তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগ অন্যসূত্রে প্রাপ্ত।

এই দুই কবির মধ্যে দৌলৎকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে গ্রন্থকারদ্বয় অন্যায় করেননি। তবে রচনাসৌষ্ঠবে আলাওল শ্রেষ্ঠ। তাঁর ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রসাদগুণে সুপাঠ্য।

মাগন ঠাকুরের কাব্য "চন্দ্রাবতী"। এর কথাবস্তু তিনি কোথাও পেয়েছিলেন কি নিজে বানিয়েছিলেন তা বলা শক্ত। সেকালের দেশী ও বিদেশী যতগুলি কবির নাম জানি তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের কাব্যের আখ্যানভাগ বাইরে থেকে পেয়েছিলেন। এটা তৎকালীন প্রথা। সুতরাং মাগন যে এই বিষয়ে মৌলিক ছিলেন অথচ আলাওল তা ছিলেন না, এমন মনে করতে পারিনে। "সতী ময়না" বলে দৌলতের সেই কাব্যটির মধ্যে মনে হয় দুটি গল্প জোড়া দেওয়া হয়েছে—ময়নার প্রলোভন ও লোর চন্দ্রাণীর প্রণয়। আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, কিন্তু কেউ যদি পঞ্জাবে তল্লাস করেন তবে লোর চন্দ্রাণীকে আবিষ্কার করলেও করতে পারেন।

তখনকার দিনে কতগুলি গল্প ছিল মানুষের মুখে মুখে। অনেক কবি সেই একই গল্প অবলম্বন করে পুঁথি লিখতেন, যাঁরটি সবচেয়ে ভাল হতো সেটিই স্থায়ী হতো। যেমন ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর"। সকলে জানেন রামপ্রসাদও "বিদ্যাসুন্দর" লিখেছিলেন, তা কেউ পড়ে না। আমাদের আলোচ্য প্রাচীন কবিত্রয় তখনকার দিনের লোকপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। লোকে যে তাঁদের রচনা সাদরে সঞ্চয় করেছে, এই তাঁদের সাফল্যের প্রমাণ। তবে আমি 'চন্দ্রবতী'-কে প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পারছিনে। এতে কয়েকটি অপ্রাকৃত ঘটনা আছে।

সেকালের অনেক পুঁথিতে থাকলেও আলাওল বা দৌলত কাজীর পুঁথিতে অপ্রাকৃত ঘটনা নেই। কাব্যের মূল্য প্রকৃত মানুষের প্রকৃত অনুভূতিতে।

তিনখানি কাব্যেরই বিশেষত্ব এই যে এদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব বা ভগবৎ মহিমা বা দেবদেবীর আবির্ভাব নেই। এই প্রলোভন সংবরণ করা তখনকার দিনের বাঙালি কবির পক্ষে দুঃসাহসিক কাজ। মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিও ধর্মের ধ্বজাঙ্কিত নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে সেকালের অলঙ্কার, বাজনা, বিবাহ ইত্যাদির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা পরম বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার পরিচায়ক। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মধ্যেই এসব নিবদ্ধ ছিল না, হিন্দুদের মধ্যেও ছিল। হিন্দু-মুসলমানে এখনকার মত ভেদ থাকলে কি মুসলমানদের মধ্যে পদে পদে হিন্দু আচার লক্ষিত হতো? তা ছাড়া কাব্যগুলির নায়কনায়িকাদের নাম তো হিন্দু নাম। এবং একজন মোসলেম কবি তো স্পষ্ট লিখেছেন—

হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ
হিন্দু কুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।
মা হওয়া বন্দম জগত জননী
হিন্দু কুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী।
হজরত রসুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দু কুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।

বস্তুত তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানে একপ্রকার অভিন্নতার সাধনা চলেছিল, বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও আমি তার চিহ্ন পেয়েছি। এই গ্রন্থ প্রমাণ করছে রাজা বৌদ্ধ, রাজকবি মুসলমান, কাব্যের নায়কনায়িকা হিন্দু। চমৎকার নয়?

এবার আমি একটু তর্ক করব। আমি মেনে নিচ্ছি যে আলাওল প্রভৃতি কবি রোসাঙ্গ রাজের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু রোসাঙ্গ রাজসভার অবস্থান কোথায়? গ্রন্থকারদ্বয় বলেন, আরাকানে। কিন্তু আরাকানে রোসাঙ্গ নামে কোনো নগর ছিল না এবং নেই। গ্রন্থকারদ্বয় বলেন, রোসাঙ্গ হচ্ছে আরাকানী ভাষায় রখইঙ্। বেশ, তাই যদি হয় তবে কি রখইঙ্ নামে কোনো নগর ছিল? না, তাও না। রখইঙ্ একটি অতি ক্ষুদ্র পাহাড়িয়া উপজাতির নাম, তাদের সঙ্গে আরাকান রাজ্যের রাজধানীর কী সম্পর্ক? আসলে আরাকানের নাম পর্যন্ত নেই এসব কাব্যে। অথচ আরাকান বেশ পুরাতন নাম। এসব কাব্য আরাকানে লেখা হলে বা আরাকানী সভার শ্রোতাদের জন্যে লেখা হলে আরাকানী সমাজের ছাপটুকু পড়ত। আরাকানের নাম তো নেইই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই, বর্ণনা নেই। পক্ষান্তরে

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী

আরাকানের তৎকালীন রাজধানী ম্রো হৌঙ্গ বা ম্যো হৌঙ্গ কর্ণফুলীর পূর্বে নয়। এখনও সেই নগর আছে, আকিয়াবের কিছু পশ্চিমে। এত বড় একটা ঐতিহাসিক রাজ্যের ঐতিহাসিক রাজধানী যদি সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ নামে অভিহিত হয়ে কর্ণফুলীর পূর্বে থাকত তবে সেটা হতো এক ভৌগোলিক বিপর্যয়।

১৯৩৮

আধুনিক বাংলা কবিতা

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন যে, যেটা কাব্য সেটা পদ্যে হলেও কাব্য গদ্যে হলেও কাব্য, তখন বিতর্ক শোভা পায় না। এখন কেবল একটি জিজ্ঞাসা থাকে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'ছিন্নপত্র', 'গল্পগুচ্ছ', 'ঘরে-বাইরে' ইত্যাদি অসংখ্য গদ্যগ্রন্থে এমন অংশ কি হাজার দশেক নেই যাকে কেটে নিয়ে পদ্যের মতো করে ছাপলে আরো পঞ্চাশ-খানা 'পুনশ্চ' তৈরি হয়, যাকে তর্জমা করে পদ্যের মতো করে সাজালে আরো অনেকগুলি ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'।

রবীন্দ্রনাথ কেন, বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র মণীন্দ্রলাল বিভূতিভূষণ অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র প্রবোধকুমার প্রভৃতির গদ্য কি মূলে কাব্যের পর্যায়ে পদার্পণ করেনি? সাজাতে জানলে বহু সহস্র কবিতা আজই বাংলা কবিতার চয়নিকার সন্নিবিষ্ট হয় না?

আমি তো দেখেছি পদ্যের অনুকরণে সাজানো ছাড়া আধুনিক কবিতায় অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা পুরাতন গদ্যের ছিল না। পদ্যের অনুকরণে সাজানো বলেই এই জিনিস কবিতা বলে কাটছে, ঐ অনুকরণটুকু ছাড়লে এর বৈশিষ্ট্য থাকে না।

কাব্যরসের দিক থেকে বিচার করলে ল্যাম, লী হান্ট, ডি কুইনস্, পেটার, রাসকিন যত শত প্রবন্ধ লিখেছেন তার অধিকাংশই কবিতা অথচ কোনো ইংরেজী কাব্য সংকলনে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত ল্যামের দুই-একটি মাঝারি পদ্য দেওয়া থাকে। 'সঞ্চয়িতা'র পরবর্তী সংস্করণে আশা করি 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'ছিন্নপত্র' ও 'গল্পগুচ্ছ' থেকে কিছু কিছু ও 'লিপিকা' থেকে বেশী বেশী কবিতা থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ 'গদ্য কাব্য' নামে একটা কথা ব্যবহার করেছেন। পদ্যে যা লেখেন তা কি পদ্য কাব্য?'

বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র, ১৯৩৭

আধুনিক বাংলা কবিতার কথা উঠলে সসঙ্কোচে বলতে ইচ্ছা করে, এমন করে ক'দিন চলবে।

গল্প বেশ চলছে, প্রবন্ধ মন্দ চলছে না। অচল কেবল কবিতা এবং কবিতার চেয়েও পশ্চাদ্‌পদ নাটক। কিন্তু নাটকের কথা থাক।

আমার বিশ্বাস কবিতা যে ভাষায় লেখা হয় সে ভাষা আধুনিক বাঙালির ভাষা নয়। কাব্যে অরুচির এ হলো প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ আমার মতে অবজেক্টিভিটির অভাব। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—এই হচ্ছে দেশের স্বরূপ, তথা কবিতার স্বরূপ।

পদ্যের ভাষার দশা দেখে অনেকেই পদ্যই ছেড়েছেন, পরিবর্তে লিখেছেন গদ্য এবং নাম দিচ্ছেন গদ্য কবিতা। আমাদের গদ্যের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, যথেষ্ট লঘুভার না হলেও

যথেষ্ট সাবলীল, লক্ষ্যভেদ না করলেও শরের মতো তীক্ষ্ণ। এমন গদ্য থাকতে পদ্য লিখতে চাওয়া নেহাৎ জোর করে চাওয়া কিংবা অভ্যাস বশে চাওয়া। অনেকে পদ্যের সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে গদ্যের ভাগ্যের সঙ্গে কবিতার গাঁটছড়া বাঁধছেন। এ এক রকম ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েনস্। এর পক্ষে বহুত যুক্তি আছে। আর এই তো সংসারের নিয়ম। তা হোক্, আমার স্থির ধারণা গদ্যে কবিতা হতে পারে না। যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব। যাঁরা গদ্য কবিতা শুরু করেছেন তাঁদের পদ্য কবিতায় ফিরে আসতেই হবে, কেননা পদ্য কবিতাই কবিতা। কবিত্বের স্বাদ লোভনীয়, কিন্তু কবিতার স্বাদ মোহনীয়। আসতেই হবে ফিরে, তবে তার আগে পদ্যের ভাষা পদ্যের মতো আধুনিক হওয়া চাই। প্রায় অসাধ্য সাধন, তবু আশা আছে। বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো গদ্য কবিতায় আধুনিক ভাষার আভাস পেয়েছি। তার উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। বিষ্ণু দের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা চলে।

গদ্য পদ্যের স্থান পূরণ করতে পারে না, পদ্য থাকবেই, হয়তো তার পরিণতির এই শেষ, তবু তার শেষ নেই। কবিতাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বিয়ের উপহার ও শিশু পারিতোষিক বাবদ তার চাহিদা থাকবে। শিশুপাঠ্য মাসিকে য়েসব পদ্য ছাপা হয় সেইসব ছড়া কবিতার জন্য রাস্তা বাঁধছে, একদিন ঐ সড়কে কাব্যের মোটর শিঙা ফুঁকবে। বিয়ের পদ্যের কাছে তেমন দুরাশা নেই, একদা সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা যে কাজ হতো এখন কৃত্রিম পদ্যের দ্বারা তাই হয়, কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান।

তারপর অবজেকটিভিটির প্রসঙ্গ। এর পারিবারিক হাতের কাছে যা পেলুম, তা গ্রহণের অযোগ্য। আমার বক্তব্য এই যে বাংলা কবিতা যা বলতে চায় তা ছাড়া আর সবই বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলে, কিন্তু সেই জিনিসটি বলে না। কী করে বলবে, স্বয়ং বক্তার কাছেই পরিষ্কার নয়, তিনি বক্ বক্ করতেই—বকম বকম করতেই ব্যস্ত। নিজের বানানো গোটাকতক বাক্য আর বাক্যাংশ তাঁকে মশগুল করে রাখে, কী বলতে চেষ্টা করে কী বলে চললে তার হিসাব নেই, হয়তো তিনি চেষ্টা করেন না, কলম আপনি দৌড়ায়, কাগজ আপনি কালো হয়, কালি আপনি ফুরোয়। আমাদের কবিদের ভাব আসে, তাঁর ভাবাবেশে, ইম্‌প্রোভাইজ করেন, আমাদের গায়কদের মতো ইমপ্রোভাইজেশনের উপর তাঁদের প্রচণ্ড ঝোঁক। সঙ্গীতকারদের রাগালাপ আর কাব্যকারদের বাক্যালাপ উভয়ের সাদৃশ্য সাতিশয় তাজ্জবকর।

আধুনিক বাঙালিও আধুনিক মানুষ। তার সময় কম, তার কাজ আছে। সে ঘড়ি ধরে গান শোনে, ছবি দেখে, কাব্য পড়ে। লোকটা আর যাই হোক বেহিসাবী নয়। বেহিসাবী বাগ্‌বহুল তরল কবিতা—তরল অথচ গন্তব্যহীন—তার কাছে উপদ্রব বিশেষ। আধুনিক জীবনের সঙ্গে আধুনিক কবিতার বনিবনা ঘটছে না। জীবনের ক্রমেই প্রত্যয় হচ্ছে যে কবিতার কিছুই বলবার নেই, শুধুমাত্র বলাটাই তার বলবার। এতবড় জলজ্যান্ত জীবনটা সামনে পড়ে রয়েছে, তবু তার বিষয়ের অভাব। আমার মনে হয় বাণীকে বাহন না করে উপাস্য করাতেই এই দুর্গতি। এর প্রতিকার, বাক্যের সন্ধান ছেড়ে বস্তুর উপর মন দেওয়া। প্রয়োজন হলে বস্তু আপনার বাক্য গড়ে নেয়। বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগ নিরর্থক হবে না, যদি সে কানের ভিতর না দিয়ে সরাসরি মর্মে প্রবেশ করে।

নেহরু শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে

জবাহরলারের কথা উঠলেই পার্টিশনের কথা ওঠে। প্রধানত তাঁকেই দোষী করা হয়। পার্টিশন যদি দোষের হয়ে থাকে তো সে আমার সে তোমার দোষ। আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি, প্রতিরোধ তো দূরের কথা। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। মৌন থাকার মানে সম্মতি দেওয়া।

সেদিন মৌন থাকার পর যাঁরা মুখর হন তাঁদের ধারণা মুসলিম লীগকে বখরা না দিলেও চলত। আস্ত কেকটা কংগ্রেস ভোগ করত। সে রকম একটা ধারণা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠনের সময় কংগ্রেস মহলে থাকলেও দিকে দিকে দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রসার দেখে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে হয় গান্ধীজীর পরামর্শে মুসলিম লীগকে গদীতে বসিয়ে দিয়ে বনবাসে যেতে হবে, নয় দিল্লীতেই শক্ত হয়ে বসে যেসব অঞ্চল কংগ্রেসের চেয়ে লীগকে পছন্দ করে সেসব অঞ্চল লীগকে ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস অবশিষ্ট ভারতে নিষ্কন্টক হবে।

প্রথমটা অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস নেতারা দ্বিতীয়টা গ্রহণ করেন। তাঁদের দিকেই ছিল অধিকাংশ হিন্দুর সমর্থন। গান্ধীজীর দিকে নয়। দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের দশা কী হবে সেই চিন্তায় গান্ধীজী উদ্বিগ্ন। ব্রিটিশ বেয়োনেট তাদের রক্ষা করবে না, কংগ্রেসের বেয়োনেট নোয়াখালি বা লাহোর পর্যন্ত প্রসারিত হবে না, গান্ধীজী বড়জোর ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভয় দিতে পারেন, তাও আরো কঠিন হবে যদি পূর্ববঙ্গে বা পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ সংখ্যালঘুরা নিপীড়িত হতে থাকে। কিন্তু নেহরু, পটেল প্রমুখ নেতাদের উপর জোর করে তিনি তাঁর আপত্তি চাপিয়ে দিতে পারতেন না। তা ছাড়া মাউন্টব্যাটেনকে ব্যর্থ হয়ে ফিরিয়ে দিলেই কি ব্রিটিশ সরকারের পলিসি পালটে যেত? তাঁরা কি চাপিয়ে দিতেন মুসলিম লীগের উপরে অখণ্ড ভারত? চাপানোর ক্ষমতা কি তাঁদের থাকত, যদি ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করত?

ব্রিটিশ সৈন্য নেই, ব্রিটিশ পুলিশ নেই, ব্রিটিশ ম্যাজেস্ট্রেট নেই এমন এক পরিস্থিতিতে সারা ভারতে শান্তি রক্ষার দায় কংগ্রেসই বা নিত কোন্ সাহসে? আর তার শূন্যস্থানে মুসলিম লীগকে বসিয়ে দিলে লীগও কি শান্তি রক্ষা করতে পারত সারা ভারতে? তবে কি লীগ কংগ্রেসকে সাধত কোয়ালিশনের জন্যে। কিন্তু জিন্না তেমন মানুষই নন। তিনি কাউকে সাধবেন না। বরং তাঁকেই সাধবে আর সবাই। মায় বড়লাট স্বয়ং। কেকটাকে তিনি তাঁর খুশিমতো কেটে নিতেন। তাঁর ভাগে দিল্লী শহরটাও পড়ত। সেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্থানীয় সমর্থন পেতে তাঁর দেরি হতো না। তারাই আওয়াজ তুলত—"পাকিস্তানের জন্যে চাই দিল্লী।" জিন্নাকে দিল্লী দিলে পূর্ব পাঞ্জাবও দিতে হয়। তখন হিন্দু ও শিখরা ক্ষেপে যেত। ইংরেজরাই বা সে ঝুঁকি নিত কেন? গান্ধীজী যখন মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের ভার দিতে বলেন তখন মাউন্টব্যাটেন তাতে কান দেন না। ব্রিটিশ সৈন্যকে অপসরণ করাই তাঁর পলিসি, তাকে দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন করার কাজে নিযুক্ত করলে অপসারণ অযথা বিলম্বিত হতো। লীগকে বখরা দেওয়া তাঁর কাজ নয়, কংগ্রেসের কাজ। পাকিস্তান দিতে হয় কংগ্রেসই দিক। নয়তো বলকানীকরণ।

না পার্টিশন, না লোকবিনিময়, না পাঞ্জাবে দুই প্রান্তে পাঁচ লক্ষ নরনারীর প্রাণনাশ, না দিল্লীর সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে গান্ধীজীর মরণপণ অনশন, না তাঁকে অপসরণ করার জন্যে তাঁর নিধন এর কোনোটাই ঘটত না, যদি ইংরেজ রাজত্ব আরো দশ বিশ বছর স্থায়ী হতো। কিন্তু বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার অ্যাটলীকে জানিয়ে দেন যে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস অবধি তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন, তার পরে আর নয়, যদি না আরো অনেক আই. সি. এস অফিসার নিয়োগ করা হয়। তা হলে তিনি ও তাঁর পরবর্তী বড়লাটরা আরো পনেরো বছর ব্রিটিশ শাসন চালাতে পারবেন।

অ্যাটলী মার্চ ১৯৪৮কে টেনে জুন ১৯৪৮ পর্যন্ত নিয়ে যান, কিন্তু আরো পনেরো বছরের প্রস্তাব নাকচ করেন। ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে মোতায়েন থাকলে পশ্চিম জার্মানী পাহারা দেবে কে? ওদিকে রেড আর্মি যে পূর্ব জার্মানীতে খুঁটি গেড়ে বসেছে, আবার বিশ্বযুদ্ধ বাধলে তেড়ে আসবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উপর বরাত ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগে অপসরণ করতে। তিনি দেখেন তিনি যদি তাঁর দেশের সৈন্যদের আরো তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে না পারেন তো তারা হিন্দু মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। হিন্দুকে মুসলমানের হাত থেকে বা মুসলমানকে হিন্দুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য মরুক এটা তিনি বা তাঁর কর্তারা চান না। কতক মরবেই, যদি ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় হস্তক্ষেপ করে।

ব্রিটিশ সৈন্য সহায় না হলে কংগ্রেস পাঞ্জাবে বা বাংলাদেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা থামতে পারত না। বিহারে বা যুক্ত প্রদেশে পালটা দাঙ্গাহাঙ্গামা তার প্রতিবিধান নয়। রাজনৈতিক সমাধানের আবশ্যকতা ছিল। সে সমাধান যেমন ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের তেমনি কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের। কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের কোয়ালিশন যদি সম্ভব হতো, যদি স্থায়ী হতো, তবে পার্টিশনের প্রয়োজন হত না। হলে হতো প্রথমত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের খরচে, দ্বিতীয়ত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের খরচে, তৃতীয়ত দেশের স্বাধীনতার খরচে। কারণ লীগ সত্যি সত্যি চায়নি যে তৃতীয়পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত হোক। জিন্না চেয়েছিলেন বড়লাট থাকুন ও তাঁর ভীটো প্রয়োগের ক্ষমতা রাখুন। মাউন্টব্যাটেন নারাজ। তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হতে চান। নইলে তাঁকে জিন্নার খাতিরে সৈন্যসামন্ত সমেত থেকে যেতে হতো নির্দিষ্টকালের পরেও।

রাজনৈতিক সমাধান অত্যাবশ্যক ও পার্টিশন ভিন্ন অন্য কোনো রাজনৈতিক সমাধান নেই এই দুটি কথা মনে রাখলে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের সার্থকতা বোঝা যায়। এর দ্বারা সংবিধান রচনা সুগম হলো। কংগ্রেস থেকে গেল দিল্লীর মসনদে। উপরন্তু লাভ করল কলকাতার মসনদ। লীগকে ছেড়ে দিতে হলো পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব পাঞ্জাবের উপর দাবী ও কায়েমী স্বত্ব। নির্বাচন পদ্ধতির ও সরকারি চাকরিতে স্বতন্ত্র কোটার মীমাংসাটা যেন উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য হয়। ম্যাকডোনালডের রোয়দাদের মতো নয়। তা দেখে গান্ধীজীও অনুমোদন করেন।

কিন্তু শিখরা তাদের প্রার্থিত শিখিস্থান পায় না। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি ও সরকারি চাকরিতে স্বতন্ত্র কোটা হারায়। তাদের জ্বালা অনির্বাণ।

লালন ফকির প্রসঙ্গে

লালন জন্মদ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর কাছ থেকে পাওয়া গ্রন্থের উপর নির্ভর করে আমিও একখানি গ্রন্থ লিখি। নাম 'লালন ও তাঁর গান।' লালনের তিরোধান শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে। তাতে কিছু যোগ করেছি। তাও আবুল আহসানের কাছ থেকে পাওয়া গ্রন্থের উপর নির্ভর করে। আমার নিজের সংগৃহীত তথ্য বা গান নেই।

লালন তাঁর সুদীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতেন না। তাঁর পিতামাতা সাতকুল, জন্মকাল, জন্মস্থান সমস্তই অজ্ঞাত। অনুমান প্রমাণ নয়। তিনি বারবার বলেছেন তিনি হিন্দু কি মুসলমান তা জানেন না। তা সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায় থেকেই দাবি উঠেছে যে তিনি তাদেরই একজন। কবীরের বেলায়ও তাই ঘটেছে।

মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে লালন ছিলেন সিরাজ সাঁই দরবেশের দীক্ষিত শিষ্য। সাঁই দরবেশরা সুফী সাধক। সেই সুবাদে লালনও একজন সুফী সাধক। সুফী সাধকদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন। দৃষ্টান্ত কিরণচাঁদ দরবেশ। ধর্ম আর সাধনা এক জিনিস নয়। লালন নমাজও করতেন না, পূজাও করতেন না, মসজিদেও যেতেন না, মন্দিরেও যেতেন না, তাঁর উপাসনার মাধ্যম ছিল স্বরচিত গান। তাঁর গান দিয়ে তিনি যাঁর উপাসনা করতেন তিনি মানুষ রতন, এই মানুষে আছেন সেই মানুষ, এই দেহেই তাঁর অবস্থান। লালনের গানে আমরা পাই মানুষতত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব। এ দুটি তত্ত্ব সুফী সাধনার বৈশিষ্ট্য কি না জানিনে। তবে যোগী, সহজিয়া, বাউল, বৈষ্ণব ও আরো কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর অস্তিত্ব লক্ষ করি। লালন সুফী হলেও বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্তত 'হিতকরী' সম্পাদক তাই বলেন। তিরোধানের পর তাঁর দেহ তাঁর আখড়ায় সমাধিস্থ হয়। পরে অনুষ্ঠিত হতে যায় ভাণ্ডারা বা মচ্ছব। বাউলরা জোড়ে জোড়ে বাস করেন, অথচ তাঁদের সন্তান জন্মায় না। এটা সুফী রীতি কি না জানিনে। তবে এটা কয়েকটি ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের রীতি। এঁরা সাধক সম্প্রদায়, আক্ষরিক অর্থে ধর্ম সম্প্রদায় নন। হিন্দু সমাজপতিরা এদের বলেন নেড়া নেড়ী, মুসলমান সামাজপতিরা বলেন নাড়ার ফকির।

এঁদের কণ্ঠের স্বতঃস্ফূর্ত গান সাধন সঙ্গীত। লোকগীতি নয়। এঁরা মরমী সাধক। লোককবি নন। ইদানীং লোকসাহিত্য ও লোকশ্রুতির চর্চা করতে গিয়ে আমরা সারি, জারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ভাদু, ঝুমুর ইত্যাদির সঙ্গে বাউলদের গানকেও বন্ধনীভুক্ত করছি। তা হলে তো দোঁহা, কীর্তন ইত্যাদিও লোকগীতি। লোকগীতির গায়কদের সঙ্গে বাউল গায়কদের একাকার করা উচিত নয়। বাউলদের সাধনা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা লোকগীতির গায়ক হতে পারে, কিন্তু লালনগীতির মর্ম তাদের অজানা।

লালনের গান বলে বাজারে চলতি গান মাত্রেই খাঁটি নয়। কিন্তু কোনটি খাঁটি ও কোন্‌টি নয় তা নিশ্চয় করা আমার সাধ্য নয়। লালন চর্চা নিয়ে যাঁরা সারা জীবন নিযুক্ত তাঁরাই নির্ণয় করতে পারবেন। তেমন ব্যক্তি ছিলেন আমার বন্ধু মনসুরউদ্দীন সাহেব।

লালন ফকির প্রসঙ্গে পুনশ্চ

আমি লালন বিশেষজ্ঞ নই। যেটুকু জানি সেটুকু তাঁর গানের সংকলন থেকে। গান শোনার জন্যে বাংলাদেশে যেতে পারিনে। সেখানকার দরবেশ দীক্ষায় দীক্ষিত প্রকৃত লালনশাহী বাউল আনিয়ে নিয়ে খাঁটি লালন গীতি শুনতে চেষ্টা করেছি, বার বার ব্যর্থ হয়েছি। মাত্র একবার কয়েকজনকে আনিয়েছিলেন এক বন্ধু। তাঁর সৌজন্যে কয়েকটি গান শুনেছিলুম। বিশুদ্ধ সুরে। তোমাদের সরকার যদি বাধা না দিতেন আমরা নিজেদের উদ্যোগে ওপার থেকে আরো কয়েকজনকে আনাতে পারতুম। দুঃখের বিষয় তাঁদের অনেকেই এখন বিগত। সরকার প্রসন্ন না হলে জীবিতদের পরে পাওয়া যাবে না।

আমার লালনচর্চা একখানিমাত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ। সেটি তোমার লালন স্মরণ গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত। তোমার সাহায্য না পেলে ও বই লেখাই হত না। দোষ যা আছে তা আমার। গুণ যা আছে তা তোমার।

কুষ্টিয়ায় কর্মরত অবস্থায় আমি লালন সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে পারিনি। একবার আমার নিবাসে তিনজন দরবেশ আসেন। তাঁদের একজন মহিলা। নাম হরিদাসী। তাঁরও দরবেশ দীক্ষা। তাঁদের একজনের নাম ইসব শাহ। অন্যজনের নাম মনে নেই, বোধহয় কালু শাহ। তাঁদের গানের ভনিতায় লালনের নাম ছিল কি না মনে পড়ছে না। তার পর কেটে গেছে পঞ্চান্ন বছর। হরিদাসীর চেহারা দেখে ধারণা হয়নি যে তিনি হিন্দু কন্যা। তিনি দলটির নেত্রী। বয়স বেশী। বলিষ্ঠ গড়ন। কতকটা পুরুষালি। তিনিই বলেন, "আমরা দরবেশ।" এর থেকে অনুমান করতে পারা যায় লালনের শিষ্যদের মতো শিষ্যাও ছিলেন। এখনো আছেন। তবে নামকরণ হিন্দুর মতো নয়।

আমার জীবনের উপর লালনের প্রভাব আমার অজানা। রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়েছিল কি না বলতে পারব না। এসব প্রশ্ন তোলা বিতর্ক ডেকে আনা। লালনের গান ভালবাসার অর্থ এই নয় যে আমরা তাঁর সাধনার ভাগী। তিনি ছিলেন সুফী দরবেশ, কতকটা বৈষ্ণব, কতকটা সহজিয়া, কতকটা তান্ত্রিক দেহতত্ত্ব সাধক। ওঁকে পুরোপুরি চেনে ক'জন। আরো গবেষণা দরকার। তোমাকেই করতে হবে। জতিবৈর মনোভাব কি কেবলমাত্র লালনচর্চায় দূর হতে পারে? তবে সম্প্রীতি বাড়তে পারে।

সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য

এই সম্মেলনের নাম যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ছিল তখন মূল বঙ্গভূমি এর এলাকাভুক্ত ছিল না। তখন আপনারা যাঁরা বঙ্গভূমির বাইরে ছিলেন তাঁরা কলকাতা এলে প্রবাসী বাঙালি বলে পরিচিত হতেন। এখন আপনারাও স্ববাসী বাঙালি। প্রবাসীর মতো ব্যবহার আপনারাও করেন না, আমরা যারা কলকাতায় থাকি তারাও আশা করিনে। তথাপি আমারা আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনারা কত দূর-দূরান্তর থেকে এসেছেন। আমরা আপনাদের পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

এই প্রতিষ্ঠানের আদিপর্বে বঙ্গভূমি ছিল এক ও অখণ্ড। বাংলাভাষা ছিল সমগ্র বাঙালি জাতির মাতৃভাষা। এখন আমরা দেখছি নিখিল ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ বলে আখ্যায়িত অংশটি নেই। অথচ সেটিই বৃহত্তর অংশ। আমাদের ক্ষমতা নেই যে ঢাকায় কিংবা চট্টগ্রামে গিয়ে সম্মিলিত হই। একমাত্র উপায় সেখানকার সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্য রসিকদের এপারে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা। 'বাঙালি জাতি' কথাটিও আজকাল বিতর্কিত। ভাষা ও জাতি যেন সমার্থক নয়। যিনি যাই বলুন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখনো একটানা একটাই ইতিহাস। যিনি যাই লিখুন, বাংলাসাহিত্যের একমাত্র ভাণ্ডারেই, জমা হচ্ছে। ধর্ম ও সমাজে হিন্দু ও মুসলমান ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ভাষায় ও সাহিত্যে সেরূপ ভাগ ছিল না, নেই ও থাকবে না। সুতরাং বাংলাদেশের সাহিত্যিকরাও এখানে স্বাগত। আমি তাঁদেরও আমার আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানাই।

এই সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করা। সম্ভব হলে ভাবীকালের বাংলাসাহিত্যের রূপরেখা অঙ্কন। অযথা অহঙ্কারের বা পরিতাপের কোনো প্রয়োজন নেই। সাহিত্যস্রোত প্রবহমান ছিল, প্রবহমান রয়েছে। শুকিয়ে যায়নি, শুকিয়ে যাবে না। সর্বক্ষণ স্ট্যান্ডার্ডের উপর লক্ষ রাখতে হবে। লেখার মান যেন নেমে না যায়।

এবারকার অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য এটি কলকাতা মহানগরীর তিনশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের অঙ্গ। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিহাসে কলকাতার দান অতুলনীয়। ইংলন্ডের যেমন লন্ডন, ফ্রান্সের যেমন প্যারিস, অবিভক্ত বঙ্গের তেমনি কলকাতা। তিনটি গ্রাম মিলে একটি বন্দর হয়, নামকরণ হয় তাদের একটির নামে। বন্দর পরিণত হয় রাজধানীতে। বঙ্গ, বিহার, ওড়িশার রাজধানী থেকে সারা ভারতের রাজধানী। বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হয়, কলকাতা হয় অবশিষ্ট বঙ্গের রাজধানী। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর আবার বঙ্গের রাজধানী, কিন্তু বিহার ওড়িশার রাজধানী নয়, সারা ভারতের রাজধানীও নয়। পরে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী নয়, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। বন্দরেরও অবক্ষয় হয়।

এসব বাহ্য ঘটনার প্রভাব জীবনেও পড়েছে, সাহিত্যেও পড়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ এখন এক বিতর্কিত বিষয়। সমালোচকরা বাবু কালচার ভিন্ন আর কিছু দেখতে পান

না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ যেন একটা লটারি জেতার মতো ব্যাপার। তার পেছনে যেন আস্ত একটা যুগের আস্ত একটা জাতির নবজাগরণ ছিল না। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধবিগ্রহ, সহিংস তথা অহিংস আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশভাগে ও ব্রিটিশ অপসরণের ফলে কলকাতা যেমন তার গৌরব হারিয়েছে তেমনি বাংলা যাদের মাতৃভাষা সেই জনসমষ্টিও। এরূপ অবস্থায় অবক্ষয় তো ঘটবেই। সাহিত্য ওর বাইরে নয়।

তা সত্ত্বেও এখন কলকাতায় চিত্র প্রদর্শনীর রমরমা, শুনছি পাঁচ হাজার শিল্পী যে যার ঘরে বসে ছবি আঁকছেন। আর্টস একর বলে শিল্পী উপনিবেশও গড়ে উঠেছে। ভাস্কর্যের কাজও চলেছে। বাংলা ফিল্ম বিশ্ববন্দিত। বাংলা থিয়েটার ভারতনন্দিত। কবিদের সংখ্যাও হাজার পাঁচেকের কম নয়। তাঁরা পাঁচজনে মিলে পোস্টকার্ডে কবিতা ছাপান, লিটল ম্যাগাজিন চালান। তবে কোথাও একটা চাপা হতাশার সুর। জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার মতো বিষাদ। যাকে রাজনৈতিক হই হুল্লা দিয়ে ঢাকা যায় না।

কলকাতা এখনো অনেক কিছু শেখাতে পারে। আমরা তার উপর ভরসা রাখি। কলকাতা দীর্ঘজীবী হোক।

অযোধ্যাকাণ্ড

আমি যখন প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হই তখন কনফিডেনশিয়াল বাক্স খুলে দেখি একখানি পুস্তিকা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে পারতপক্ষে মিলিটারিকে ডেকো না। মিলিটারি এলে মিলিটারি কমান্ডান্ট যা করতে বলবেন তোমাকে তাই করতে হবে, বিপরীতটা নয়। নেহাৎ যদি অবস্থা তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সরকারের অনুমতি নিয়ে মিলিটারিকে ডাকতে পারো। এটা হলো ব্রিটিশ আমলের নির্দেশ। এখনকার আমলের নির্দেশ আমার অজানা।

কেন্দ্রীয় সরকার অযোধ্যায় বিস্তর সেনা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফৈজাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের ডাকলেনই না, কারণ উত্তরপ্রদেশ সরকারের অনুমতি পেলেন না। সরকারকে আমি দোষ দিতে পারিনে। যেখানে দু'লাখ লোক হানা দিতে জড়ো হয়েছে সেখানে গুলি চালালে দু'শো লোক তো মরবেই।

আড়াই বছর আগে একটি প্রবন্ধ লিখে আমি ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলুম যে বাবরি মসজিদ যারা ধ্বংস করতে চায় তাদের জড়ো হতে দিলেও তারা গায়ের জোরে ধ্বংস করতে গেলে রামভক্ত পুলিশ বাধা দেবে না। সামরিক বাহিনীতেও রামভক্ত। মুলায়ম সিং যাদব এটা বুঝতেন। নিবারণের জন্যে প্রবেশ বন্ধ করেছিলেন। দুটি করসেবক পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারায়। মুলায়মের গদী যায়। কল্যাণ সিং গদীতে বসেন। কল্যাণ সিং জানতেন তিনি যদি মুলায়মের মতো নিবারণ করতে যান কিছু করসেবক প্রাণ হারাবে আর তিনি গদী হারাবেন।

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যাতে এতদূর না গড়ায় তার জন্যে অনেক আগে থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের পলিটিসিয়ানরা বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ নেন না, তাঁদের লেখা পড়েন না। স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকেন। যেটা শুনতে ভালো লাগে সেটাই শোনেন। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি কি জানতেন না যে মসজিদটা না সরালে মন্দিরটা ঠিক সেই জায়গায় গড়া সম্ভব নয়? মন্দির বানাতে যারা বদ্ধপরিকর মসজিদ ভাঙতেও তারা নাছোড়বান্দা। এক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

একটার অস্তিত্বের খাতিরে অন্যটার নাস্তিত্ব আবশ্যক। মসজিদওয়ালারাও এক চুল সরতে নারাজ। ওটা তাদের পাঁচ শতাব্দীর উত্তরাধিকার। দশজন মুসলমান যদি বলে "ছেড়ে দাও" নব্বইজন মুসলমান বলবে, "মরে গেলেও না।"

বস্তুত সংখ্যালঘুরা কোথাও কিছু দয়া করে ছেড়ে দেয় না। দয়া করাটা সংখ্যাগুরুদেরই সাজে। রমনার কালীবাড়ি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী ফৌজ ধূলিসাৎ করেছিল। বাংলাদেশ সরকার সেটা গড়ে দিতে রাজি, কিন্তু সেই জমিতে নয়। হিন্দুরা নারাজ। তাঁদের দাবি ওইখানেই বানাতে হবে। ফলে অচল অবস্থা।

তেমনি এক অচল অবস্থা অযোধ্যায় মন্দির মসজিদ নির্মাণ পুনর্নির্মাণ নিয়ে অবশ্যম্ভাবী। মুসলমানরা বলবে, "মসজিদটা ওইখানেই বানাতে হবে, একটুও দূরে নয়।" হিন্দুরা বলবে, "ওটা রামজন্মভূমি। ওখানে মসদিজ বানাতে গেলে বাধা দেব।" ঠিক ওইখানেই মন্দির বানাতে

গেলে মুসলমানরা সুপ্রীম কোর্টে যাবেই। মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণ স্থগিত রাখার আদেশ আদায় করবে। এ মামলা ও শতাব্দীতে মিটবে না। ততদিনে হয়তো কেন্দ্রে পালাবদল ঘটে থাকবে। নরসিংহ রাওয়ের প্রতিশ্রুতি কাগজে-কলমে তোলা থাকবে। উত্তরপ্রদেশে যদি আবার কল্যাণ সিং মুখমন্ত্রী হন তো আবার একদফা দাঙ্গা বাধবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অর্থ যদি হয় দাঙ্গা নিবারণ, তবে বাবরি সমস্যাটার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে তৎপর হতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা কামাল পাশার পলিসি অনুসরণ করতে পারি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত সেন্ট সোফিয়া গির্জা তুর্করা পঞ্চ শতাব্দীতে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের পর নতুন জমানায় কামাল পাশা সেটিকে মিউজিয়মে রূপান্তরিত করেন। খ্রিস্টান ও মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের দাবি তিনি মানেন না। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সেকুলার। তাই তাঁর সমাধানটা হলো সেকুলার। জবাহরলালের পর তাঁর উত্তরসূরীদের কাউকে তাঁর মতো মনে প্রাণে সেকুলার দেখতে পাইনে। তাই সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে এখনো আমরা ব্যতিব্যস্ত।

কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ছিল সেকুলার সংগঠন। ধর্মনির্বিশেষে যে কোনো ভারতীয় বা ভারতবন্ধু তার সদস্য হতে পারতেন। সভাপতি হতে পারতেন। আর মুসলিম লীগ ছিল তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ধর্মীয় সংগঠন। কেবলমাত্র মুসলমানরাই তার সদস্য হতে পারতেন। সভাপতি হতে পারতেন। দেশভাগের সময় ইংরেজরা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুটি ভাগের নাম করেছিলেন। জবাহরলাল হিন্দুস্থানের বদলে ইন্ডিয়া নামকরণ করেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আদর্শে ইন্ডিয়াও সেকুলার। অপরপক্ষে মুসলিম লীগের আদর্শে পাকিস্তান ধর্মীয়। ইন্ডিয়ার সংবিধান রচিত হয় সেকুলার আদর্শে। পাকিস্তানের ধর্মীয় আদর্শে।

জবাহরলাল কাশ্মীর দাবি করেন সেকুলার রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে। জিন্না সাহেব দাবি করেন ধর্মীয় রাষ্ট্রের অঙ্গরূপে। বিবাদটা হিন্দু বনাম মুসলিম নয়। সেকুলার বনাম ধর্মীয়। ভারতরাষ্ট্র যদি তার সেকুলার চরিত্র পরিত্যাগ করে ধর্মীয় চরিত্র গ্রহণ করে তবে কিন্তু বিবাদটা ধর্মীয় বনাম ধর্মীয়। হিন্দুরাষ্ট্র আর মুসলিম রাষ্ট্র দুটোর মধ্যে থেকে বেছে নিতে বললে কাশ্মীরী মুসলমানরা পাকিস্তান বেছে নেবে। গায়ের জোরে কাশ্মীর শাসন সংবিধানবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ। কাশ্মীর তো যাবেই, একে একে খ্রিস্টানপ্রধান নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়ও যাবে। ইন্ডিয়ান আর্মি হিন্দু আর্মি হয়ে নিজেই খান খান হবে।

এমন সঙ্কট এর আগে দেখা দেয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে ও হিন্দুত্বকে রাষ্ট্রধর্ম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সে দেখিয়ে দিয়েছে তার গায়ে কত জোর। ভোটের জোরেও সে চারটি রাজ্য শাসন করছিল ও লোকসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হয়েছিল। যে হারে তার ভোটের জোর বাড়ছে সে হার অব্যাহত থাকলে সে একদিন লোকসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে। অবশ্য দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে সংবিধান পরিবর্তন অত সহজ হবে না। তবু কালক্রমে সম্ভবপর। সেটাই তার লক্ষ্য।

সে যেদিন তার লক্ষ্য ভেদ করবে সেদিন ছয়-সাতটি রাজ্য বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে। হবেও। বিদ্রোহদমন করার সাধ্য খণ্ডিত সৈন্যদলের থাকবে না। হিন্দুভারত মানেই ক্ষুদ্রতর ভারত বা হিন্দুস্থান। তার সীমান্তরক্ষার ব্যবস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। চীন অরুণাচল প্রদেশ কেড়ে নিতে পারে। ভারতীয় নাগরিকদের হিন্দুরাষ্ট্রের নাগরিক বলে পরিচয় দিতে বললে খ্রিস্টান, পার্সী, শিখরা, আপত্তি করবে। মুসলমানরা তো করবেই। দশ পনেরো কোটি বিক্ষুব্ধ নাগরিককে নিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র

গড়তে গেলে ভারতরাষ্ট্র ধ্বংস হবে। ভারতরাষ্ট্রকে ধ্বংস না করে হিন্দুরাষ্ট্র গড়া অসম্ভব।

হিন্দিতে রাষ্ট্র শব্দটির দুই অর্থ। এক অর্থ স্টেট। অপর অর্থ নেশন। ন্যাশনাল পোগ্রাম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম।

তা হলে হিন্দুরাষ্ট্র বলতে বোঝায় হিন্দু স্টেট তো বটেই, হিন্দু নেশন। হিন্দু নেশনের অ: মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, পার্সী ও বৌদ্ধ হতে পারে না। যেমন তারা হিন্দু সমাজের অঙ্গ হতে পারে না। তা হলে হিন্দু ভিন্ন আর কেউ সরকারি চাকরি পাবে না, সৈন্যদলে ভর্তি হতে পারে না, আপিসে আদালতে বসতে পারবে না, স্কুল কলেজে পড়তে পারবে না। যেমন জার্মানী ইহুদী নাৎসী আমলে।

বিসমার্কের জার্মানী ছিল দেশভিত্তিক নেশন। হিটলারের জার্মানী হলো রেসভিত্তিক নেশন তেমনই, গান্ধী জবাহরলাল সুভাষচন্দ্রের ভারত ছিল দেশভিত্তিক নেশন। ভারতীয় জনত পার্টির বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভারত হবে ধর্মভিত্তিক নেশন। এ গরমিল মূলগত মাঝখানে কোনো যোগসূত্র নেই। অথচ হিন্দু ভোটের আশায় কংগ্রেসকে গোঁজামিল দিতে হচ্ছে। শুধু কংগ্রেসকে কেন, অন্যান্য দলকেও। এর সুযোগ নিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি অপরেও নিতে পারে। কর্তব্য হচ্ছে সাধারণ ভোটারকে তফাৎটা বুঝিয়ে দিয়ে তার সমর্থ: চাওয়া। সে যদি তার দেশকে ভালোবাসে তবে ধর্মকে রাজনীতির থেকে তফাতে রাখবে। আ: যদি ধর্মের খাতিরে দেশকে অবহেলা করে তবে নিজেও মজবে, দেশকেও মজাবে। স্বাধীনতা সংহতি, ঐক্য হারিয়ে যাবে।

নাৎসীদের জার্মানী হলো পরাজিত, বিভক্ত, বিদেশী সৈন্যদের অধিকৃত। রুশ, মার্কিন ইংরেজ, ফরাসী, সেনা এখনো জার্মানী ছাড়েনি। অপরপক্ষে ব্রিটিশ সেনা ভারত ছেড়ে চলে গেছে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে। কিন্তু ভারতের হিন্দুরা যদি নাৎসী মতবাদ অনুসরণ করে, হিন ভারতের পরিণাম অনুরূপ হতে পারে। তেমনই বিভক্ত, বিদেশী সৈন্য অধিকৃত।

আজ আমাদের ধর্ম বিপন্ন নয়, দেশ বিপন্ন। সুতরাং সাধু ও সন্তদের কোনো বিশেষ ভূমিক নেই। নাগরিক হিসাবে তাঁদেরও কর্তব্য দেশের বিপদে আর পাঁচজন নাগরিকের মতো সংঘ: এড়ানোর জন্যে সচেষ্ট হওয়া। নয়তো ভাবীকালের কাছে তাঁদেরও জবাবদিহি করতে হবে অযোধ্যার নাটকে তাঁদের ভূমিকা কি প্রশংসনীয়?

শেষ জীবনে টলসটয়ের আদর্শ ছিল যিশু খ্রিস্ট কথিত কিংডম অভ গড। এই প্রসঙ্গে তাঁ: প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করে প্রথম জীবনে গান্ধীজীরও আদর্শ হলো কিংডম অভ গড। গুজরাটীতে ভাষান্তরিত করে তিনি লিখলেন রামরাজ্য। রাম শব্দটি এক্ষেত্রে ভগবান শব্দটির প্রতিশব্দ অযোধ্যার রাজা রামের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল না। যিশু খ্রিস্ট অযোধ্যার রাজা রামের রাজ কল্পনা করেননি। গান্ধীজীও তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে রামরাজ্যের আদর্শ গ্রহণ করেননি। কিন্তু সাধারণ হিন্দু তুলসীদাসের রামরাজ্যই বোঝে। গান্ধীজীর প্রার্থিত ভগবানের রাজ্য নয়। মুসলমানরা বোঝে গান্ধীজীর অভীষ্ট রামরাজ্যের বকলমে হিন্দুরাজ। তারা প্রতিবাদ করে।

শেষ জীবনে গান্ধীজী রামরাজ্যের বা ভগবানের রাজ্যের কথা আর বলতেন না। বলতেন স্বাধীন ভারতের স্বরূপ হবে সেকুলার স্টেট। আমি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে পড়তুম সেই অসহযোগের আমল থেকে। তাঁর চিন্তার বিবর্তনের ধারা লক্ষ করতুম। শেষের দিকে তিনি বলতেন, সত্যই ভগবান। একজন নাস্তিক যদি সত্যান্বেষণ করে তবে তার অন্বেষণও

ভগবানের অন্বেষণ। তাঁর এক নাস্তিক শিষ্য ছিলেন, তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম ছিল গোরা। গান্ধীজী একদা নাস্তিকদের উপর বিষম বিরূপ ছিলেন। তাদের দলে নিতেন না। শেষ জীবনে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। নাস্তিকও ভালো, যদি সত্যনিষ্ঠ হয়। আস্তিকও ভালো নয়, যদি সত্যভ্রষ্ট হয়।

যখন সেকুলার স্টেটই হয় গান্ধীজীর অভীষ্ট তখন তিনি নাস্তিক গোরাকেও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হবার সমান অধিকারী বিবেচনা করেন। জবাহরলাল ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। তিনিও হন সমান অধিকারী। স্বাধীন ভারতের পত্তন হলো নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, খ্রিস্টান, পার্সী, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অহিন্দুদের নাগরিক অধিকার হিন্দুদের সঙ্গে সমান বলে স্বীকার পূর্বক। ভারতে যদি একজনও মুসলমান থাকত তাহলেও ভারত সেকুলার স্টেট হতো। এটা মুসলমানদের তোষণের জন্যে হয়নি। মুসলমানদের বর্জন করে স্বাধীন ভারত কখনোই মহান হতে পারত না। তাজমহল তো থেকে যেতই মহত্ত্বের ও গর্বের প্রতীক রূপে। মুসলমানও ভারতীয়। তার উত্তরাধিকারও ভারতীয় উত্তরাধিকার। সেকুলার স্টেট ও সেকুলার নেশন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। সাধু-সন্তরা এখনো তুলসীদাসের রামরাজ্যের স্বপ্নেই বিভোর। এর সুযোগ নিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো সাম্প্রদায়িক হিন্দুদল।

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কেউ কোনোদিন প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র দেখেনি। শাসন যদিও ছিল তা আইনের শাসন নয়। রাজার শাসন। আর নির্বাচিত বিধানসভা বা লোকসভা ছিল সম্পূর্ণ অজানা। এসবই মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে আমরা বরণ করে নিয়েছি। তার আগে দেশের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাজন্য শাসিত। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্তটা, রাজস্থানের প্রায় সবটা, হিমাচল প্রদেশের প্রায় সবটা, মধ্যপ্রদেশের ও গুজরাটের প্রায় অর্ধেকটা, কেরল ও কর্ণাটকের অধিকাংশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের একাংশ, ওড়িশা, অসম তথা পাঞ্জাবের একভাগ। প্রজাদের মান্য রামচন্দ্রের মতো পরাক্রান্ত রাজা, যিনি একইকালে ধর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সাধু-সন্তের শিষ্য, প্রজারঞ্জনকারী, তেমন রাজা দুর্লভ হলেও কখনো কখনো কোনো কোনো রাজ্যে দৃষ্টিগোচর।

ব্রিটিশ আমলের সেইসব রাজা আর নেই, কিন্তু সেইসব প্রজারা তাদের বংশধররা এখনো রয়েছে। প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের চেয়ে প্রজাবৎসল রাজা মহারাজা নবাব বাদশারা তাদের কাম্য। সুতরাং শ্রীরামের নামে ভোট পেয়ে তাঁর পাদুকা সামনে রেখে যদি কোনো দল রাজ্য পরিচালনা করবে বলে কথা দেয় তবে তারা সহজেই বিশ্বাস করে। প্রতারণাটা ধরা পড়ার দিন এখনো আসেনি। যেদিন আসবে সেদিন তারা মোহমুক্ত হবে। কিন্তু মাঝখানে ঘটে যাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনা। তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

পুঁথি পড়ে গণতন্ত্র শেখা যায় না। গণতন্ত্র হারিয়েই গণতন্ত্রের মূল্য বোঝা যায়। এ শিক্ষা আমাদের বাকি আছে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে 'সাবধান' বললে কি বাচ্চারা শোনে? হাত দেয়, হাত পোড়ে, তখন আর অমন কর্ম করে না। জাতি হিসাবে আমাদের সে শিক্ষা একদিন হবে। এবিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু একটার পর একটা মাইনরিটি গভর্নমেন্ট প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সামনে দাঁড়াতে পারে না। সেও একদিন বাবরি মসজিদের মতো ধ্বসে পড়বে। পরে লালকেল্লায় যেদিন গৈরিক পতাকা উড়বে সেদিন মিউটিনি বাধবে।

বর্তমান সঙ্কট

এদেশে অসংখ্য মসজিদ আছে। তাদের থেকে একটা মসজিদ ধ্বংস হয়েছে বলে এত হইচই কেন? এর উত্তর, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মস্থান ধ্বংস করা হয় না। হয় ধর্মীয় রাষ্ট্রে। আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কি তা হলে বর্ণচোরা হিন্দুরাষ্ট্র!

ভারত যদি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন থেকে মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর, শিখপ্রধান পাঞ্জাব, খ্রিস্টানপ্রধান মেঘালয়, মিজোরাম তথা নাগাল্যান্ড ও অ্যানিমিস্টপ্রধান অরুণাচল প্রদেশ একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' বলে চিৎকার করে কোনো ফল হবে না। হিন্দুরাষ্ট্রের সীমানা সংকুচিত হবে। সেখানে হিন্দুরাই হবে উত্তম নাগরিক, অন্যেরা মধ্যম কিংবা অধম নাগরিক। প্রাচীনকালে যেমন দ্বিজরা ছিল উত্তম নাগরিক, শূদ্ররা মধ্যম নাগরিক, অন্ত্যজরা অধম নাগরিক।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সমার্থক নয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যদি প্রবল হয় মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ ও অ্যানিমিস্ট কেউ শান্তিতে থাকবে না ও শান্তিতে থাকতে দেবে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদই ওদের শান্তি দিয়েছে ও বিনিময়ে শান্তি পেয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস অশান্তি ডেকে এনেছে। হিন্দুরা যদি অবুঝ হয় সবাই অবুঝ হবে। হিন্দুদের বুঝতে হবে যে ভারতরাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র নয় বলেই এতদিন অভগ্ন রয়েছে। হিন্দুর পক্ষে তথাকথিত হিন্দুত্ব আত্মঘাতী। ধর্মনিরপেক্ষতা বিনা সংহতি নেই। সংহতি বিনা স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতা বিনা সম্মান নেই। হিন্দুই এদেশকে ডোবাতেও পারে, ভাসাতেও পারে। বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলিতে হিন্দুরাও মাইনরিটিতে পরিণত হবে। তখন আবার শরণার্থী সমাগম।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের আঘাত মারাঠারা ভুলে যায়নি ও ক্ষমা করেনি। মুসলমানদের উপর তাদের জাতক্রোধ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লক্ষ্য মহারাষ্ট্রীয়দের জয় ও মুসলমানদের পরাজয়, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় বললে সাড়া মিলবে না। তাই বলে হিন্দুরাষ্ট্র। দেশভাগের পূর্ব থেকেই ওরা সক্রিয়।। ওদের কর্মীরা নিঃস্বার্থ ও সুশৃঙ্খল। ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের।

জনসঙ্ঘ সংগঠিত হয় দেশভাগের পরে। সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুরা প্রায় সকলেই সর্বস্বান্ত হয়ে পাকিস্তান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে। পশ্চিম পাঞ্জাব তথা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকেও অত না হলেও বিস্তর হিন্দু সর্বহারা হয়ে এপারে চলে আসে। প্রধানত এই তিনটি জনগোষ্ঠীর দুর্দশাকে ভিত্তি করে জনসঙ্ঘ সংগঠিত হয়। পাকিস্তান যদি হিন্দু খেদায় এরাও মুসলিম খেদাবে। পাকিস্তান যদি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এরাও হিন্দুরাষ্ট্র পত্তন করবে। পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে এরাও পাকিস্তান আক্রমণ করবে। পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে দেশভাগ রদ করবে। জনসঙ্ঘেরই অভিনব সংস্করণ ভারতীয় জনতা পার্টি। এর সদস্যরা সারা ভারতের হিন্দু। লক্ষ্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিবিধ রাজ্য সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকরা নির্বাচনে বিশ্বাস করে না।

রোজ লাঠি নিয়ে ড্রিল করে। বন্দুক পেলে বন্দুক নিয়ে ড্রিল করত। তাদের বিশ্বাস গায়ের জোরে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিশ্বাস ভোটের জোরে। দুই দলের নেতৃত্ব এক নয়। তবে পরস্পরনির্ভর।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের দ্বারা অতীতে যেসব মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে বলে লোকের বিশ্বাস সেসব মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে সেসব মসজিদ ধ্বংস করা। লোকের বিশ্বাসটাই অভ্রান্ত। ইতিহাস অবান্তর। আদালতের রায় অগ্রাহ্য। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গায়ের জোরে বিশ্বাস করে। তার সহায়ক বজরঙ্গ দল। হনুমানকে বলা হয় বজ্রাঙ্গ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের সঙ্গে এদের মিতালি। ভারতীয় জনতা পার্টির দ্বারা গঠিত সরকার এদের সঙ্গে জড়িত। তবে একথা বোধ হয় ঠিক নয় যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় সেদিন সরকারের ইচ্ছায়। কিংবা সঙ্ঘের ইচ্ছায়। কাজটা সম্ভবত শিবসেনার।

ভারতের ইতিহাসে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর একটি যুগান্তকারী দিন। কারণ সেদিন তৃতীয় পানিপথের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া হলো। সেদিন যা দেখা গেল তা শিবতাণ্ডব। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পাঁচ শতকের মসজিদ ধ্বংস শিবভক্ত ছাড়া আর কার সাধ্য? তবে এটা আমার অনুমান। রামভক্ত হনুমানরা এতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তারা যেটা একদিন না একদিন করত সেটা শিবভক্ত নন্দী-ভৃঙ্গীরা করে রেখেছে।

এটাও একপ্রকার বর্গীর হাঙ্গামা। এর থেকে দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা। তার জের কতদূর গড়াবে কে জানে? বিতর্কিত জায়গায় মন্দির বানাতে গেলে আরো এক দফা। একই জায়গায় মসজিদ বানাতে গেলে আরো এক দফা।

সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সামনের পাঁচ দশ বছর কিছুই না বানানো। বিতর্কিত এলাকা ফেলে রাখা। ততদিনে হয়তো একটা আপসের সূত্র উভয়পক্ষের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকবে। আমার মতে তেমন একটি সূত্র বিতর্কিত স্থানে মিউজিয়াম নির্মাণ। তাতে উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির নিদর্শন একত্র করা হবে। দর্শকরা দেখবে তাদের যৌথ সম্পদ। তাদের মিশ্র উত্তরাধিকার।

সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে সাধারণ নির্বাচনের সময় একএকটা কেন্দ্রে পাঁচ-সাতটা করে প্রার্থী খাড়া করা। তার ফলে ভারতীয় জনতা পার্টিরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও সরকার গঠন। কেবল কয়েকটি রাজ্যে নয়, কেন্দ্রেও।

হিন্দু জাতীয়তাবাদের সেই দিগ্বিজয় ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে ভাঙন ধরাবে। তা ছাড়া থাকবে যত্র-তত্র দাঙ্গাহাঙ্গামা। একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রত্যাবর্তন করেছি।

সম্প্রদায়ের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে মুসলিম লীগ পাকিস্তান হাসিল করেছিল। সম্প্রদায়ের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়তো হিন্দুরাষ্ট্র আদায় করবে। তার পরে হয়তো পাকিস্তানীদের মতো হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা ভাষার প্রশ্নে ভাগ হয়ে যাবে। দেশকে যারা সম্প্রদায়ের চেয়ে ভালোবাসে না তাদের সংখ্যা আজকাল বেড়ে চলেছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে। সাধু-সন্তরাও দেশের ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন। হে রাম!

ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতিতে নামলে কেমন সফল হওয়া যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মুসলিম লীগ। কিন্তু তার জন্যে মোল্লাদের সাহায্য নিতে হয়। মোল্লারা চায় ক্ষমতার অংশ। মোল্লার

দৌড় কেবল মসজিদ অবধি নয়, মসনদ অবধি। পাকিস্তান এখন মোল্লাদের দাপটে নাজেহাল।

ভারতীয় জনতা পার্টি মুসলিম লীগের পন্থা অনুসরণ করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু সাধুদের সাহায্য নিয়ে যতই উচ্চে উঠবে ততই সাধুদের পাল্লায় পড়বে। সাধুদের দৌড় কেবল মন্দিরের সিংহদ্বার অবধি নয়, রাজ্যের সিংহাসন অবধি। ইতিমধ্যেই কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী পার্লামেন্টের মেম্বর হয়েছেন। যথাকালে সংবিধান পরিবর্তন পূর্বক মনুসংহিতার পুনঃপ্রবর্তন তাঁদের লক্ষ্য। মুসলমানদের উপর এক হাত নেবার পর তাঁদের কোপ পড়বে উদার হিন্দুদের উপর। উদার হিন্দুদের পরে আসবে বামমার্গী হিন্দুদের পালা। ত্রিশের দশকের জার্মানীতে যেমন সোসিয়াল ডেমোক্রাটদের পর কমিউনিস্টদের পালা।

ভারতের ইতিহাসে এটা একটা সন্ধিক্ষণ। যেমন সন্ধিক্ষণ ছিল বিগত সাতচল্লিশ সাল। ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। বাবরি মসজিদ তার নিমিত্তমাত্র। সমস্যাটা হিন্দু বনাম মুসলিম নয়। যদিও দেখতে সেইরকম। সমস্যাটা ধর্মীয় রাজনীতি বনাম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। সাধারণ লোক বিভ্রান্ত। বুদ্ধিজীবী বলে যাঁরা বিদিত তাঁদের মধ্যেও বিভ্রান্তি। বাবরি মসজিদের বিনাশে তাঁদের একাংশ। এই যে বিভ্রম এটা দিগ্‌ভ্রম। প্রগতির দিকে যাত্রা নয়, পশ্চাদগতির দিকে যাত্রা। যেমন ঘটেছিল জার্মান বুদ্ধিজীবীদের বেলা। কাইজারের কবল থেকে মুক্ত হবার প্রায় পনেরো বছর বাদে জার্মানরা পড়ল হিটলারের কবলে। সংবিধান তো রদবদল হলোই, বারো বছর কোনো নির্বাচনই হলো না। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হবার পঁয়তাল্লিশ বছর পরে ভারত মৌলবাদের হাতে পড়তে পারে। সেটা বোধ হয় অস্পষ্ট নয়।

ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থান হবে অনেকটা জার্মান ইহুদীদের মতো। ন যযৌ ন তস্থৌ। কোথায়ই বা যাবে। থাকবেই বা কাদের ভরসায়।

ইতিহাসকে যারা ভুলে যায় ইতিহাস তাদের জন্যে আপনার পুনরাবৃত্তি করে। আজ আমরা গত চল্লিশ দশকের পুনরাবৃত্তির সম্মুখীন। আবার সেই হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত ও দ্বিভাজনের আশঙ্কা।

ব্রিটিশ রাজ হিন্দুরাজ বা মুসলিম রাজের হাতে সমগ্র ভারত সঁপে দিয়ে যান না। ভাগ করে দিয়ে যান দুটি রাজনৈতিক দলের হাতে । মুসলিম লীগ তার ভাগের নাম রাখে পাকিস্তান। জিন্নাসাহেব বলেন, "এখন থেকে কেউ মুসলিম নয়, কেউ হিন্দু নয়, সকলেই পাকিস্তানী। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যে যার ধর্ম পালন করতে পারে।" তিনি পাকিস্তানের পতাকার দুই-তৃতীয়াংশ রাখেন সবুজ, বাকি এক-তৃতীয়াংশ সাদা। এটার মর্ম পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ নাগরিক হিন্দু শিখ। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মুসলিম। তিনি স্বয়ং ছিলেন সেকুলারমনস্ক। কিন্তু তাঁর নীতি তাঁর উত্তরসূরিরা অনুসরণ করেন না। পাকিস্তান হয় কেবল মুসলমানদের রাষ্ট্র। পরে ইসলামিক রাষ্ট্র। শরিয়ত সেখানকার মূল আইন।

অপরপক্ষে কংগ্রেস নেতারা হিন্দুস্থানের পরিবর্তে ইন্ডিয়া নামটাই বহাল রাখেন। ইন্ডিয়ান আর্মি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলের আর্মি, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রাষ্ট্র। অন্য কথায় ধর্মনিরপেক্ষ তথা ঈশ্বর-বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইংরেজীতে যাকে বলে সেকুলার স্টেট। ভারতের পতাকা কেবল হিন্দুসূচক গৈরিক নয়। গৈরিকের সঙ্গে সবুজ শ্বেত। একে সকলেই স্যালিউট করতে সম্মত হয়। এর জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' শুনতে সকলে উঠে দাঁড়ায়। সংবিধান এমনভাবে রচিত হয় যাতে সকলেই পায় সমান নাগরিক

অধিকার ও সমান মর্যাদা। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সেকুলার ছিল। প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী হিন্দু। লোক মনে করে খ্রিস্টান। সেটা ঠিক নয়। পরবর্তীকাল তাঁর স্ত্রী খ্রিস্টান হন, কনিষ্ঠা কন্যাও খ্রিস্টান।

এখন সাতচল্লিশ সালের মতো সন্ধিক্ষণ এসেছে। কংগ্রেসের বিরোধীদল ভারতীয় জনতা পার্টি ফিরে যেতে চাইছে মুসলিমপূর্ব ভারতে, যখন হিন্দুরা ছিল স্বাধীন। সেটা হিন্দুরাষ্ট্রের পুনর্জীবন বা রিভাইভাল। রিভাইভালিজম ও ফান্ডামেন্টালিজম এক নয়। সোজা কথায় সে চায় মুসলমানদের নির্বাসন। খ্রিস্টানদের হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন। শিখদের বেদ ব্রাহ্মণ ও দেবদেবী এবং অবতারবাদে আনুগত্য স্বীকার। সে কেন্দ্রে সরকার গঠন করলে ইন্ডিয়ান আর্মিতে ভাঙন অনিবার্য। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। হিন্দু ভারত কোনোদিনই এক ও অবিভাজ্য ছিল না। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও আকবর ভারতকে অনেকটা একচ্ছত্রাধীন করলেও বহু রাজ্য তাঁদের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। তামিল ও মালয়ালিরা কোনো কালেই উত্তরভারতের অধীনে আসেনি। ব্রিটিশ আমলেই তারা তাদের স্বাধীনতা হারায়।

আমরা এখন ইতিহাস ছেড়ে পুরাণের আশ্রয় নিচ্ছি। মিথোলজিকে হিস্ট্রি ভেবে রামজন্মভূমির জন্যে লড়ছি। প্রায় দুই শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষার পরেও আমাদের মানসিকতার কোনো গভীর পরিবর্তন হয়নি। এই যদি হয় শিক্ষিত শ্রেণীর মনের কথা তবে হিন্দুরাষ্ট্রই ভারতীয় ইউনিয়নকে ধ্বংস করবে। বাবরি মসজিদের ধ্বংস তার প্রতীক। ভারতীয় ইউনিয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সেকুলার স্টেট গেলে ভারতীয় ইউনিয়নও যাবে। তার শূন্যতা পূরণ করবে পাঞ্জাবের শিখ রাষ্ট্র, কাশ্মীরের মুসলিম রাষ্ট্র, নাগা মিজো গারো খাসিদের খ্রিস্টান রাষ্ট্র। অরুণাচল প্রদেশে যারা বাস করে তারা বৌদ্ধ আর অ্যানিমিস্ট। ভারতীয় ইউনিয়নে এদের আপত্তি নেই, কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রে অসম্মতি।

দাঙ্গাহাঙ্গামা এখনো থামেনি। বোম্বাই, আহমেদাবাদ ইত্যাদি এখনো অশান্ত। কিন্তু আবার যদি দু'লাখ করসেবক গিয়ে অযোধ্যায় মসজিদের খালি জায়গায় মন্দির বানাতে শুরু করে, পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, সৈন্যদলকে যদি গুলী চালাতে না দেওয়া হয় তবে মুসলমানের ক্ষোভ আবার ফেটে পড়বে। আবার দাঙ্গাহাঙ্গামায় দেশ বিধ্বস্ত হবে। মন্দির তৈরি হোক, কিন্তু ওই জায়গায় নয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে একথা বোঝায় কে? ভারতীয় জনতা পার্টির হাতের তাস হচ্ছে ওই স্থানে মন্দির নির্মাণ। সে কি তার হাতের তাস হাতছাড়া করবে।

দেশ হয়ে গেছে গৌণ। ধর্ম হয়েছে মুখ্য। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেছে সাতচল্লিশ সালে। দ্বিজাতিতত্ত্বের কথাই শোনা যাচ্ছে এবার হিন্দুত্ববাদী শিক্ষিত জনের মুখেও। অন্ধ মুসলিমবিদ্বেষ এঁদের শ্রেয়বুদ্ধি ধ্বংস করেছে। তা বলে হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। জনগণকে সুপথে চালিত করতে হবে।

প্রসঙ্গ : বাবরি মসজিদ

আড়াই বছর আগে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম। তাতে বলা হয়েছিল যে সেকালের কালাপাহাড়ীদের মতো একালে একদল ধলাপাহাড়ী দেখা দিয়েছে। এরা বাবরি মসজিদ ভাঙতে বদ্ধপরিকর। পুলিসও রামভক্ত, সামরিক বাহিনীও রামভক্ত, রামের মন্দির গড়ার নাম করে বাবরের মসজিদ ভাঙতে গেলে কেউ বাধা দেবে না, মসজিদ লোপাট হবে। তার পর ঘটবে তার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় ও অন্যত্র মন্দির ভঙ্গ, হিন্দুরা হারাবে তাদের আরো প্রাচীন উত্তরাধিকার।

আমি চমকে উঠলেও অবাক হইনি। যা ভেবেছিলুম তাই হয়েছে। হিন্দুর সর্বনাশ মুসলমানের সর্বনাশের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়েছে। লোকে জানুক যে একের সর্বনাশে অপরের সর্বনাশ। হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে অন্তত এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে তাদের গর্ব করার মতো প্রাচীন কীর্তি রয়েছে। এখন সে গর্ব বাবরি মসজিদের মতোই ধূলিসাৎ। কেউ কি দয়া করে সেসব মন্দির আবার গড়ে দেবে?

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম একটি মসজিদ হিন্দুদের হাতে ধ্বংস হলো। শিবাজীর সেনা যা করেনি শিবসেনা তা করেছে। এবং তার সঙ্গে বজরঙ্গ দল প্রভৃতি আরো কয়েকটি দল। এটা হিন্দু ঐতিহ্য নয়। হিন্দুরা মন্দির মসজিদ গির্জা প্রভৃতি ধর্মস্থানকে সমান শ্রদ্ধা করে। সর্বত্র ভগবানের আরাধনা। হিন্দু সমাজ থেকে এদের নিন্দা করা উচিত। এদেরও উচিত আন্তরিক অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা। কিন্তু কোনোটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বহু হিন্দু গর্বিত, বহু হিন্দু উৎফুল্ল। যেমনটি দেখা গেছল মহাত্মা গান্ধীর নিধনের সময়। নাথুরাম গোডসে কী জয়।

এই নির্বোধরা যে ক্ষতি করে গেল তা ইতিহাসে লিখিত হবে। আশা করি দেশ এই সর্বনাশা মনোবৃত্তি কাটিয়ে উঠবে। মথুরার ইদগা ও কাশীর মসজিদ সুরক্ষিত থাকবে। মসজিদটির পুনর্গঠন নির্ভর করবে হিন্দুদের অন্তঃপরিবর্তনের উপর।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট জমানা

কমিউনিস্ট পার্টির শাসনকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে ওঠে আমেরিকার সমকক্ষ এক সুপারপাওয়ার। কিন্তু সেটা কেবল সামরিকতার বিচারেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সে আমেরিকার চেয়ে খাটো তো বটেই, জাপানের চেয়ে ও জার্মানীর চেয়ে, ব্রিটেনের চেয়েও খাটো। সেখানকার শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের মান পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশের তুলনায় নিচু।

কমিউনিস্ট দলপতি গর্বাচভ বুঝতে পারেন যে অর্থনৈতিক সংস্কার না করলে নয়। কিন্তু রিফর্ম করতে গেলে শুধুমাত্র ইকনমিক রিফর্ম নয়,. পলিটিকাল রিফর্ম করণীয়। পলিটিকাল রিফর্মে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহযোগীরাও রাজী হন না। তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখে আবার এক বিপ্লবের আয়োজন করা হয়। সে আয়োজন ব্যর্থ হয় বোরিস ইয়েলৎসিনের হস্তক্ষেপে। জনগণ ইয়েলৎসিনের পক্ষে। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। গর্বাচভ ক্ষমতাচ্যুত হন। ইয়েলৎসিন একই সঙ্গে পলিটিকাল তথা ইকনমিক রিফর্মে ব্রতী হন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। প্রায় প্রত্যেকটি খণ্ডে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী প্রজাতন্ত্র তথা গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ইয়েলৎসিন সে রাষ্ট্রে বাজার অর্থনীতি ডেকে আনেন। এতে মানুষের অভাব অনটন বেড়ে যায় না কমে যায় তা বোঝা যাবে আরো দু'তিন বছর বাদে। ইয়েলৎসিন সময় চাইছেন। আপাতত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে কেউ নেই। তিনি আপাতত দল নিরপেক্ষ।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলেও কমিউনিস্টরা বেঁচে আছেন। সাধারণ নির্বাচনের লগ্ন উপস্থিত হলে তাঁরা পার্টির নাম বদল করে আসরে নামবেন। কিন্তু লোকে যদি বাজার অর্থনীতি পছন্দ করে তবে তাঁরা জিতবেন কি না সন্দেহ। জিতলেও অন্যান্য দলগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, সংবিধান মেনে নিয়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে, হেরে গেলে গদী ছেড়ে দিতে হবে।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক হবে। এটাই আদর্শ। আর জাতীয়তাবাদ হবে উভয়ের ভিত্তি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদিও ছিল ইউনাইটেড নেশনের অঙ্গ তবু সেটি একটি নেশন ছিল না। এখন রাশিয়া একটি নেশন, উক্রেন একটি নেশন, জর্জিয়া একটি নেশন, আর্মেনিয়া একটি নেশন, এমনতরো আরো কয়েকটি নেশন। এদের সবাইকে নিয়ে একটি কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে বা হতে চলেছে। এটি আমার বিবেচনায় একটি সঠিক পদক্ষেপ। পররাষ্ট্রনীতি মোটের উপর একই রকম থাকবে। দেশরক্ষার ব্যবস্থাও পরস্পরবিরুদ্ধ হবে না। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন্ দল কোন্ রাষ্ট্র প্রবল হবে তা কেউ বলতে পারে না। একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের দিন গেছে। ওদিকে গড়ে উঠছে ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি। ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রভৃতি বনেদী রাষ্ট্রকেও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপেও সেইরূপ একটি ইকনমিক কমিউনিটি গড়ে তোলা দরকার।

পুনশ্চ

অর্থনৈতিক সংস্কার না করলে নয় আর রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা না থাকলে অর্থনৈতিক সংস্কার অসম্ভব। এটাই হলো রাষ্ট্রপতি ইয়েলৎসিনের একান্ত বিশ্বাস। অপরপক্ষে লোকপ্রতিনিধিদের কংগ্রেসের মতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে রুশদেশের পার্লামেন্টের। যেমন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের। রাষ্ট্রপতি হবেন ব্রিটেনের রানীর মতো ক্ষমতাহীন নামমাত্র মালিক। এই নিয়ে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার পরিণাম কী হবে তা বলা শক্ত। ইয়েলৎসিন যতবার আপসের প্রস্তাব পেশ করেছেন পার্লামেন্ট তা ততবার খারিজ করেছে।

ইয়েলৎসিন কি গণভোটের উপর সমাধানের ভার ছেড়ে দেবেন? জনগণ কি বলবে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে? পার্লামেন্টও তো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। তবে বহুদিন পূর্বে নির্বাচিত। আবার নির্বাচন হলে কি নির্বাচন প্রতিনিধিদের মত অন্যরূপ হবে।

এসব প্রশ্নের উত্তর শান্তিপূর্ণভাবে দেওয়া দরকার। পুলিস বা আর্মিকে ডাকা উচিত নয়। নাগরিক কর্তারা নাকি বলেছেন তাঁরা নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে দেশের অবস্থার উপর। ভোটাভুটি করতে গিয়ে যদি মারামারি বেধে যায় তবে সামরিক কর্তারা নীরব দর্শক হবেন না। ক্ষমতা শেষপর্যন্ত তাঁদের হাতেই যেতে পারে। তখন অর্থনৈতিক সংস্কার কে করবে। সেটা তাঁদের কারো করণীয় নয়। মানুষ চোরা কারবারিদের পাল্লায় পড়বে।

ইয়েলৎসিন নিতান্ত একজন ব্যক্তিবিশেষ। তাঁর পেছনে কোনো রাজনৈতিক দল নেই। অপরপক্ষে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই প্রাক্তন কমিউনিস্ট দলভুক্ত। তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রভাব কি খর্ব হয়েছে? তা যদি না হয়ে থাকে তবে জনগণ তাঁদের পক্ষে রায় দিতে পারে। তা যদি হয় তবে ইয়েলৎসিনের জমানা শেষ। সেটা এড়াতে গেলে তাঁকেও একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। সেটা কি তিনি করবেন? করতে চাইলে পারবেন? কে জানে! আমরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কী! তবে এটা নিশ্চিত যে অর্থনৈতিক সংস্কার ভিন্ন গতি নেই। ক্ষমতার আসনে বসলে কমিউনিস্টদেরও সে কাজ করতে হবে। চীনদেশের কমিউনিস্টরা সে রকম কাজই করছেন। তত্ত্ব যদি মানুষকে পথ্য না দিতে পারে তবে তত্ত্ব নিয়ে মানুষ কী করবে?

নারায়ণ চৌধুরী

কে একজন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন নারায়ণ চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে পি জি হাসপাতালে যেতে হবে। এবং অবিলম্বে।

আমি তার পরের দিন সন্ধ্যায় পি জিতে যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি নারায়ণবাবু আচ্ছন্ন। না পারলেন আমাকে চিনতে, না আমার কথা শুনতে। তাঁর বিছানার উপর তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। আশেপাশে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ। তাঁর এক জামাতা। সকলের মুখে চোখে উদ্বেগ। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমিও হাল ছেড়ে দিইনে। নারায়ণবাবুর মুখে মৃত্যুর ছায়া ছিল না। মনে হলো তিনি নিদ্রিত। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারলুম না। সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে চলে এলুম। নারায়ণবাবুকে তা জানাতে পারিনে। মনে মনে প্রার্থনা করি তিনি যেন সেরে ওঠেন।

পরের দিন জানতে পারি তিনি চলে গেছেন। সেই দেখাই শেষ দেখা। তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। তাঁর বয়স যে আশির কাছাকাছি তা আমার জানা ছিল না। জানা থাকলে বাংলা আকাদেমির তরফ থেকে তাঁর একটি ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করার চেষ্টা করতুম।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চল্লিশ বছর আগে শুরু। গত কয়েক বছর ধরে তিনি অসুস্থ। চিঠিপত্র তাই বন্ধ হয়ে যায়। মোটের উপর তাঁকে আমি যত চিঠি লিখেছি তত বার কোনো সাহিত্যিককে নয়। তেমনি তাঁর কাছ থেকে যত চিঠি পেয়েছি তত আর কোনো সাহিত্যিকের কাছ থেকে নয়। বিনিময়ের বিষয় ছিল সাহিত্য তো বটেই, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, জীবনদর্শন প্রভৃতি। মতের মিলের চেয়ে মতের অমিলই বেশি। কী করা যায়। তিনি তিনি, আমি আমি। দু'জনের মতামত একই রকম হবে এমন কী কথা আছে? যাতে মনোমালিন্য না হয় তার জন্যে আমি সতর্ক ছিলুম। স্বার্থের বিরোধ তো ছিল না। প্রতিযোগিতাও না।

তাঁর সঙ্গে পত্রালাপের সূচনা তাঁর বিশ্বভারতীর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর। তাঁকে আমি ১৯৫৩ সালের ২৫শে তারিখে লিখি, "আপনি আপনার নিজের সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা পড়ে আপনার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেও দুনিয়ার ঝড়ঝাপটার কথা ভেবে আপনার জন্যে উৎকণ্ঠা বোধ করেছিলুম। বিয়ে করেছেন, ছেলেমেয়ে হয়েছে শুনেছি। পারিবারিক প্রয়োজন যখন আরো তীব্র হবে তখন আপনি শুধু সাহিত্যের উপার্জনে সংসার চালাতে পারবেন কি!"

বছরখানেক বাদে ১৯৫৪ সালের ৬ই এপ্রিল আমি তাঁকে লিখি, "আপনাকে যা লিখেছিলুম তার মানে এই যে আপনাকে না দেখে আমার মনে হয়েছে আপনার কর্মনিষ্ঠা তত প্রবল নয়। আপনাকে দেখে আমার মনে হলো আপনি এইবার এমন একটা কর্মপন্থা পেয়েছেন যা দিন আনা দিন খাওয়া নয়, যাতে অন্তর তৃপ্ত হয়, যাতে কর্মের সঙ্গে বিশ্বাস যোগ দেয়। বহু কর্মী পুরুষ সরকারি চাকরি করে অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছেন, ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছেন। তাঁদের কর্মশক্তি প্রচুর, কিন্তু যা করেছেন তা বিশেষ অল্প। রুটিন বাঁচিয়ে গেলে জীবিকা হয়, কিন্তু জীবনের ফাঁক ভরে না।"

সেইবছরই ২২শে মে তারিখে আমি লিখি, "আপনার জীবনে যে অনিশ্চয়তা এসেছে এটা আসবে জেনে আপনাকে আমি প্রথম থেকেই চাকরি না ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলুম। তখন যদি আমার পরামর্শ শুনতেন তা হলে আজকের দিনে এ সমস্যা উঠত না। বাংলাদেশের সাহিত্যের বাজার এমন নয় যে শুধুমাত্র প্রবন্ধ লিখে কেউ (তিনি যত বড় প্রতিভাবান হোন না কেন) সংসার চালাবার মতো আয় করতে পারেন। বাংলাদেশ কেন, কোনো দেশেই সাহিত্যের বাজার এমন নয়।...দেশ বিদেশের অবস্থা যখন এই তখন চাকরি করবই না এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ আপনার সাজে না। বাস্তবকে মেনে নিয়েই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার কৌশল শিখতে হবে। বাস্তবকে উপেক্ষা করে নয়।"

এর পরে সেই বছরের ১লা জুন তারিখে লিখি, "আপনার কাছে আমার বক্তব্য এই যে, আত্মসম্মান ও আত্মাভিমান দুই এক জিনিস নয়। আত্মসম্মান সর্বদা সব অবস্থায় রক্ষা করবেন। কিন্তু আত্মাভিমান ত্যাগ করাই ভাল। কেউ আপনাকে ছোট মনে করলে বা ছোট বললে অমনি আপনি ছোট হয়ে গেলেন না।...আত্মাভিমানী ব্যক্তিরা সাধারণত নিজের দোষেই দুঃখ পায় অথচ দুনিয়াকে তার জন্যে দায়ী করে।...'আমার মাথা নত করে দাও হে' প্রার্থনা হিসাবে ব্যবহার করবেন। আপনার চরিত্রের পরিণতির জন্যে ঐ প্রার্থনা আবশ্যক।...আপনি রবীন্দ্রনাথের উপর অভিমান করে বিশ্বভারতী ছেড়েছিলেন। এখনো সেই অভিমান কর্মপ্রাপ্তির অন্তরায়। এটা আত্মসম্মানের পরিচায়ক নয়, আত্মাভিমানের নিদর্শন।...এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে জনা-সাত আট লেখক আছেন। এঁদের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ বা বিশ্বভারতী হস্তক্ষেপ করছেন না। কিন্তু যদি কেউ গায়ে পড়ে রবি-নিন্দা করেন সেকথা অন্য। কিন্তু রবি-কীর্তন করতে কেউ বলেও না, কেউ করেও না। যদি কেউ করে সে নিজের আনন্দে করে।"

এর পরের চিঠির তারিখ ৫ই জুলাই ১৯৫৪। তাতে লিখি, "তিক্ত অভিজ্ঞতা আপনাকে যদি আবার পিছনের বন্দরে ফিরতে না দেয় তা হলে আপসোস করার কিছু নেই। সামনেই ভেসে চলুন, ভাসতে ভাসতে নতুন কোন বন্দরে ভিড়বেন। আত্মবিশ্বাস যতদিন দৃঢ় আছে ততদিন আপনার সবই আছে। একদিন এই বিশ্বাস পরমাত্মবিশ্বাসে পরিণত হবে। তখন সবই হবে।"

নারায়ণবাবুর সবই হয়েছিল। অসংখ্য প্রবন্ধ, বিস্তর গ্রন্থ, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, সর্বত্র সম্মান, পারিবারিক পরিপূর্ণতা, সাংসারিক স্বচ্ছলতা, সুদীর্ঘ পরমায়ু। তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক স্মরণে

কার যে কখন ডাক আসেন তা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না। আমার প্রিয় বন্ধু রমেন্দ্রনাথ মল্লিকও জানতেন না। সারাদিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করেন, রাতে যখন শুতে যান তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। সহসা রাতের মাঝখানে অস্বস্তি বোধ করেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দীপনির্বাণ।

এমন মৃত্যু ভাগ্যবানদেরই হয়। তবে আত্মীয় বান্ধবদের কাছে দুর্ভাগ্য। বিশেষত সহধর্মিণী হেমপ্রভার কাছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। তাঁকে আমার গভীর সমবেদনা। আমিও তো একজন প্রিয় বান্ধবকে হারালুম। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি ও হেমপ্রভা আমার জন্মদিনে দেখা করতে এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন। পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে তাঁদের ওখানে আমার যোগ দেবার কথা। তা নিয়ে কথাবার্তা পাকা হলো। 'সাহিত্যতীর্থ' ছিল তাঁর প্রাণস্বরূপ। তিনিও সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। আমাকে তিনি তীর্থপতি মনোনয়ন করেছিলেন। প্রতিবারই অনুষ্ঠানের পূর্বে পরামর্শ করে কর্মসূচী নির্ধারণ করতেন।

আমার সহধর্মিণী লীলা রায় আমাকে লুকিয়ে বাংলা কবিতা লিখতেন। একদিন সেটি তিনি প্রকাশের জন্যে রমেনবাবুকে পাঠান। উৎসর্গ করেন হেমপ্রভা দেবীকে। সেটি অতি যত্ন সহকারে প্রকাশিত হয় রমেনবাবুর লেখা পরিচিতি সমেত। কিন্তু লীলা রায় ততদিনে প্রয়াত। রমেনবাবু আমাকে একটার পর একটা বান্ডিল দিয়ে যান বিতরণের জন্যে। যখনি ফুরিয়ে যায় তখনি তাঁর কাছে আরো কপি চাই। আমার জন্মদিনের সন্ধ্যায় তিনি আরো একটি বান্ডিল দিয়ে যান। বলা বাহুল্য এটি তাঁর ভালোবাসার কাজ। লোকসান দিয়েই তিনি লীলা রায়ের অনুরোধ রক্ষা করেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

মিষ্টভাষী, সদালাপী, সুসংযত, সুভদ্র এই মানুষটিকে হারিয়ে তাঁর শত শত গুণগ্রাহী শোকাকুল। তিনি একজন সাধক ছিলেন। সাধনোচিত ধামেই প্রয়াণ করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

সাহিত্যতীর্থকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেটিই তাঁর স্মৃতিচিহ্ন। এ কাজ অগ্রণী হতে হবে হেমপ্রভা দেবীকেই। আমরা থাকব তাঁর সঙ্গে। যদু মল্লিক ভবন হোক সাহিত্যের তীর্থ। সেখানে মিলিত হবেন বছরে একবার কি দু'বার পুরাতন ও নতুন সাহিত্য তীর্থগামীজন। দর্শন করবেন রমেনবাবুর সৌম্য সুন্দর প্রতিকৃতি। তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবে। পুস্তক প্রকাশ না হয় নাই হলো। হেমপ্রভা দেবীকে তেমন কোনও দায় বহন করতে হবে না। তবে পাঁচজনে যদি সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, সেটাও করণীয়।

আমরা যাঁকে হারালাম তাঁকে ফিরে পাব না। তাঁকে মনে রাখব ও তাঁর প্রিয় কাজ সম্পাদন করব। কেউ এখানে চিরকাল থাকতে আসে না। সবাই যে যার কাজ শেষ করে চলে যায়। রমেনবাবুও একদিন যেতেন। কাজ শেষ করে যেতে পারলেন না, এই যা দুর্ভাগ্য।

প্রসঙ্গ : বিচ্ছিন্নতা

সোভিয়েট ইউনিয়ন কি রুশ সাম্রাজ্যের কমিউনিস্ট নামান্তর? কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন না ধরলে সোভিয়েট ইউনিয়ন খাড়া থাকত। ভাঙনের একাধিক কারণ থাকলেও সবচেয়ে বড়ো কারণটা হলো রুশ জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মানদের মতো রুশরাও একটি জাতি। তাই যদি হয় তবে উক্রেনের অধিবাসীরাও একটি জাতি। একবার উক্রেন থেকে শান্তিনিকেতনে কয়েকজন সাহিত্যিক এসেছিলেন। তাঁদের দলের একজন মহিলা আমাকে তাঁর লেখা একটি বই দিয়ে যান। লন্ডনে একজন জর্জিয়ানের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। জর্জিয়ানরাও একটা জাতি। জর্জিয়া রাশিয়ার চেয়ে কম প্রাচীন নয়। আর্মেনিয়া তো প্রাচীনতর।

এমন একটা জাতিগোষ্ঠী চিরদিন এক নেশন হতে পারে না। একটি আন্তর্জাতিক মতবাদ তাদের এক নেশন করেছিল। তার চেয়ে আরো প্রবল মতবাদ খ্রিস্টধর্ম। সেও কি পারল ইউরোপের খ্রিস্টানজনকে একচ্ছত্রাধীন করে রাখতে। দেখা গেল দেশ বা রেস বা ভাষা একদিন আরো প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট যদিও একই ধর্মের দুই শাখা তবু ভেদবুদ্ধি নেদারল্যান্ডসকে দু'ভাগ করে দেয়। হল্যান্ড প্রটেস্টান্ট, বেলজিয়াম ক্যাথলিক। কিছুদিন থেকে বেলজিয়ামে ভাষাঘটিত ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়েছে। একটি গোষ্ঠীর ভাষা ফ্লেমিশ, আরেকটির ফরাসী। দেশটাকে ওরা দু'টুকরো করতে চায়। কিন্তু বাদ সাধছে রাজধানী ব্রাসেলস। সেটা কাদের ভাগে পড়বে? শহরটাতে ফরাসীভাষীদের আধিক্য, কিন্তু তার চারদিকে ফ্লেমিশ ভাষীরা সংখ্যাগুরু। এই সেদিন বেলজিয়ামের রাজা মারা গেলেন। তিনি যাঁকে বিয়ে করেছিলেন সেই মহিলা রাজকন্যা ছিলেন না। সুতরাং তাঁর পুত্র উত্তরাধিকারী হতে পারত না। রাজা নিঃসন্তান। তাই তাঁর এক ভ্রাতা হলেন উত্তরাধিকারী। কেব্‌ল টিভিতে দেখলুম এক বেলজিয়াম ভদ্রলোক বিলাপ করছেন রাজার জন্যে নয়, রাজ্যের জন্যে। তাঁর আশঙ্কা দেশ দু'ভাগ হয়ে যাবে। যিনি ঠেকাতে পারতেন তিনি আর নেই। বংশ লোপ পেয়ে গেছে।

ভবিষ্যতে অনুরূপ দশা হতে পারে স্পেনের। স্পেনও বহুভাষিক ও বহুজাতিক। রাজতন্ত্রটি তাকে অবিভাজ্য রেখেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের যুগোস্লাভিয়া নামক রাষ্ট্র যখন গঠিত হয় তখন ঐক্য দিয়েছিলেন এক রাজা। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন ঐক্য দেয় কমিউনিস্ট পার্টির ডিকটেটরশিপ। টিটোর পর থেকে চলেছে ভাষায় ভাষায়, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্রোয়েশিয়ায় ধর্ম রোমান ক্যাথলিক, লিপি রোমান। আর সার্বিয়ার ধর্ম গ্রীক অর্থোডকস, লিপি সিরিলক। উভয়েরই ভাষা সার্বো-ক্রোয়াট। তাদের মত বসনিয়া হার্জিগোভিনাও স্লাভ জাতির বাসভূমি। কিন্তু সেখানে সার্ব ও ক্রোয়াট ছাড়া আরো একটি গোষ্ঠী আছে, তারা ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত। তারা মুসলিম। তুরস্কের অধীনে বাস করার সময় তাদের পূর্বপুরুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ও তুর্কদের সঙ্গে শাদী করেছিল। এখন তাদের

সংখ্যানুপাত শতকরা চুয়াল্লিশ আর প্রেসিডেন্ট একজন মুসলিম। বলা বাহুল্য এদের তিন গোষ্ঠীকে জুড়ে এক নেশন করা অসাধ্যসাধন। গোলমাল বাধবে রাজধানী সারায়েভো নিয়ে। সেটা আর একটা ব্রাসেলস। সম্ভবত সারায়েভোর জন্যেই বসনিয়া তিনটি নেশন হবে না। একটি নেশনই হবে। এখন সেকুলার স্টেট মেনে নিলে হয়। মুসলমানদের দেশ তুরস্ক সেকুলার রাষ্ট্র। তবে সেখানেও মৌলবাদীদের উপদ্রব বেড়ে চলেছে। মৌলবাদ প্রবল হলে বসনিয়ার বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

এখন এই কথাটা মনে রাখতে হবে আমাদেরও। এদেশেও মৌলবাদ প্রভাব বিস্তার করছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলবাদ অনেক ক্ষতি করলেও দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারে না। কিন্তু হিন্দুদের মৌলবাদ সফল হলে কাশ্মীরের মুসলমানদের, পাঞ্জাবের, শিখদের, নাগাল্যান্ড মিজোরাম ও মেঘালয়ের খ্রিস্টানদের হিন্দুরাষ্ট্রে অধম স্থান দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী করে তুলবে। বিশেষত হবে সৈন্যদলে, পুলিসবাহিনীতে, শিক্ষাকেন্দ্রে, আপিসে আদালতে। মিজো, গারো, খাসিরা কোনো অর্থেই বাঙালি, বিহারী, মরাঠা, গুজরাটের সঙ্গে একজাতি নয়। এক নেশন হয়েছে ভারত নামক দেশের প্রতি আনুগত্যের সুবাদে। ভারতের প্রতি আনুগত্য হিন্দু ধর্মের প্রতি আনুগত্য নয়। আনুগত্যের সঙ্গে আনুগত্যের বিরোধ বাধলে গৃহযুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধ এড়াতে দেশভাগ অনিবার্য।

এছাড়া আরো এক বিপদ বাঙালি মুসলমানদের উপর উর্দু চাপানোর মতো বাঙালি হিন্দুদের উপর হিন্দি চাপানো। হিন্দির প্রসার সিনেমাসূত্রে হচ্ছে, লোকে স্বেচ্ছায় হিন্দি ফিল্ম দেখছে, হিন্দি গানও গাইছে সেটা মন্দ নয়। কিন্তু আকাশবাণীতে, দূরদর্শনে, পাবলিক সেকটর ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে, রেলপথে, বিভিন্ন সরকারি বিভাগে হিন্দির একাধিপত্য দুঃসহ হবে, যখন বিকল্প হিসাবে ইংরাজি থাকবে না। হিন্দি কখনো ভারতকে এক করতে পারবে না, যদি না ইংরেজি তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। হিন্দ্, হিন্দি, হিন্দু যাঁদের ত্রিনীতি তাঁরা যেদিন ভারতভাগ্যবিধাতা হবে সেদিন ভারত আরো ক্ষুদ্রাকার হবে। গোটা দক্ষিণটাই তার বাইরে চলে যাবে। আমরা কেউ হিন্দিবিরোধী নই, কিন্তু আমরা ছলে বলে কৌশলে হিন্দি চাপানোর বিরোধী। কারণ এটা ভারত নামক দেশের ভাষার ভিত্তিতে দ্বিতীয়বার পার্টিশনের সূচনা। অপ্রিয় সত্য।

হিন্দুত্বের মতো হিন্দিত্বও বিচ্ছিন্নতাসূচক। অনেকে জানেন না যে ব্রিটিশ আমলেও সিভিল ও মিলিটারি অফিসারদের প্রত্যেককে হিন্দুস্থানী ভাষায় মৌখিক পরীক্ষা দিতে হতো। তাঁদের শিক্ষার জন্যে থাকত রোমান লিপিতে ছাপা হিন্দুস্থানী কেতাব। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজে রোমান লিপিতে ছাপা হিন্দুস্থানী চালু করেছিলেন। হিন্দি আর হিন্দুস্থানী একই ভাষার সংস্কৃতবহুল তথা ফারসীবহুল রূপ। হিন্দি ফিলমেও আমরা হিন্দুস্থানীর প্রভাব লক্ষ করি। হিন্দুরা বিবাহ করে না, শাদী করে। মোতিলালের মোতি আর লাল দুটোই ফারসী। নহর যদি ফারসী হয়ে থাকে তবে নেহরুও ফারসীর কাশ্মীরী রূপ। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পদবী প্রায়ই উ-কারান্ত। জবাহর বা জওহরও ফারসী। লালবাহাদুরের লালও ফারসী, বাহাদুরও তাই। বিস্তর ফারসী শব্দ হিন্দিতে ঢুকে গেছে। সেসব বর্জন করে তাদের জায়গায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা এখন হয়েছে হিন্দি শুদ্ধাচারীদের কাজ। তার ফলে হিন্দির নাম করে সংস্কৃত ঘাড়ে চাপছে। সেইসঙ্গে দেবনাগরি লিপি। এর মূলে যা আছে তা স্বদেশ প্রেম নয়। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রচলন কিংবা সদ্যনির্মিত সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের প্রবর্তন।

ভাষার প্রশ্নে ইউরোপ ভেঙেছে, এখনো ভাঙছে। চেক আর স্লোভাক একই স্লাভ জাতি।

সেই সূত্রে এক হয়েছিল। এখন ভাষার ভিত্তিতে দুই। তবে তার আড়ালে ধর্মও ছিল মনে হয়। চেকরা প্রটেস্টান্ট, স্লোভাকরা ক্যাথলিক। আয়ারল্যান্ড যখন স্বাধীন হয় তখন উত্তর অঞ্চলের প্রটেস্টান্ট দেশ দু'ভাগ করে নেয়। তারা ইংরেজিভাষী জাতিও বটে। রেস ঘটিত বিভেদও ছিল। Celt এবং Teuton। বিংশ শতাব্দীতেও এসব গণনা লোপ পায়নি।

জোর করে কারো উপরে কোনো ধর্ম ভাষা বা মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সকলের সম্মতি নিয়েই নেশন গঠন করতে হয়। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আর Wales এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Wales-এর লোক যতদূর জানি ব্যাপটিস্ট, স্কটল্যান্ডের লোক প্রেসবিটারিয়ান, ইংল্যান্ডের লোক প্রধানত চার্চ অব ইংল্যান্ডের সদস্য। ভাষাও বিভিন্ন। তা সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ বলে পরিচয় দিয়ে এক নেশন হয়েছে। কিন্তু তাদের রাষ্ট্র সেকুলার স্টেট নয়। কারণ রাজার ধর্ম প্রটেস্টান্ট। আর তিনিই চার্চ অব ইংলন্ডের মাথায়। আমেরিকা স্বাধীন হবার সময় রাজা ও রাজধর্ম দুই থেকে মুক্ত হয়। প্রেসিডেন্টের ধর্মমত ব্যক্তি অনুসারে বদলায়। রাষ্ট্রীয় চার্চ বলে কোনো চার্চ নেই। বিভিন্ন চার্চ যে যার মতো করে চলে। সরকারি স্কুল কলেজে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। বেসরকারি স্কুলে যে যার ধর্ম শিক্ষা দেয়।

ধর্মের প্রশ্নে নয়, ভাষার প্রশ্নে নয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যেতে বসেছিল নিগ্রো দাসপ্রথার প্রশ্নে। গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। তখনকার চার কোটি মানুষের দেশে দশ লক্ষ নিহত হয়। পঞ্চাশ লক্ষ আহত। এত মূল্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার সংহতি রক্ষা করে। তাদৃশ মূল্য আমরা ব্রিটিশ অপসারণে সময় দিতে ইচ্ছুক অথবা প্রস্তুত ছিলুম না। অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ড হলো, অবিভক্ত বঙ্গ বিভক্ত। কিন্তু যে রাষ্ট্র বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু রেস, বহু অঞ্চল সে রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন তো নানা দিক থেকে উঠবেই। কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, আসামে যা চলেছে তাও একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা দিন দিন অধৈর্য হয়ে উঠছে। সময়ে মীমাংসা না করলে পরে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা দুষ্কর হবে। ভারতের ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখতে পাওয়া যায় বেশির ভাগ সময়ই ভারত বহুধা বিভক্ত। ভারত কি একটা দেশ না একটা উপমহাদেশ, ভারতীয়রা একটা জাতি না একটা মহাজাতি? ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

আপাতত আমাদের এক করে রেখেছে আমাদের সংবিধান। একে আমি মহামূল্য মনে করি। দেশের বিজ্ঞতম ব্যক্তিরা মিলে একে রচনা করেছেন। তা বলে এটি একটি শাস্ত্র নয়, অভ্রান্ত নয়, অপরিবর্তনীয় নয়। আরো কয়েকটি রাজ্য আবশ্যক হলে গঠন করা যায়। আরো অটোনামি অত্যাবশ্যক হলে দেওয়া যায়। অপরিহার্য হলে বিচ্ছিন্নতাও মেনে নেওয়া যায়। যেক্ষেত্রে সম্মতির লেশমাত্র আশা নেই সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাই শ্রেয়। সামরিক সমাধান আমার মতে দেউলিয়াপনা। ইংরেজরা কি সামরিক শক্তি দিয়ে এদেশকে আরো কিছুকাল তাদের অধীনে রাখতে পারত না। তাদের কি মনোবল ছিল না? কিন্তু তার চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল কমনওয়েলথে ভারতকে স্বেচ্ছায় যোগ দিতে প্রণোদিত করা। এখন তো কেউ কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে চান না। ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক ভারতের পক্ষে সম্মানজনক তথা লাভজনক বলেই তো।

পুনশ্চ :

বসনিয়া নিবাসী সার্বদের লক্ষ্য কেবল বসনিয়ার পার্টিশন নয়, তার রাজধানী সারায়েভোরও পার্টিশন। সেখানে নাকি মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সার্ব, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মুসলিম

ও ক্রোয়াট। দেশভাগেও বিস্তর ঝামেলা। কারণ সার্ব অধ্যুষিত এলাকায় প্রচুর মুসলিম ও ক্রোয়াট। অপরপক্ষে মুসলিম বা ক্রোয়াট অধ্যুষিত অঞ্চলেও প্রভূত সার্ব। সম্ভবপর গৃহশত্রুদের সার্বরা বিতাড়ন করতে গিয়ে কোন কোন স্থানে পাইকারি হারে হত্যাও করে। আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রস্তাব বারবার ব্যর্থ হয় সার্বদের প্রত্যাখানের দরুন। এই যুদ্ধের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন ক্রোয়াটদের সঙ্গে মুসলিমদের শত্রুতার বদলে মিত্রতা হয়। ক্রোয়াটরা সার্বদের উপর চড়াও হয়ে তাদের দখলী জায়গা কেড়ে নেয় ও তাদের বিতাড়ন করে। সার্বদের বান্ধব রুশরা আর তাদের সমর্থন করতে পারে না আর সার্বদের আপন রাষ্ট্র সার্বিয়াও তাদের নিয়ে বিব্রত বোধ করে। যুদ্ধের চেয়ে শান্তির পাল্লা ভারি হয়। আমেরিকার ঘটকালিতে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ক্রোয়াশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট তিনজনে মিলে চুক্তিবদ্ধ হয়। বসনিয়া অবিভক্ত থাকবে, তার রাজধানী সারায়েভো অবিভক্ত থাকবে, বসনিয়ার সার্বদের জন্য রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক। অবশিষ্ট অংশ হবে মুসলিম ও ক্রোয়াটদের স্বায়ত্তশাসিত অপর এক রিপাবলিক। উভয়ের উপরে থাকবে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্ট। এতে বসনিয়ার সার্ব ছাড়া সবাই খুশি। আপাতত যুদ্ধ থেমেছে। শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি নিয়েছে।

অবিস্মরণীয় বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সারা ভারত চেনে প্রধানত একটি কারণে। তাঁরই প্রবর্তনায় তৎকালীন ভারত সরকার হিন্দু বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশের জন্যে নয়, সব ভারতের জন্যে। বাংলার বাইরের তাঁর খ্যাতি একজন অগ্রগণ্য সমাজসংস্কারকরূপে। কিন্তু সেকথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই বা ইচ্ছা করে চাপা দিই। বিধবার বিবাহ এখনও আমাদের চোখে একপ্রকার অনাচার। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল শাস্ত্রসাগর মন্থনপূর্বক ঋষিবাক্য উদ্ধার করে ক্ষান্ত হননি, বিধবা বালিকার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখিয়েছিলেন। তেমন তেজ কি আর কারো ছিল?

সেই তেজস্বী পুরুষের তুলনা বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এঁদের বেলাও কেউ উল্লেখ করেন না যে আশুতোষ্ তাঁর কন্যা কমলার বৈধব্যের পর পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়েছিলেন বালবিধবা প্রতিমার সঙ্গে। এসব কথা আমরা ভুলে যাই বা চাপা দিই। কারণ বিধবা বিবাহ আমাদের কাছে এখনও নিন্দনীয়।

এই আমরা কারা? যারা সমাজের তথাকথিত উচ্চতর স্তরের মানুষ। তথাকথিত নিম্নতর স্তরে সমাজসংস্কারের প্রয়োজন ছিল না। সমাজ আপনা হতেই বিধবা বিবাহ মেনে নিয়েছিল। আমার ছেলেবেলায় যে নাপিতবধূ আমার মাকে আলতা পরিয়ে দিতে আসত তার স্বামীর মৃত্যুর পর সে তার দেওরকে বিয়ে করে। পরে গিরিয়ার মা হয় শিরিয়ার মা। সিঁথির সিঁদুর জ্বল জ্বল করে। প্রখর তার ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় বর গোবেচারা, আফিংখোর, ভালোমানুষ। সে আসত আমায় কামাতে।

স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল একটি গ্রামের ছেলে, বয়সে দু'তিন বছরের বড়। তার দুই আঙুলে দুটি সোনার আংটি। একটি তার প্রথম বিয়ের। আর একটি বিধবা বৌদির সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহের। ভাগ্যবান পুরুষ। চোদ্দ বছর বয়সেই দুই বৌ। সে মুচকি হাসে। তার নাম মনে নেই, মুখ মনে আছে।

শতকরা আশি জন হিন্দুই লোকাচারের দ্বারা শাসিত। তাদের কাছে বিধবাবিবাহ আইনসম্মত না হোক, সমাজসম্মত। শাস্ত্র নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। কিন্তু বাকি বিশ জনের কাছে আইন না হলে চলে না, তার জন্যে শাস্ত্রীয় সমর্থন চাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তি অতুলনীয়। এর মূলে যা ছিল তা বিধবা বালিকার জন্যে করুণা। তিনি করুণা সাগর। সেই সঙ্গে ইংরেজিতে যাকে বলে Humanist। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কি না বিতর্কিত, কিন্তু মানবপ্রেমিক নিঃসন্দেহ। আদিবাসীদেরও তিনি ভালোবাসতেন। এটা তাঁর শেষজীবনে আদিবাসীদের সঙ্গে অবস্থানের হেতু।

তাঁর মহাপ্রয়াণের শতবর্ষ পরেও তিনি অবিস্মরণীয়। তাই তাঁর নামে রেলস্টেশন, সেতু, বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ভবনটি কোথায়? কলকাতায় নয়, মেদিনীপুর শহরে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নানা কথা

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী : দু'দিন পর রবীন্দ্রজয়ন্তী। রবীন্দ্রনাথের অবমূল্যায়নের হাওয়া উঠেছে, লন্ডনে বই বেরিয়েছে কৃষ্ণ দত্ত আর অ্যান্ড্রু রবিন্‌সনের উদ্যোগে। এদেশেও এসে লেগেছে সেই ঢেউ। রবীন্দ্রচর্চার কিছু প্রাজ্ঞজন বলছেন কবির নাকি কোন ফিলজফি ছিল না। পত্রিকাও যোগ দিয়েছে বিরূপ সমালোচনায়।

অন্নদাশঙ্কর : লন্ডনে যে বইটা বেরিয়েছে, এখনো কপি হাতে পাইনি। রিভিয়ু পড়েছি। ওরা কী লিখেছেন না পড়ে কিছু বলতে পারছিনে। বিরুদ্ধ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে শুনতে হয়েছে প্রায় সারাজীবন, নোবেল পুরস্কার পাবার আগেও যেমন পরেও তেমনি। কিন্তু সুরটা কিছু পাল্টেছিল পরে, কবিকে অবজ্ঞা করা আর সম্ভব হয়নি।'

অমূল্যকুমার : রবীন্দ্রচর্চার পুরোধা অনেকে বলছেন, ১৯১৩ সালের পর তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কবি লিখেছেন আরো মূল্যবান কবিতা। জানতে ইচ্ছা করে তাঁর কোন পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তিনি লিখেছিলেন, কবিকে খুঁজো না তার জীবনচরিতে।

অন্নদাশঙ্কর : কবির ব্যক্তি-জীবনের ব্যাপারে অনেকেই তো নাক গলিয়েছেন। তা ছাড়া বিদেশীবর্জন বনাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব, রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ—এসব নানা প্রশ্নে জর্জরিত হতে হয়েছিল তাঁকে।

অমূল্যকুমার : দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা রয়েছে তাঁর কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক সমালোচকদের এই অভিযোগ। আপনার কী মনে হয়?

অন্নদাশঙ্কর : ঠাকুরবাড়িতে দার্শনিক চিন্তার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পরে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটাকে আরো পুষ্ট করেছিলেন। উপনিষদ্ ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল তাঁদের চিন্তা, উপলব্ধি, দর্শনও বলা যায়। সেই ধারাই তো রবীন্দ্রনাথ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আমি যেটুকু জেনেছি রবীন্দ্রনাথ ফিলজফি নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাননি। গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বলতে যা বোঝায় তেমন কোন একটা তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে থাকতে তিনি হয়ত চান নি। পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় দর্শন ছিল, তিনি ব্রহ্মসাধনা করেছিলেন। তিনি গভীর আগ্রহে কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে এসব বিষয়ে পাঠ ধরাতেন। তাঁরা একসঙ্গে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। ধর্ম নিয়ে, ঈশ্বর নিয়ে, দার্শনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা হতো দুজনের মধ্যে। একটু বড় হয়ে বাড়িতে বই পড়লেন বড় বড় পণ্ডিত শিক্ষকদের কাছে। বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা, ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। দেখতে পাই, এভাবে অনেক বিষয়ে গোঁড়ামি থেকে তিনি মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন নিজেকে।

অমূল্যকুমার : এছাড়া বাইরের অন্য কোন প্রভাব পড়েছিল কি তাঁর উপর?

অন্নদাশঙ্কর : প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পেতেছিলেন, নেচারকে ভালোবাসতেন, সেখান থেকে অনেক কিছু নিয়েছিলেন। তাছাড়া, মানুষের জীবনপ্রবাহ তাঁকে খুব আকর্ষণ করেছে। লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাসও ছিল। জীবনদর্শনের কিছু সহজিয়া তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন এসব থেকে।

অমূল্যকুমার : সাধারণভাবে ধর্মবিশ্বাস বলতে যা বুঝি রবীন্দ্রনাথকে তা কীভাবে এব কতটা প্রভাবিত করেছিল?

অন্নদাশঙ্কর : সনাতন ভারতীয় ধর্মদর্শন তাঁকে দিয়েছে সর্বত্র বিরাজমান অসীম অনং ব্রহ্মধারণা। খ্রিস্টধর্ম থেকে তিনি পেয়েছেন আত্মত্যাগ, প্রেম ও সত্যের আদর্শ। বুদ্ধের করুণ ও মানবসেবার ধর্ম তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সহজিয়া তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন ইসলামের সুফী সাধনার ভাবধারা। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, বিশ্বাস ও জীবনচর্যার মধে প্রেমলীলা রবীন্দ্রনাথকে সন্ধান দিয়েছিল নূতন ভাবরসের। অজ্ঞেয়বাদের দিকেও তাঁর ম গিয়েছিল। নানাদিক থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন জীবনাদর্শ। কোথাও থেমে থাকেননি রবীন্দ্রনাথ।

অমূল্যকুমার : সম্প্রতি অধ্যাপক উজ্জ্বল মজুমদার এক প্রবন্ধে লিখেছেন, মানবজীবনের মূলসূত্র যে পরম সত্য বা পরম ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের সাহায্যে তাকে প্রত্যক্ষ করবার এক দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। এবিষয়ে আপনি কিছু বলবেন?

অন্নদাশঙ্কর : নিশ্চিত করে বলতে পারিনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন ফিলজফি উদ্ভাবন করেছিলেন। দার্শনিক জিজ্ঞাসার কখনো অন্তিম সিদ্ধান্ত নেই, শেষ উত্তর পাওয়া গেছে একথ বলা সম্ভব হয় না। জীবন তো বয়ে চলেছে, নিত্য নূতন বাঁক নিচ্ছে, নূতন প্রশ্ন উঠছে। ফিলজফি কখনো যুগ বা কাল এড়িয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা আমি মনে করি। পরিবর্তনের উপায়বর্জিত শেষ তত্ত্ব বা শেষ বাণী এমন কোন ধর্মমত মানুষকে উন্নতির পথ দেখাতে পারে না। রিনিউয়াল দরকার হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে তাই দেখি তাঁর চিন্তা, উপলব্ধি ও জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে ক্রমে এসে পৌঁছেছিলেন 'মানুষের ধর্ম' সিদ্ধান্তে পরিণত জীবনে শেষ পর্যন্ত তিনি এর মধ্যেই স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন।

অমূল্যকুমার : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁরা সন্দেহবাদী তাঁরা কি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছেন?

অন্নদাশঙ্কর : এখন এটা অবিশ্বাসের যুগ। সাহিত্যচর্চা ও গবেষণা যাঁরা করছেন তাঁদের মধ্যে ক'জন উপনিষদ্ পড়ে তার দর্শন উপলব্ধি করতে পেরেছেন? মূলে পৌঁছে তবেই তো রবীন্দ্রনাথের মৌল চিন্তার সূত্র ধরা সম্ভব। তাছাড়া সবই সুপারফিসিয়াল চেষ্টা।

অমূল্যকুমার : তাঁর লেখার তো অনুবাদ হয়েছে নানা ভাষায়। বাইরের গবেষকদের কাছে সেটা কি যথেষ্ট নয়?

অন্নদাশঙ্কর : বিক্ষিপ্ত অনুবাদ পড়ে রবীন্দ্রনাথকে ষোলআনা পাওয়া যাবে না। ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়তে হবে। লেখার গভীরে যেতে হবে। সাধনার মত করে এটা করতে হবে। এখনকার লেখক ও গবেষক কারো এত সময় নেই। নিষ্ঠাও কম। লন্ডনে হোক বা কলকাতায় বা দিল্লীতে যারা রিভিয়ু কলাম লিখে রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি খুঁজতে ব্যস্ত তারা সৌখীন মজদুরী করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে এখন এর বেশী আর কিছু বলতে চাইনে।

অমূল্যকুমার : রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণার জন্য তাঁর মূল বাংলা লেখা নিশ্চয় পড়তে হবে, বিষয়ের গভীরে যেতে হবে, স্টাইল বুঝতে হবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু মনে হয় অনুবাদের সাহায্য ছাড়া দেশে বিদেশে পাঠক সমাজে তাঁর লেখার প্রচার তো সম্ভব নয়। বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে। গবেষণার সুযোগও রয়েছে। আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

অন্নদাশঙ্কর : ভাল অনুবাদ তো হয়নি বেশী। রবীন্দ্রনাথের খুব রিজার্ভেশন ছিল তাঁর

কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে। নিজেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতেন, অনুবাদের ওপর নির্ভর না করতে। প্রথমদিকে কিছু কাজ তো তিনি নিজেই করেছিলেন; তাঁর অনুমতি নিয়ে ঠাকুরবাড়ির আরো ক'জন অনুবাদ করেন কিছু গল্প উপন্যাস। ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাজে উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু চলমান ইংরেজি সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে এসব অনুবাদের বড় তফাৎটা তাঁরা কেউ লক্ষ করেননি। রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভাষার নিজস্ব স্টাইল, গুণমান, সিন্‌ট্যাক্স, শব্দযোজনা, আরো অনেক কিছুতে, ধ্বনিমাধুর্যে। ফাইন নুয়ান্স বলতে যা বোঝায় সেটা অনুবাদের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এজন্যেই বাইরের ট্রান্স্‌লেটরদের ওপর খুব ভরসা ছিল না তাঁর। ফলে ইংরেজীতে অনুবাদের সিরিয়স চেষ্টাও খুব বেশী হয়নি। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান ও ফরাসী এই দুটো ভাষাতে বেশ কিছু বই অনুবাদ করা হয়েছিল জানি।

অমূল্যকুমার : নিজের কবিতার অনুবাদ তিনি নিজেই একটা মডেল করে দেখিয়েছিলেন ইংরেজি গদ্যে, কিন্তু অন্যেরা সেটা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

অন্নদাশঙ্কর : রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গীতাঞ্জলির অনুবাদ তো আইরিশ কবি ইয়েটস্ ঘষে মেজে নিখুঁত করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে ইংরেজি অনুবাদের ভাষা ইয়েট্‌স্‌, এর পছন্দ হয়নি। কিন্তু ভারতীয় কবির প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল, তাই নিজেই করিয়েছিলেন চিত্রা ও ক্রেসেন্ট্ মুন বই দুটো। পাশ্চাত্যের ইংরেজীভাষী পাঠকসমাজ যেন অনায়াসে পড়ে বুঝতে পারেন। এটাই ইয়েট্‌স এর লক্ষ্য ছিল। যেন ভাষায় ঠোক্কর খেতে না হয়। আমার মনে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ পড়ে বিদেশে এ যুগের পাঠকের এটাই বড় অসুবিধা। প্রচলিত আধুনিক ইংরেজি ভাষা হয়ে ওঠে না। ভাষায় হোঁচট খেতে হয়।

অমূল্যকুমার : তাহলে সমস্যাটা তো থেকেই যাচ্ছে।

অন্নদাশঙ্কর : বিভিন্ন ভাষার ভাল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হতে পারে ভাল অনুবাদের সাহায্যে। দুটো ভাষাতেই যাঁর দক্ষতা তিনিই পারবেন। এছাড়া আর কোন উপায় আছে কি না জানিনে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন লীলা রায়। বিদেশে খুব ভাল প্রচার হয়েছিল বইটির। রিভিয়ু লিখতে হলে, গবেষণার কোন কাজ করতে হলে মূল রচনা পড়তে হবে, ইন্-ডেপ্‌থ্ জানতে হবে। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত কোন সিরিয়স চেষ্টা হল না এটা লজ্জার ব্যাপার। কপিরাইটের মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়ে অন্য কাউকে স্বাধীনভাবে করতেও দিচ্ছেন না।

অমূল্যকুমার : রবীন্দ্রনাথের কবিতা গল্প উপন্যাস নিয়ে অনুবাদের কাজ করেছেন কি লীলা রায়?

অন্নদাশঙ্কর : বিশেষ কিছু নয়। কখনো অনুরোধ এলে কিছু কাজ হয়ত করে দিয়েছেন, সিস্‌টেমেটিক কাজ হয়নি। একবার অক্সফোর্ড থেকে লীলা রায়কে বলা হয়েছিল বলাকার ইংরেজি অনুবাদের জন্য। সুকান্ত চৌধুরী— যিনি এখন যাদবপুরে অধ্যাপক—এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি কপিরাইটের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে।

অমূল্যকুমার : রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি এখন বিদেশে আগ্রহের অভাব অর্থাৎ ডিক্লাইন ঘটছে বলে কি আপনি মনে করেন?

অন্নদাশঙ্কর : এক সময় বিলেতে ওটা ঘটেছিল, ঘটানো হয়েছিল। সাউথ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধী ১৯১৪ সালে ভারতে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে

ওঠে। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলোচনা হত। এটা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হয়ত খুব পছন্দ হয়নি। তারপর...

তারপর জালিয়ানওয়ালা বাগে নৃশংস ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের সম্মান নাইট্‌হুড ও স্যর খেতাব বর্জন করে সারা দেশকে চমকে দিলেন; ইংরেজদের এতে বড় ধাক্কা খেতে হল। ও দেশে তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহ পড়ে যাবার একটা মস্ত কারণ আমার মনে হয়েছে, রাজনীতির পরোক্ষ প্রভাব। বিশ ও ত্রিশের দশক জুড়ে এ ব্যাপারটা ঘটেছিল। আমি ও দেশেই ছিলুম তখন ক'বছর। আমি দেখেছি। আরো একটা বড় ফ্যাক্টর জড়িয়ে গিয়েছিল। ইটালিতে ফাসিস্ট আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক মুসোলিনি একজন বীরপুরুষ, এরকম একটা প্রশংসার মনোভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল। ইউরোপে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা। ফলে ইংরেজ জনসাধারণের খুব পছন্দ হয়নি কবির এসব মত। এ বিষয়ে আরো চর্চা হলে ভালই হয়। অনেক কিছু জানা যাবে।

অমূল্যকুমার : তাঁর ব্যক্তিজীবনে ভালমন্দ বিচার, স্বাধীন মতামত এসব তাঁর কবিজীবনে খ্যাতি-অখ্যাতির কারণ হয়ে উঠেছিল। আপনার কি তাই মনে হয়?

অন্নদাশঙ্কর : আমার তাই মনে হয়, এটাই ঘটেছিল কবির জীবনে। সাহিত্য সংস্কৃতির বাইরে রাজনৈতিক সমাজনৈতিক নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। ফলে বিতর্কেও জড়িয়ে পড়তেন অনেক সময়, তখন জনপ্রিয়তা হারাতেন। যেমন, ১৯৩০-এ তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ। ও দেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য দ্রুত সমাজ পরিবর্তন এসব নানা কার্যসূচীর চিত্র দেখানো হল তাঁকে। নূতন রাশিয়ার অগ্রগতি দেখে তখন মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বোধ হয়, নিজের পরাধীন দেশে ব্যাপক অভাব অভিযোগ অশিক্ষা অস্বাস্থ্য এসব কিছুর তুলনায় রাশিয়ার সার্বিক উন্নতি তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। কমিউনিস্ট কর্মক্ষমতার প্রশংসা লেখেন তাঁর চিঠিপত্রে। এটা নিশ্চয় তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনার বিষয় ছিল। কিন্তু এর ফলে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়, বিশেষ করে আমেরিকায়। ও দেশে তিনি খুব ভাল সাড়া পাননি। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের যদি ডিক্লাইন ঘটে থাকে তার জন্য তিনি নিজেও দায়ী বলে আমার মনে হয়।

অমূল্যকুমার : ডাকঘর নাটকের অনুবাদ পোস্ট অফিস শুনেছি ও দেশে এখনো জনপ্রিয়।

অন্নদাশঙ্কর : আমি যতদূর জানি ডাকঘর ও দেশে রেডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এর বেশী এখন বলতে পারিনে।

অমূল্যকুমার : আবার পঁচিশে বৈশাখের কথায় আসছি। কলকাতা বা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় ভারতের অন্য অনেক শহরে খুব ঘটা করে কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। এসব কি বাড়াবাড়ি মনে করেন?

অন্নদাশঙ্কর : বাড়াবাড়ি বা খাটো করবার প্রশ্ন নয়। আসলে, মানুষের মন যখন যা চায়—তীব্রভাবে চায়—সেটাই আসল কথা। এখন তো ধর্মের নামেও বাড়াবাড়ি চলছে। জাতীয়তা, গোষ্ঠী, বংশ কোনটা বাকি আছে? কিন্তু আর্ট, নান্দনিক সচেতনতা, সাহিত্য, সঙ্গীত দেশের সাংস্কৃতিক ভাবধারা, এসব মানুষকে উদ্দীপিত করে, উন্নত করে। এসব আমি ভালই মনে করি। রবীন্দ্রজন্মোৎসব এখন বিদেশেও হচ্ছে। এসব খুব আশার কথা, মনে করি।

অমূল্যকুমার : আপনার এই আশাবাদ সারাদেশে মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ুক—এটাই আমাদের কামনা। আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাচ্ছি।

মুখের মতন জবাব

যাঁরা বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন তাঁদের একজনের নাম বাক্। ইনিও ছিলেন একজন ঋষি। সে যুগে নারীর উপবীত ধারণের অধিকার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নারীর না রইল উপবীত ধারণের অধিকার, না বেদমন্ত্র পাঠের অধিকার। নারী আর সংস্কৃত ভাষাতেও কথা বলে না, বলে প্রাকৃত ভাষায়। মনু বিধান দিলেন, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। স্ত্রীলোকরা স্বাধীনতার যোগ্য নয়, তারা কুমারী অবস্থায় পিতার অধীন, বিবাহের পর পতির অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।

আট নয় বছরে বয়সে যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের জন্যে বিদ্যালয় কী হবে? তা ছাড়া মেয়েরা তো চাকরিবাকরি করে ছেলেদের মতো বাপমাকে দেখবে না। যাবে তো পরের বাড়ি। কেন তবে তাদের জন্যে এত খরচ? বাড়িতেই না হয় ব্রতকথা পড়তে শিখুক।

উনবিংশ শতাব্দীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। কিন্তু মেয়েরা উচ্চপ্রাথমিক পাশ করার আগেই বিয়ে পাশ করে। তাই তাদের জন্যে হাইস্কুলের প্রয়োজন হয় না। কেউ কেউ বাড়িতে পড়াশুনা করে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেয়। দুটি একটি মেয়ে প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেয়। এরা অবশ্য হিন্দু সমাজের মেয়ে।

খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম মেয়েদের জন্যে হাইস্কুল ও কলেজ উনবিংশ শতাব্দীতেই স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়লে তারা সেখানে গিয়ে পড়াশুনো করত।

শুনেছি ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় যখন কলকাতা প্রেসিডেন্সি প্রিন্সিপাল কলেজের ছিলেন তখন তিনি তিনটি ব্রাহ্ম মেয়েকে তাঁর কলেজে ভরতি করেন। তাঁর সে প্রচেষ্টা স্থায়ী হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ছেলেদের কলেজে মেয়েদের দেখা পাওয়া যায়। ত্রিশের দশকে এটা আর ব্যতিক্রম থাকে না। এটাই হয়ে যায় নিয়ম। হ্যাঁ, হিন্দু মেয়েদের বিয়ের বয়স বেড়ে যাওয়ার ফলেই তাদের জন্যে কলেজ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কলেজ খোলার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তার থেকে ছেলেদের কলেজে তাদের জন্যে স্থান সংরক্ষণ শ্রেয়।

পরে দেখা গেল বিয়ের বয়স আরও বেড়ে গেছে। মেয়েরা গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির। তাদের জন্যে তো আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় না। ইতিমধ্যেই মেয়েদের মাথায় এক নতুন ভূত ঢুকেছে। তারাও চায় ছেলেদের মতো কেরিয়ার। আগে কেরিয়ার, পরে বিয়ে। কিংবা আগে বিয়ে, তারপর কেরিয়ার। দুটোর যোগফল পুরুষের পক্ষে মারাত্মক। ছেলেমেয়েদের সামলাবে কে? স্বামী? শাশুড়ি?

আমি সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকে একজন ফেমিনিস্ট। আমার কলেজের এক অধ্যাপক আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন "An Anti-Feminist Cry"। আমি তার উত্তরে লিখি " A Feminist Counter-cry"। দুটোই কবিতা। এখন মেয়েরাই নিজেদের হাতে লেখনী নিয়েছেন। এখন তাঁরাই পুরুষদের মুখের মতন জবাব দিন।

কাশ্মীর, তুমি কার?

"কাশ্মীর, তুমি কার?" এই প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তান বলবে, "তুমি আমার।" কারণ পাকিস্তানের 'ক' অক্ষরটি কাশ্মীরের আদ্যঅক্ষর 'ক'। পাকিস্তানের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন সেই চৌধুরি রহমৎ আলি কাশ্মীরকেও সেই রাষ্ট্রের সামিল করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা যিনি গ্রহণ করেন মুসলিম লিগের সেই সর্বাধিনায়ক মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবও কাশ্মীরকে তাঁর প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ব্রিটিশ অপসরণের সময় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কাশ্মীরও তাঁর ভাগে পড়বে। সেই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর উত্তরসূরীরা আজ অবধি ত্যাগ করেনি। পাকিস্তান কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাই সে কাশ্মীরকে লড়কে নেওয়ার জন্য পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করছে। কাশ্মীরের দাবিতে সে বারবার তিনবার লড়েছে। তার খানিকটা দখলও করেছে। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকা এখনও তার নাগালের বাইরে। শোনা যায় এখন সে জঙ্গিদের তালিম দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, বেনামীতে লড়তে পাঠাচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায়। তারা সফল হলে মসনদ দখল করবে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নেই। ইতিমধ্যে ছ' বছর কেটেছে। পরে শতাব্দী কাবার হতে পারে। বেঁচে থাকলে একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা দেখব যে জঙ্গিদের হামলা চলেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, যতদিন পাকিস্তানের অস্তিত্ব ততদিন 'ক' অক্ষরের জন্য তার অবিরাম সংগ্রাম।

"কাশ্মীর, তুমি কার?" এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত বলবে, "কাশ্মীর আমার।" যেহেতু মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদানের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন ও ভারতকে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্পণ করেছিলেন। এইভাবেই কাশ্মীর তথা জম্মু ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। কাশ্মীর রক্ষার জন্য ভারত বারবার যুদ্ধ করেছে। বাধ্য হলে আবার করবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান প্রেরিত জঙ্গিদের সঙ্গেও মোকাবিলা করছে ও যতদিন দরকার ততদিন করবে। পাকিস্তানের যেমন পণ "লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর", ভারতেরও তেমনি পণ "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"

এছাড়া আরও একটি পক্ষ আছে। সেটি কাশ্মীরী জনগণ। "কাশ্মীর, তুমি কার?" এই প্রশ্নের উত্তরে কাশ্মীরের জনগণ বলবে, "জন্মস্বত্বে কাশ্মীর আমাদের।" মহারাজা কাশ্মীরকে ভারতের হাতে অর্পণ করে থাকতে পারেন, কিন্তু আমরা তো করিনি। পাকিস্তান কাশ্মীরকে দাবি করতে পারে, কিন্তু আমরা তো সেই দাবি মেনে নেইনি। আমাদের একটা নিজস্ব সত্তা আছে। কাশ্মীর চিরদিনই স্বতন্ত্র। মহারাজ রণজিৎ সিং কাশ্মীর জয় করেছিলেন। তাতে আমাদের সায় ছিল না। পরে ইংরেজরা কাশ্মীর জয় করে জম্মুর অধিপতি গুলাব সিংকে বিক্রয় করে। তাতেও আমাদের হাত ছিল না। গুলাব সিংহের উত্তরাধিকারী হরি সিং কাশ্মীরকে ভারতের হাতে তুলে দেন। তিনিও আমাদের অভিমত গ্রহণ করেননি। জবাহরলাল নেহরু কথা দিয়েছিলেন যে গণভোট গ্রহণ করা হবে। কিন্তু গণভোটও গ্রহণ করা হয়নি। গোটাকয়েক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বটে। কোনওবারই মূল প্রশ্ন নিয়ে ভোট চাওয়া হয়নি। মূল প্রশ্নটা হচ্ছে সেল্‌ফ ডিটারমিনেশন বা

আত্মনিয়ন্ত্রণ। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সব মানুষের আছে। সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মহারাজা রণজিৎ সিংও না। ইংরেজ সরকারও না। মহারাজা হরি সিংও না। চৌধুরি রহমত আলিও না। কায়দে আজম জিন্না সাহেবও না। স্বাধীন ভারতের কর্ণধার জবাহরলালও না। একদিন না একদিন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমাদের দিতেই হবে। সেটা প্লেবিসাইট বা রেফারেন্ডাম অনুসারে দেওয়া উচিত। তবে আমাদের অপশন কেবলমাত্র ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। স্বাধীন কাশ্মীরও হবে অন্যতম অপশন।"

এখন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কাশ্মীর বলতে শুধু কাশ্মীর উপত্যকা বোঝায়। কিন্তু তার বাইরেও আছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বা আজাদ কাশ্মীর। প্লেবিসাইট বা রেফারেন্ডাম যেটাই হোক না কেন সেটাতে 'আজাদ' কাশ্মিরিদেরও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা দরকার। তাদেরও দিতে হবে তিনটে অপশন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে 'আজাদ' কাশ্মীরবাসীরা ভারত পাকিস্তানের বাইরে স্বাধীন কাশ্মীর চাইবে তাহলে পাকিস্তান কি কখনও তাতে রাজি হবে? পাকিস্তান কি সত্যিই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে? এতদিনে তারা 'আজাদ' কাশ্মীরকে স্বাধিকার দেয়নি। এখনও তার কোনও সংবিধান নেই।

দ্বিতীয়ত প্লেবিসাইট বা রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হলে জম্মু ও লাডাখের অধিবাসীরাও ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে। সেখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধরা যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে না সেটা নিশ্চিত। পাকিস্তান নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের স্থান নেই। তারা হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয় দেশত্যাগ করবে, নয় নিহত হবে ইসলামী রাষ্ট্রের এই ঐতিহ্য এখনও সংশোধিত হয়নি। সংশোধনের কোনও প্রতিশ্রুতিও নেই হিন্দু ও বৌদ্ধরা তো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে পারে। তাদেরও তো সেটা জন্মস্বত্ব সুতরাং প্লেবিসাইট বা রেফারেন্ডামের আওতা থেকে জম্মু ও লাডাখকে—অন্তত লেহ অঞ্চলকে—বাদ দিতে হবে। আমরা যতদূর জানি, তারা ভারতেই থাকতে চাইবে। তাহলে, দাঁড়াচ্ছে এই, প্লেবিসাইট বা রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হবে কেবলমাত্র মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর উপত্যকা তথা 'আজাদ' কাশ্মীর নামক অংশে। ভারত, পাকিস্তান যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হয় তাহলে তার নীট ফল হবে ভারত থেকে কাশ্মীরিদের প্রস্থান। অথচ পাকিস্তানে প্রবেশ না-ও হতে পারে। এই সম্ভাবনাটাকে এক কথায় খারিজ করা যায় না। কাশ্মীরি মুসলমানরা বরাবরই স্বতন্ত্র। কারণ মহারাজার আমলে তারা মুসলিম কনফারেন্সের চাইতে ন্যাশনাল কনফারেন্সের পক্ষপাতী ছিল। ন্যাশনাল কনফারেন্স হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ নিরপেক্ষ সংগঠন। অপরপক্ষে মুসলিম কনফারেন্স কেবলমাত্র মুসলমানদের। তফাতটা যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সেইজন্য ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লা ছিলেন কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা। সেইজন্যই নেহরুর সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা, জিন্না সাহেবের সঙ্গে নয়।

শেখ আবদুল্লার তিরোধানের পর তাঁর মতো প্রভাবশালী নেতা কাশ্মীরে আর কেউ নেই তাঁর উত্তরাধিকারী ড. ফারুক আবদুল্লা এখন তাঁরই মতো ক্ষমতা দাবি করছেন। মহারাজা হরি সিং অর্পিত তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় তাঁর হাতে দিলে তিনি প্রস্তাবিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন। নতুবা সদলবলে নির্বাচন বয়কট করবেন। এখন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেটের অভিনয় কেমন করে সম্ভব? অপর পক্ষে তাঁর কথা মতো ১৯৫৩ সালে ফিরে যেতে হলে শাসন ব্যবস্থায় ঘোরতর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কাশ্মীরকে যদিও ৩৭০ ধারায় স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাহলেও তার শাসনব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সমান

বহিরাগতরা সেখানে সরকারি অনুমতি না নিয়ে জমি কিনতে পারে না। এইখানেই তার স্বতন্ত্র মর্যাদা সীমাবদ্ধ এবং ৩৭০ ধারার এটুকুই অবশিষ্ট আছে। সেটুকুতেও হিন্দুরাষ্ট্রবাদীদের আপত্তি। তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হলে কাশ্মীর বহিরাগত হিন্দুতে ভরে যাবে, বিশেষত পাঞ্জাবি শরণার্থীতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আবদুল্লা সাহেবের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির মেরুকরণ হয়েছে। একপক্ষ উত্তর মেরুতে তো অপরপক্ষ দক্ষিণমেরুতে। এঁদের মধ্যে সমঝোতার কোনও আশা নেই।

তাহলে কি সমঝোতা কারও সঙ্গে কারও হবে না? রাষ্ট্রপতি ছ'বছর হল শাসন করছেন। মিলিটারির সাহায্যে মিলিট্যান্ট দমন করছেন। তিনি কি সেটা অনন্তকাল করবেন? ইতিমধ্যে বহু জঙ্গি মারা গেছে। তারা সকলেই মুসলমান। তাদের যারা মেরেছে তার সকলেই হিন্দু অথবা শিখ। মুসলমানের প্রতি মুসলমানের একটা নাড়ীর টান আছে। তাই কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান মৃতের জন্য সমবেদনা বোধ করছে। সেই সমবেদনা থেকে আসছে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে অনীহা। যাকেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে-ই বলছে, সে ভোট দেবে না। যদি দেয় তাহলে দেবে জওয়ানদের বন্দুকের ভয়ে। কিন্তু যত ভোটার আছে তত বন্দুক নেই। শতকরা পাঁচ জন কি দশ জন ভোট দেবে। সেরকম ভোটের দ্বারা নির্বাচিত বিধানসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিমণ্ডলী ভারত সরকারের সঙ্গে নেগোসিয়েশন চালাতে পারবে না। অথচ এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে জরুরি। শুধু এই মুহূর্তে কেন, পাঁচ বছর আগেও জরুরি ছিল।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পাঁচ বছর আগে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন দূরদর্শনের একজন অফিসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার অভিমত জানতে চান। সেটা নাকি সরকারের ইচ্ছায়। আমি যা বলি সেটা দূরদর্শনে প্রচারিত হয়েছিল। আমি বলেছিলুম, "কাশ্মীরের কোনও সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধান চাই। তার জন্য কাশ্মীরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন চালাতে হবে। নিশ্চয়ই এমন একটা সমাধানের সূত্র পাওয়া যাবে যেটা উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য।" দুঃখের বিষয়, আমার অভিমত কেউ গ্রাহ্য করেনি। অবস্থা যেমনকে তেমন। সামরিক সমাধান সুদূরপরাহত। দুপক্ষই কেবল গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যালটের বদলে বুলেট। বুলেটের বদলে ব্যালট নয়। এতদিন পরে সরকারের হোঁশ হয়েছে। তাঁরা অবিলম্বে ব্যালট চান। কিন্তু ছ' বছরে কাশ্মীরের জনসাধারণের অন্তর থেকে ব্যালটের চিন্তা মুছে গেছে। জোরজবরদস্তি না করলে কেউ ভোট দেবে কি না সন্দেহ। জোরজবরদস্তি করবেই বা কে? যদি কেউ করে তাহলে সেটা বেআইনি হবে। আরও ছ'মাস পরে নির্বাচন করলে ইতিমধ্যে আরও অনেক জঙ্গি মরবে। তার মানে আরও বেশি মুসলমান আরও বেশি হিন্দুর হাতে মরবে। তার ফলে কাশ্মীরের জনগণ আরও বেশি বিক্ষুব্ধ হবে। নির্বাচনের দ্বারা আপাতত কোনও সমাধান হবে না। পাকিস্তানও সেটা চায় না। মনে হয়, বিজেপিও সেটা চায় না। আমরা যারা চাই তারা অরণ্যে রোদন করছি। লোকসভায় ইতিমধ্যে যদি কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় কে-ই বা আমাদের অভিমত শুনবে!

কে করবে তা আমি জানিনে, কিন্তু কী করা উচিত তা বোধহয় আমি জানি। জম্মু ও লাডাখকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলতে আমার দ্বিধা নেই, কিন্তু কাশ্মীরকে বলতে দ্বিধা আছে। পূর্ববঙ্গের মায়া যদি কাটিয়ে থাকতে পারি, সিন্ধুপ্রদেশের মায়া যদি কাটিয়ে থাকতে পারি তাহলে কাশ্মীরের মায়াও কাটাতে পারব। কাশ্মীর এমন কী মূল্যবান যে সেখানে সারাক্ষণ পাঁচ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হবে ও তার জন্য বাজেটে ঘাটতি পূরণ অসম্ভব হলে

মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে হবে। ইতিমধ্যে টাকার মূল্য অনেক হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ডলারের মূল্য, পাউন্ডের মূল্য, জার্মান মার্কের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। আরও ধারকর্জ করতে হবে। শোধ করতে না পারলে, দেউলে হতে হবে। কিন্তু যদি বলি যে কাশ্মীরিদের তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করার সুযোগ দাও তৎক্ষণাৎ রব উঠবে, "ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা রদ করো, মুসলমানদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করো।" যেন ভারতীয় মুসলমানদের সমানাধিকার ও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা কাশ্মীরী মুসলমানদের ভারতভুক্তির উপর নির্ভর। কাশ্মীর থাকুক বা না থাকুক, ভারত তার ধর্মরিপেক্ষতা রক্ষা করবেই। ভারতের মুসলমানদেরও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। তবে জম্মু ও লাডাখকে কাশ্মীরের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে না। জম্মু ও লাডাখ গুলাব সিং-এর আমলের পূর্বে কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সেই দুটি এলাকার উপরে কাশ্মীরের কোনও নৈতিক দাবি নেই।

সমস্যাটাকে জটিল করেছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভবিষ্যৎ। আবহমান কাল কাশ্মীরে তারা বাস করে এসেছে। মুসলিম রাজত্বেও তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বর্তমান সরকার তাদের অভয় দিতে পারছে না। তাই তারা এখন জম্মুতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কাশ্মীর স্বাধীন হলে বা পাকিস্তানের সামিল হলে তারা কি কোনদিন তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে? আমার একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত বন্ধু আছেন। তিনি ও তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই এখন কাশ্মীরের বাইরে অবস্থান করছেন। তিনি একেবারেই হতাশ। আমি তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান তাঁর জীবৎকালেই হবে। অবশ্য আমার নিজের জীবৎকালেই হবে কি না সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ইহুদিদের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের যোগ্যতার দ্বারা তারা অবস্থার উন্নতি করেছে। ব্যক্তি হিসেবে তাদের দুঃখ থাকার কথা নয়, কিন্তু সমষ্টি হিসেবে তারা দুঃখী। তারা যদি কাশ্মীর হারায় তবে কাশ্মীরও তাদের হারাবে। কাশ্মীরের ঐতিহ্য রক্ষা তাদের মতো আর কে করতে পারবে? তাই আমি আমার কাশ্মীরি বন্ধুকে ভরসা দিই। একদিন-না-একদিন তিনি কাশ্মীরে ফিরে যেতে পারবেন ও মাথা উঁচু করে থাকতে পারবেন।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে মনে পড়ল যে শেখ আবদুল্লা নাকি প্রবোধকুমার সান্যালকে বলেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত। কথাটা সত্য হলে নেহরুতে আবদুল্লাতে ছিল পণ্ডিতে পণ্ডিতে কোলাকুলি। তাঁদের সেই মধুর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায় নেহরু যখন শোনেন, আবদুল্লা কাশ্মীরকে করতে চান সুইটজারল্যান্ডের মতো স্বাধীন তথা নিরপেক্ষ একটি দেশ যেখানে শীতকালে বরফের উপর খেলা করতে আসবেন ইউরোপ আমেরিকা থেকে ধনী পর্যটকগণ। শীতের সুইটজারল্যান্ডের মতো শীতের কাশ্মীরও হবে এক অলকাপুরী। নেহরু ভয় পান যে অমনই করে ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে আর একটি বলকান। ভারতবর্ষে দুটো ডোমিনিয়নই যথেষ্ট, তৃতীয় একটা ডোমিনিয়ন হতে দেবেন না বলে তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্বতন্ত্র বঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই তিনি কেমন করে স্বতন্ত্র কাশ্মীর পরিকল্পনা সহ্য করতেন? অতএব শেখ আবদুল্লা সাহেবের বন্দিদশা ও পর্বতশিখরে বনবাস। তাও এক বছর দু বছর নয়, বারো বছর। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কোলাকুলির পরিণতি গভীর মতবিরোধ। নেহরুর মৃত্যুর পর শেখ সাহেব অনাথ হয়ে পড়েন। পাকিস্তান তাঁর শত্রু। ভারতই তাঁর মিত্র, যদিও শর্তসাপেক্ষ মিত্র। পণ্ডিত বংশধর পণ্ডিত কন্যার সঙ্গে আপোস করে তাঁর গদী ফিরে পান।

স্বাধীন কাশ্মীরের প্রস্তাবে ভুট্টো কন্যা বেনজির কি রাজি? না, তিনিও ঘোষণা করেছেন

যে তিনিও বলকানীকরণ সমর্থন করেন না। কাশ্মীর স্বাধীন হলে আরও একটি বলকান রাষ্ট্র হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ হয়েছে এক বলকান রাষ্ট্র। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দিলে নাগাল্যান্ডকে স্বাধীনতা দিতে হবে। মিজোরামকেও। অরুণাচলকেও। এরা কেউ হিন্দুও নয়, আর্যভাষীও নয়, আর্যজাতিও নয়। এরা মঙ্গোল জাতি, এদের ভাষা তিব্বতো-বর্মীয়, এদের ধর্ম অ্যানিমিজম(Animism) বা বৌদ্ধধর্ম বা খ্রিস্টধর্ম।

বলকানীকরণের আশঙ্কা না থাকলে আমি স্বাধীন কাশ্মীর সমর্থন করতুম। তাতে অন্তত এইটুকু লাভ হতো যে দুই ভাগ কাশ্মীর জুড়ে যেত, 'আজাদ' কাশ্মীরও পাকিস্তানের কবলমুক্ত হতো। অবশ্য পাকিস্তান যদি স্বাধীন ও সংযুক্ত কাশ্মীরকে স্বীকৃতি দিত। তেমন কোনও সম্ভাবনা কি কেউ দেখতে পাচ্ছেন? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মতো কাশ্মীরের দুই ভাগ বিভক্ত থাকবেই। কাশ্মীর যদি নিজের চেষ্টায় স্বাধীন হয় তো খণ্ডিত আকারে স্বাধীন হবে, বাংলাদেশের মতো। তার অপরিহার্য শর্ত জম্মু ও লাডাখ থেকে বিযুক্তি।

চল্লিশ বছর আগেও ফরাসীরা তাদের ভাষায় বলত, "আলজেরিয়া! সে তো ফরাসী।" তাদের মতে আলজেরিয়া ফ্রান্সের অবিভাজ্য অংশ। কিন্তু আলজেরিয়ানদের মতে তারা ফরাসী নয়, তারা আলজেরিয়ান। এবং তারা ফরাসী শাসনের পূর্বেও আলজেরিয়ান ছিল। কাশ্মীর সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা, "কাশ্মীর! সে তো ভারতীয়।" কিন্তু কাশ্মীরিদের ধারণা অন্যরূপ। মহারাজার আমলেও তারা কাশ্মীরি ছিল, ভারতীয় হয়নি। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে তাদের কোনও অংশ ছিল না। যেসব কাশ্মীরি পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে ভারতে বাস করতে করতে ভারতীয় হয়েছিলেন—যেমন নেহরু, সপ্রু, কাটজু প্রমুখ নেতা—তাঁদের কথা আলাদা। ঘটনাচক্রে জবাহরলাল নেহরু হন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীরের প্রতি তাঁর একটা পারিবারিক টান ছিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা ছিল জীবনমরণের প্রশ্ন। তিনি বেঁচে থাকতে কাশ্মীর পাকিস্তানে যাবে ও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা গৃহহারা হবে এটা তাঁর কাছে ছিল প্রাণান্তকর। ভাগ্যক্রমে তাঁর সহায় হন র‍্যাডক্লিফ সাহেব। পাঞ্জাব ভাগ করতে গিয়ে তিনি গুরুদাসপুর ও বাটালা তহ্‌শিল দুটি দেন পূর্ব পাঞ্জাবকে। ভাগ্যক্রমে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে জম্মুতে যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল গুরুদাসপুরের ভেতর দিয়ে। নইলে ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অভিন্ন সীমান্ত থাকত না। স্থলপথে ভারত থেকে জম্মুতে যেতে পারা যেত না। যেতে হতো আকাশপথে। হাজার হাজার সৈন্য পাঠাতে পারা যেত না। ট্যাঙ্ক নিশ্চয়ই নয়। ভারি ভারি কামানও নয়। অপরপক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের অভিন্ন সীমান্ত ছিল। সুগম স্থলপথ ছিল। ভারি ভারি কামান ও ট্যাঙ্ক চলাচল করতে পারত। মহারাজার সঙ্গে চুক্তির শর্তে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে পারলেও যোগাযোগের পথ না পেয়ে ভারত বিপাকে পড়ত। অগত্যা ভারতকে কাশ্মীরের মায়া কাটাতে হতো। যেখানে জনগণ মহারাজার সঙ্গে একমত নয়, সেখানে ভারত কি কেবল সৈন্যদের উপর নির্ভর করেই কাশ্মীরের উপর দখল রাখতে পারত? মুষ্টিমেয় কাশ্মীরি পণ্ডিত কি জনগণ? জম্মুর কথা আলাদা। জম্মু কোনওকালেই কাশ্মীরের অঙ্গ ছিল না। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য একটা জোড়াতালি।

প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গলকে বলা যায় একজন স্টেটসম্যান। তিনি ইচ্ছে করলে সামরিক বল দিয়ে আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অঙ্গীভূত করে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে সামরিক সমাধান চেষ্টা বৃথা। তাতে অনর্থক রক্তক্ষয়। চাই রাজনৈতিক সমাধান। তার জন্য আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি জনপ্রিয়তার জন্য লালায়িত না হয়ে ঠিক

সময়ে ঠিক কাজটি করেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তির শর্ত হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব। আলজেরিয়া ফরাসী নয়, কিন্তু আলজেরিয়ানদের ফ্রান্সে অবারিত দ্বার। কেউ কেউ ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। আলজেরিয়ায় বহু ফরাসী আছে। তাদের সম্পত্তি সুরক্ষিত।

এককালে ফরাসীরাও আলজেরিয়ার উন্নয়নের জন্য প্রচুর লোকহিতকর কাজ করেছিল। তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ও করেছিল। তথাপি আলজেরিয়ানদের ফরাসী করতে পারেনি। আমরাও কি কাশ্মীরিদের ভারতীয় করতে পেরেছি? মুষ্টিমেয় কাশ্মীরি পণ্ডিতকে ভারতীয় করা যথেষ্ট নয়। 'ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে,' লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যটা এই যে মহারাজা হরি সিং স্বয়ং কাশ্মীরি ছিলেন না। কাশ্মীরিদের প্রতিনিধিও ছিলেন না। তাঁর সম্পাদিত চুক্তি আইনত বলবৎ হলেও কাশ্মীরিদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভারতভুক্তি নয়। এটা নীরেট সত্য। সত্যের মুহূর্ত সমুপস্থিত। শুধু কাশ্মীরিদের জন্য নয়, জম্মুবাসী ও লাডাখবাসীদের জন্যও। তাদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। তারা যদি ভারতীয় নাগরিক হতে চায় তবে তাদেরকেও ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হবে না। তেমনই কাশ্মীরিরা যদি ভারত ছাড়তে চায় তবে তাদেরকেও ভারতে থাকতে বাধ্য করা হবে না। অর্থাৎ জম্মু ও লাডাখকে বাদ দিয়ে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া যাবে যদি সেটাই হয় কাশ্মীরিদের ইচ্ছা। এর জন্য প্লেবিসাইট বা রেফারেন্ডামের দরকার কী? বিধানসভার নির্বাচনেও তো কাশ্মীরিদের ইচ্ছা প্রতিফলিত হতে পারে। নির্বাচিত কাশ্মীরি প্রতিনিধিরা যদি এককাট্টা হয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তাহলে তাদের সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত। চুক্তির শর্ত হবে জম্মু ও লাডাখের উপরে কাশ্মীরিদের দাবি প্রত্যাহার, জম্মু থেকে লাডাখে যাওয়ার পথ অবাধ করা, ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের যথারীতি কাশ্মীরে তীর্থযাত্রা করতে দেওয়া এবং স্বাধীন কাশ্মীরের সংবিধানে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা সংরক্ষণ করা। এর ফলে কাশ্মীরিদের ভাগ্যবিধাতা কাশ্মীরিরাই হবে। তবে পাকিস্তান এটা স্বীকার করলে হয়। তার কাছে পাকিস্তানের 'ক' অক্ষরই একমাত্র গণনা, কাশ্মীরিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা গণনা নয়। কাশ্মীরিদের সম্বন্ধে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই একটি কারণে শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। এটা কাশ্মীরিদের মনে রাখা উচিত। পাকিস্তান যদি তাদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে কাশ্মীর উপত্যকার স্বাধীন হওয়ার অধিকার স্বীকার করে নিক, পাকিস্তান অধিকৃত 'আজাদ' কাশ্মীরকে স্বাধীন কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত হতে দিক। তার জন্য আলাদা একটা চুক্তি দরকার হবে। সেটা পাকিস্তানের সঙ্গে 'সংযুক্ত স্বাধীন কাশ্মীর প্রজাতন্ত্রের। পাকিস্তানেও দ্য গলের মতো একজন স্টেটসম্যানের প্রয়োজন।

পাকিস্তানের বর্তমান অধিনায়করা বিশ্বাস করেন যে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হবে এক তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায়। যেমন হয়েছিল র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বেলায়। তার পর যেমন মধ্যস্থতা হয়েছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পার্টিশন প্ল্যানের সময়। দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা আগে কখনও সফল হয়নি। পরেও হবে বলে পাকিস্তানীরা বিশ্বাস করে না। ভারতীয়রাও বারবার ঠেকে শিখেছে যে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা কোনওবারই নিরপেক্ষ হয়নি, পরেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই ভারতীয় নেতারা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু হঠাৎ যদি একদিন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ বেধে যায় তবে সেই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিল নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করবে। তখন পঞ্চ মহাশক্তির

রোয়েদাদ মেনে নিতেই হবে। কাশ্মীর নিয়ে আবার এক যুদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জ কখনও বরদাস্ত করবে না। বিশেষত যখন আরও এক হিরোশিমা বা নাগাসাকির আশঙ্কা রয়েছে। এবার এই উপমহাদেশের মাটিতে। আমরাও কি বরদাস্ত করতে পারব? আমরা যারা ভারত পাকিস্তানের নিরীহ নাগরিক? মিলিট্যান্ট ও মিলিটারি এই দুই পক্ষের কাছে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ বন্ধক দেওয়া হয়েছে। এরা কি সেই বন্ধক থেকে সিভিল সোসাইটিকে মুক্তি দিতে রাজি?

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সাফল্যের শর্ত হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেক (Give and Take), কবির ভাষায় 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'। তার মানে ভারত পাকিস্তানকে কিছু দেবে ও পাকিস্তানের কাছ থেকে কিছু নেবে। তেমনই পাকিস্তান ভারতের কাছ থেকে কিছু নেবে এবং ভারতকে কিছু দেবে। আপাতত এই ভাবে মিটমাটের জন্য ভারত ও পাকিস্তান কোনও পক্ষই প্রস্তুত নয়। জনগণের দিক থেকেও তার জন্য নেতাদের উপর চাপ নেই। অতএব বিশ্ব জনমতের চাপই একমাত্র ভরসা। এক প্রকার না এক প্রকার রোয়েদাদ অবশ্যম্ভাবী, যদি না ভারত-পাকিস্তান কাশ্মীরের প্রশ্নে আপোস করে। আমি তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছি। সেটাই মীমাংসার একমাত্র সূত্র নয়। শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে।

শান্তিনিকেতনের হীরেনদা

আমার নতুন প্রবন্ধের বই 'নব্বই পেরিয়ে' উৎসর্গ করতে চেয়েছিলুম আমার আগে যিনি নব্বই পেরিয়েছিলেন আমার সেই পুরাতনতম জীবিত বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ইন্দ্রজিৎ'কে। বিস্ময়ের ব্যাপার! এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার ঠির পরের দিনই সকালবেলায় পার্থ বসুর কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেলুম, হীরেনবাবু একটু আগেই চলে গেছেন। মাস কয়েক আগে একটি সভায় তাঁকে দেখেছিলুম। তখন তো মনে হয়েছিল যে তিনি আরও অনেকদিন বাঁচবেন। কিন্তু কখন যে কার ডাক পড়ে তা কেউ বলতে পারে না। হীরেনবাবু পরিণত বয়সেই গেছেন। তবু মৃত্যু সব সময়ই শোকের বিষয়। বিশেষত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পক্ষে। হীরেনবাবুর বেলায় বাংলাসাহিত্যের পাঠকপাঠিকার পক্ষেও বটে। তিনি অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে কখনও স্বনামে কখনও ছদ্মনামে লিখে আসছিলেন। মাসকয়েক আগেও পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ আমি পড়েছি। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা। কোথাও বার্ধক্যের লক্ষণ নেই। মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সময় ১৯৪০ সালের শেষে। সেবার আমি ছিলুম সাহিত্য শাখার সভাপতি। পরে আমার কানে এল হীরেনবাবু আর তাঁর বন্ধুরাই আমার সেই সম্মানলাভের মূলে। আগে নাকি একজন বর্ষীয়ান সাহিত্যিককে সেই পদে বসানোর প্রস্তাব হয়েছিল।

কথাপ্রসঙ্গে হীরেনবাবু আমার একটি কবিতার প্রশংসা করেন। সেই কবিতাটি আমি আমার পরিকল্পিত কাব্যসঙ্কলন থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলুম। হীরেনবাবুর কথাতেই আমি আবার ভেবে দেখি ও কবিতাটিকে আমি বর্জন করিনে। বরঞ্চ সেই কবিতা থেকেই আমার সঙ্কলনের নামকরণ হয় 'নূতনা রাধা'। এর জন্যে আমি হীরেনবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

এরপরে আমি হীরেনবাবুকে দেখি শান্তিনিকেতনে ১৯৪৪ সালে যখন আমি বীরভূমের জেলাজজ হিসেবে বদলি হই। তখন তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। জামশেদপুর স্কুলের শিক্ষক কী করে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হলেন সে বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু এই এক বছর কি দেড় বছর আগে জামশেদপুরে এক শ্রমিক নেতা হত্যার জন্যে শোক প্রকাশ করে একটি পত্রিকায় হীরেনবাবু যে প্রবন্ধ লেখেন তার থেকে জানতে পারি, বিয়াল্লিশ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য হীরেনবাবুকে বন্দি করা হয়। তখন তাঁর কারাবাসের সাথী ছিল তাঁর এক ছাত্র। সে তাঁকে দামি সিগারেট জোগাড় করে খাওয়াত। পরবর্তীকালে সেই ছাত্রটি হয় এক শ্রমিক নেতা। হীরেনবাবুকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই শর্তে যে তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে হবে। কোথায় তিনি যাবেন তাই নিয়ে চিন্তা করছেন। এমনসময় শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি এল যে তাঁকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক রূপে নিয়োগ করা হবে। হীরেনবাবু লেখেননি, তবে আমার নিজের অনুমান, ঘটনাটা কাকতালীয় নয়। জামশেদপুরে হীরেনবাবুর হেডমাস্টারমশায় ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমি দেখেছি ও তাঁর ভাষণ শুনেছি।

তাঁর জামাতা ছিলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ক্ষিতীশ রায়। ঘটনাকালে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকারী ও কাছের মানুষ। ক্ষিতীশ রায় নিশ্চয়ই তাঁর শ্বশুরমশায়ের সূত্রে হীরেনবাবুর বিষয়ে শুনে থাকবেন ও রথীবাবুকে শুনিয়ে থাকবেন। সম্ভবত সে সময় একজন অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। আর হীরেনবাবুও তো ইংরেজিতে এম এ পাশ।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি অচিরেই অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন ও কনিষ্ঠদের সকলের হীরেনদা হয়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতনে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে স্ত্রী বিয়োগের পর কলকাতায় চলে আসেন ও পুত্র হীরকজ্যোতির সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু তাঁর শিকড় থেকে যায় শান্তিনিকেতনেই। সেখানে একবার ঘুরে আসার জন্য তাঁর আকুলতা ছিল। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হল না। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেটিও অসমাপ্ত রইল। শান্তিনিকেতনে ১৯৪৪ সালে যখন তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় তখন তিনি আমার হাতে তাঁর লেখা 'বধূ অমিতা' উপন্যাসটি তুলে দেন। আমি আবিষ্কার করি যে তিনি একজন সুলেখক। তিনিও চলতি ভাষায় লেখেন। তাঁর রচনাশৈলী একজন নিপুণ কারিগরের। বইখানি পড়ে আমার মনে হল, এ কখনও নিছক কল্পনাপ্রসূত হতে পারে না। এর আড়ালে নিশ্চয়ই করুণ অভিজ্ঞতা আছে। হীরেনবাবুকে জেরা করতেই বেরিয়ে পড়ে যে কাহিনীটা আত্মনেপদী। আমার জানতে বাকি রইল না যে তিনি একজন পোড়খাওয়া প্রেমিক। আরও কিছু জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন যে 'বধূ অমিতা' এখন স্বামীর সঙ্গে সুখে বাস করছে, দুঃখটা এক তরফা।

কয়েক বছর বাদে হীরেনবাবুকে দেখা গেল বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদক রূপে। কিন্তু 'বধূ অমিতা'র মতো আর একখানা উপন্যাসও তাঁর হাত থেকে বের হল না। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এরপরে তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন নানা প্রসঙ্গে রম্য রচনা। 'ইন্দ্রজিৎ' ছদ্মনামে। কে যে সেই 'ইন্দ্রজিৎ' তা আমি 'দেশ' পত্রিকা পড়ে টের পেলুম না। পরে যখন ১৯৫১ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করি তখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তখনই জানতে পারি যে তিনিই 'ইন্দ্রজিৎ', যেহেতু তাঁর স্ত্রীর নাম প্রমীলা। কথায় আছে, স্বনামা পুরুষ ধন্য। আমরা সেটি বদলে বলতে পারি স্ত্রীনামা পুরুষ ধন্য। আমিও তো লীলাময় রায় ছদ্মনামে লিখতুম। আমি কিন্তু সেটি স্ত্রীর কাছ থেকে পাইনি, স্ত্রীই আমার কাছ কাছ থেকে পেয়ে লীলা রায় হয়েছিলেন।

ষোল বছর একটানা শান্তিনিকেতনে বাস করে আমি হীরেনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়েছিলুম। কিন্তু আমি তো তাঁর মতো আড্ডাধারী নই। তাই তাঁর জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যে আড্ডাধারিত্ব সেটি আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়। লোকমুখে শুনি যে তিনি লিখে বলার চেয়ে মুখে বলা বেশি পছন্দ করতেন। অর্থাৎ কথোপকথনের আর্ট আরও ভালো জানতেন। এই ধরনের লেখকের হাত থেকেই প্রাণবন্ত রম্যরচনা পাওয়া যায়। রম্যরচনা এক প্রকার আড্ডাও বটে। তাঁর দুখানি রম্যরচনা গ্রন্থের নাম 'ইন্দ্রজিতের খাতা' ও 'ইন্দ্রজিতের আসর'। আমার মতে বাংলাসাহিত্যে তাঁর নাম চিরস্থায়ী হবে এই দুটি গ্রন্থের সুবাদে। এছাড়া তিনি অনেক সিরিয়স প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সব কটি আমার নজরে পড়েনি। গল্পও তাঁর কয়েকটি পড়েছি। ভালোই লিখতেন। ষোল বছর শান্তিনিকেতন বাসের পর আমি সপরিবার কলকাতায় ফিরে আসি। কিছুদিন পরে কলকাতায় হীরেনবাবুর বড় মেয়ে পূরবীর বিয়ে। তিনি নিমন্ত্রণ করে যান। আমরাও বিবাহসভায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় আবার হীরেনবাবুর চিঠি। বিবাহ বাতিল। আমি তো হতভম্ব। পরে জানতে পেলুম এর আসল কারণ। বরটি বর্বর। সে তার

ভাবী শ্যালিকার সঙ্গে আশালীন ব্যবহার করেছে। অন্য কেউ হলে ক্ষমা করতেন। কিন্তু হীরেনবাবু কুসুমের মতো মৃদু হলেও বজ্রের মতো কঠোর। চারিত্রিক দুর্বলতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। যদিও পাত্রটি আর সবদিক থেকে উত্তম। অন্য কোন পাত্রীর পিতা হলে অমন সুপাত্র হাতছাড়া করতেন না। কে জানে পরে যদি আবার তেমন সুপাত্র পাওয়া না যায়। এইখানেই মানুষ হিসেবে হীরেনবাবুর বৈশিষ্ট্য। বিয়েটা বাতিল করে দেওয়ায় অনেকে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু হীরেনবাবু নাছোড়বান্দা। যাই হোক, তাঁর বন্ধুদের চেষ্টায় অন্য এক সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। আবার আমরা পেলুম বিয়ের নিমন্ত্রণ। অনুষ্ঠানে যোগ দিলুম। হীরেনবাবুর মুখে আবার হাসি। হীরেনবাবু যে কেবল হাস্যরসিক ছিলেন তা নয়। সাধারণত তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। শেষবার যখন দেখেছি তখনও হাসিমুখ দেখেছি। ভেতরে হয়ত দুঃখ বা শোক বা রাগ বা বিরাগ, বাইরে কিন্তু মৃদু হাসি ও মৃদু ভাষ। দেখতে তেমন কিছু শক্ত-সমর্থ ছিলেন না। খর্ব ও ক্ষীণকায়। কিন্তু মনের জোর ছিল অসাধারণ। জেলে যেতে ভয় পাননি। বিশ্বভারতীর কর্তাদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেছিলেন শুনেছি। ছাত্রমহলে তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয়। আমার পুত্রকন্যারা সকলেই তাঁর ভক্ত। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূও তাঁর ভক্তদের একজন। এর কারণ তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককেই ভালোবাসতেন। তাঁরা সবাই তাঁকে আজীবন মনে রাখবেন।

তাঁর ও আমার নবতি-পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্বনামধন্য হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যদিও তিনি তখনও নব্বইতে পৌঁছননি। হীরেনবাবুই ছিলেন আমাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়ান। তাঁকেই সর্বপ্রথম সম্মানিত করা হয়। তিনি সেই সম্মানের যোগ্য ছিলেন কেবল বয়সের সুবাদে নন, সাহিত্যিক যোগ্যতার জন্যও।

তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

শান্তিনিকেতন— তখন ও এখন

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যেসব সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞের তাঁর ভাবনাচিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে মিল আছে, তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজন শান্তিনিকেতনে আসুন এবং এসে বসতি স্থাপন করুন। তার জন্য বিশ্বভারতীরই একজন হওয়া আবশ্যক নয়। তাঁরা শান্তিনিকেতনের হলেই যথেষ্ট। বিশ্বভারতী একটি প্রতিষ্ঠান, শান্তিনিকেতন একটি সমাজ। নগরের কোলাহল থেকে দূরে, নিভৃতে, ঈশ্বরের ধ্যান করার সুবিধার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি বাড়ী তৈরী করেছিলেন। সেটি এক প্রকারের ধর্মশালা। শতাব্দীর শেষ দিকে মহর্ষির তরুণ দৌহিত্র বলেন্দ্রনাথ এখানে একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর দরুন এই স্বপ্নকে সত্য করার দায়িত্ব এসে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন ব্যবহারিক আদর্শবাদী। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় একটি আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

যেখানে সমস্ত আধুনিক বিষয় শেখানো হবে কিন্তু শিক্ষার্থীর জীবন হবে একজন কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্রহ্মচারীর মতো। সেই শৃঙ্খলাকে নম্র করে রাখবে সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি। কবি নিজেও শিক্ষক এবং ছাত্রদের সঙ্গে নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। প্রথাগত পরীক্ষাকে এবং ডিগ্রীকে রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা করতেন, তাহলেও তিনি ছাত্রদের এন্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে বসবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনে, সাহিত্যে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় আনল এক নয়া মোড়। তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করলেন যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি 'নীড়ে' বাসা বাঁধবে। এটিই বিশ্বভারতী। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা এসে মিলিত হবেন প্রাচ্যের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের সঙ্গে। পাশ্চাত্যের কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। কিন্তু পশ্চিমী ধাঁচে থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে ছিল না, তাঁদের বক্তব্য বোঝবার মতো অগ্রগামী ছাত্রও ছিল না। যাই হোক, কবি তাঁর 'বিশ্বভারতী'র সংকল্পে অটল রইলেন। তদনুসারে কাজ করার জন্য একটি সোসাইটি গঠন করা হলো। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রি প্রদান এসবের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সারা ভারত থেকে যাঁরা বিশ্বভারতীতে এসে পাঠ গ্রহণ করলেন তাঁরা অনেক কিছু শিখে গেলেন কিন্তু নিজ নিজ বাড়ী ফেরার পর কেউ তাঁদের বি. এ, এম. এ কিংবা পি এইচ ডি রূপে গণ্য করলেন না।

শেষ পর্যন্ত একটা আপোস রফা করা হল : কলকাতার কলেজগুলোর আদলে এখানেও একটি কলেজ স্থাপিত হল তাঁদের জন্য যাঁরা সংস্কৃতির সঙ্গে 'জীবিকা'ও তৈরী করতে চাইবেন। বিশ্বভারতীর আদি শিক্ষাক্রম রাখা হল তাঁদের জন্য যাঁরা 'জীবিকা'র চেয়ে 'সংস্কৃতি' পছন্দ করবেন। তখনকার দিনে মেয়েদের সামনে জীবিকা বলতে কিছুই প্রায় খোলা ছিল না। এরই মধ্যে দলে দলে মেয়েরা এসে জুটলেন বিশ্বভারতীতে। গুরুদেব ব্যক্তিগতভাবে নিজে যত্ন নিয়ে

বিশ্বভারতীর পাঠ্যবই নির্বাচন করতেন। কলেজের অধিকাংশ ছাত্রের কলকাতা কলেজের পাঠক্রমের দিকে ঝোঁক দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। তবুও বিশ্বভারতী পাঠক্রম টিকে রইল। বিশ্বভারতীকে যখন একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হল তখনই উঠল সারা ভারতে ডিগ্রিগত সমতা রক্ষার প্রশ্ন। বিশ্বভারতী সোসাইটি তুলে দেওয়া হল, সোসাইটি সদস্যরা তাঁদের ভোটাধিকার হারালেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল প্রচলিত শিক্ষামানকেই মান্য করা স্থির করলেন। বাঙলা সাহিত্য বিষয়টি বাদে আর প্রায় কোন বিষয়েই বিশ্বভারতী এবং দিল্লী কিংবা লক্ষ্ণৌর মধ্যে বড় একটা পার্থক্য রইল না। বিশ্বভারতীর বাঙলা পাঠ্য বিষয়কে রবীন্দ্র সাহিত্য দিয়ে অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত করা হল।

কবির ইচ্ছাতেই আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে তখন আমি অকালে অবসর নিয়েছি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে হুমায়ুন কবির আমাকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব হতে অনুরোধ করলেন। আমি তাতে সম্মত হতে পারি নি। আমি ছিলাম সাহিত্যে অঙ্গীকারবদ্ধ, আর কর্মসচিবের পদটিতেও প্রায় কোন স্বাধীনতাই ছিল না। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে প্রধানমন্ত্রীর এবং সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি-সদস্য মনোনীত করা হল। আমরা সবাই একযোগে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে লাগলাম। কিন্তু মতভেদ প্রকাশ পেতে সময় লাগল না। আমরা জানতাম—মুখে আমরা যা-ই বলি, কাজে গুরুদেবের আদর্শ থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। বছর খানেকের মধ্যে নানা প্রশ্নে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী তৈরী হয়ে গেল। আমারও আগ্রহ হ্রাস পেল। যখন উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনে আমরা একমত হতে পারলাম না। ভোটাভুটি হল, আমি হেরে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির বাইরে থাকার জন্য আমি পদত্যাগ করলাম। ১৯৬৭-তে আমি কলকাতায় চলে আসি। আমি এখনও আশ্রমের আজীবন সদস্য আছি। আর কিছু না হলেও শান্তিনিকেতন সমাজের তো একজন সদস্য আমি বটেই—যদিও অনুপস্থিত সদস্য! বছরে দু' একবারের বেশী শান্তিনিকেতনে আসা সম্ভব হয় না।

বিগত বাইশ বছরে শান্তিনিকেতনের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। যেদিকে তাকানো যায়—বিল্ডিং আর বিল্ডিং। কিছু প্রাসাদোপম বিল্ডিংয়ের মালিক হচ্ছেন ধনপতি ব্যবসায়ীরা। বিশ্ববিদ্যালয়েরও বিস্তৃতি ঘটেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে এই তারের বেড়া। উত্তরায়ণের বাড়ীগুলি, কলাভবন এবং খোলামাঠের ক্লাশের চারদিক তার দিয়ে ঘেরা। এতে কবির সমস্ত আদর্শ উদ্দেশ্যকে আন্তরিকতাশূন্য বলে মনে হয়। কিন্তু আমি কর্তৃপক্ষকে দোষও দিতে পারি না। আদর্শের চেয়ে নিরাপত্তার গুরুত্ব বেশী। পর্যটকগণ যদি বিপজ্জনক ব্যবহার করেন, কর্তৃপক্ষ বা আর কী করতে পারেন? তাছাড়া রয়েছে রাজনৈতিক ভাঙচুরের হুমকি।

এখন গুটিকয় মূল প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর সেই আরণ্যক বিদ্যালয় নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন না। যা পরে রূপান্তরিত হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিজের সীমার বাইরে গিয়ে কেন তিনি একটি পল্লী পুনর্গঠন বিভাগ স্থাপন করলেন? উত্তর হল—পতিসর এবং শিলাইদহের জমিদার হিসেবে তাঁর কিছু ইচ্ছা অপূর্ণ ছিল। তাঁদের জমিদারী যখন ভাগ হল এবং নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর নিজের সঙ্গতিও যখন বাড়ল তখন তিনি তাঁর এই অপূর্ণ ইচ্ছাকে বীরভূমে রূপায়িত করতে চাইলেন।

ঘটনাক্রমে রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার মহকুমা অফিসার রূপে এবং পরে

রাজশাহীর কালেক্টর রূপে আমার নিয়োগ হয়েছিল। নদীয় জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার এস ডি ও এবং নদীয়া জেলার কালেকটর রূপেও আমি কাজ করেছি। পতিসর নওগাঁ মহকুমায়, আর শিলাইদহ কুষ্টিয়া মহকুমায়। রবীন্দ্রনাথের কৃতির পরিচয় তখনও কিছু কিছু পতিসরে ছিল। জমিদারী ভাগের সময় পতিসর তাঁর অংশে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত শিলাইদহ চলে যায় ভাগ্যকুলের জমিদারদের হাতে। কারণ, এই অংশের মালিক সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ডরূপে ঋণে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি যখন শিলাইদহে যাই, শিলাইদহের বিখ্যাত কুঠিবাড়ী তখন জনমানবশূন্য, তার প্রাঙ্গণ প্রাণহীন। এই বাড়ীতেই কবি তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ ভারতীয় তথা ইউরোপীয় বন্ধুকে অতিথিরূপে আপ্যায়ন করেছিলেন। গোড়াতে এটি ছিল ইউরোপীয় নীলকর সাহেবদের কুঠি। এখান থেকে পদ্মা নদীর রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ভাগ্যকুলের জমিদারদের মহাফেজখানায় রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা মাত্র দুটি চিঠিই অবশিষ্ট ছিল। সেই মূল্যবান দলিল থেকে জানা যায়, কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিদ্যা শিক্ষার পর কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে দূরে কৃষিকর্ম নিয়ে থাকা কঠিন মনে করেন।

পতিসরে মহানুভব-জমিদার রবীন্দ্রনাথের অনেক বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। ওখানে তিনি একটি 'কল্যাণবৃত্তি তহবিল' গঠন করেছিলেন, এই তহবিলে প্রজারা তাদের দেয় খাজনার টাকা প্রতি দু'পয়সা জমা দিতেন, আর জমিদার জমা দিতেন তাঁর প্রাপ্ত খাজনার টাকা প্রতি দু'পয়সা। এইভাবে তাঁরা ছিলেন একটি কল্যাণপ্রকল্পে সমান অংশীদার। এই তহবিলের টাকা দিয়ে তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তিনটি মধ্য বিদ্যালয় চালানো হত। একটি বিদ্যালয় পরে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। প্রজাদের স্বার্থেই কবি তাঁর নোবেল পুরস্কারের টাকা একটি পল্লী সমবায় ব্যাঙ্কে জমা রখেন। এই টাকার সুদ শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিচালনার কাজে ব্যয় হত। ত্রিশের দশকে পাটের দর পড়ে যায়, ঋণের বেশীর ভাগ টাকাই উশুল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের আদর্শবাদী জমিদার নিখিলেশের প্রতিরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাদের মন যেভাবে জয় করেছিলেন, অবিভক্ত বাংলায় আর কোনও জমিদার তা পেরেছিলেন বলে আমার জানা নেই। পতিসর থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যখন আত্রাই ঘাটে তাঁর হাউজবোট থেকে নামেন, আমিই তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসি। শ'খানেক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেরই চোখে ছিল জল। কবি আমাকে বললেন, "এরা সারাটা পথ আমার নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে শুধু আমাকে বিদায় জানাবার জন্য। জীবনে আর কখনও আমার সঙ্গে দেখা হবে না এই জন্য ওরা কাঁদছে।" আমরা ওপরে উঠে গিয়ে কলকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় আমাকে বললেন, "জান, ওরা কী বলছিল? বলছিল আমরা পয়গম্বরকে দেখিনি,—কিন্তু আমরা আপনাকে দেখেছি।" কে এ কথা বিশ্বাস করবে? রবীন্দ্রনাথের চোখ মুখ তখন গম্ভীর।

কয়েক সপ্তাহ পরে হাঁটা পথে পতিসার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। হাতি থেকে নেমে একটা গাছের তলায় আমি অপেক্ষা করছিলাম। রবীন্দ্রনাথের এক হিন্দু প্রজা এসে আমাকে নমস্কার করলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন :

"মহর্ষির মৃত্যুর পর বাবুমশায় আসেন। প্রথা অনুযায়ী প্রজারা মহর্ষির শ্রাদ্ধের জন্য টাকা

পয়সা, সোনাদানা, ফল ফুল রবীন্দ্রনাথকে উপঢৌকন দেন। তিনি তা নিলেন, আমরা বাড়ী চলে গেলাম। পরদিন সকালে যখন আমরা ফিরে এলাম, তিনি বললেন—'সব ফেরত নিয়ে যাও। এ সব গ্রহণ করব কি করব না ভেবে ভেবে সারারাত আমার ঘুম হয়নি। আমার পিতার শ্রাদ্ধ, আমারই তো তোমাদের কিছু দেওয়া কর্তব্য, তোমরা কেন আমাকে দেবে? তিনি আমাদের একটি ভোজে আমন্ত্রণ করলেন। আমাদের অনুরোধ উপরোধে তিনি শুধু ফল ও ফুল গ্রহণ করলেন।" বৃদ্ধ দেবনাথ মণ্ডলের কথা শুনে আমি বিস্ময়মুগ্ধ।

তাঁর প্রজারা হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েই যে রবীন্দ্রনাথকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। জমিদারীর কাজ ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের কাজে অনন্যমনা হয়ে লেগে পড়েন। সেটা বিশের দশক। পতিসরে তাঁর শেষ দুবার যাওয়ার মাঝখানে বোধ করি বছর পনেরোর ব্যবধান ছিল, আমি ঠিক জানি না।

শান্তিনিকেতন আশ্রম একটি সমাজের, আন্তর্জাতিক সমাজের, রূপ ধারণ করে। আশ্রমিকরা সকলেই বাইরে থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন, বীরভূমের মাটির সঙ্গে এদের কোন যোগ ছিল না। কবি স্বভাবতই অনুভব করেছিলেন পতিসর শিলাইদহের মতো এখানেও শান্তিনিকেতনের চারপাশের গ্রামবাসীদের মন তাঁকে জয় করতে হবে। প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন বাবুমশায়, আশ্রমের লোকজনদের কাছে গুরুদেব। তাঁর জীবনের অর্ধেক ছিল জমিদারের জীবন, অর্ধেক এক ক্রমবর্ধিত জনপদের সমাজপতির জীবন। শ্রীনিকেতনে তিনি নিজে চাষের লাঙ্গল ধরেছেন। যদিও ওটা প্রতীকী। তা আমাকে রাজা জনকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। রাজা জনক ছিলেন একাধারে ঋষি ও কৃষক। কবিকে শান্তিনিকেতন দিয়েছে এক ধরনের তৃপ্তি, শ্রীনিকেতন অন্য ধরনের। তিনি কৃষক এবং কুটিরশিল্পীর কাছাকাছি গিয়েছেন কিন্তু তাদেরই একজন হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর অনুবর্তী কেউ কেউ হাল ধরেছেন, গরুর দুধ দুইয়েছেন, কিন্তু সন্তোষ মিত্র ছাড়া কেউই তাতে লেগে থাকেননি। যেমন শান্তিনিকেতনে তেমনই শ্রীনিকেতনেও সমাজ হয়ে রইল 'ভদ্রলোক'দের সমাজ। দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্য পাশাপাশি থাকলে একদিন তো বিস্ফোরণ ঘটবেই। ভাগ্যের ওপর না ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য আমাদের যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা উচিত। গুরুদেব সন্তোষ মিত্রকে তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত সহকর্মীরূপে গণ্য করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন।

তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছেন—"দাও ফিরে সে অরণ্য/লও এ নগর।" এই পঙ্‌ক্তিটির পুনরুচ্চারণ করে আমরাও প্রার্থনা করতে পারি, দাও ফিরে সেই আরণ্যক আশ্রম, নিয়ে যাও এই উপনগরী। কিন্তু বৃথা। জলের সুব্যবস্থার দরুন এখনকার শান্তিনিকেতনে গাছপালা অনেক বেড়েছে, কিন্তু নগরীকরণ রোধ করবে কে? কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটি বিনীত অনুরোধ—তাঁরা যেন ভারী ভারী মোটরগাড়ীর যাতায়াতের পথটা ঘুরিয়ে দেন। তাতে শব্দ দূষণ কমবে, পথচারীদের, বিশেষ করে শিশুদের, বিপদ কমবে। বর্তমানে শান্তিনিকেতন ভারতের একটি বহু বিজ্ঞাপিত পর্যটনকেন্দ্র। পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের তাতে পড়াশোনার ব্যাঘাত। পর্যটকরা নিশ্চয় আসবেন। কিন্তু ছেলে মেয়েদের তো এখানে দেখবার জিনিস করে রাখা হয়নি।

বিধুশেখর শাস্ত্রীর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন, বিশ্বভারতী বলতে গুরুদেব চেয়েছেন এমন একটি পরিবেশ, যেখানে যে যার সৃজনকর্ম শান্তিতে ও নিরালায় সম্পাদন করে যেতে পারবেন। সেই ১৯৩১-এর পরিবেশ আর নেই, ফিরেও আসবে না। কিন্তু এখনও যদি

আমরা সতর্ক না হই, যেটুকু আছে সেটুকুও পঞ্চাশ বছর বাদে শুধু স্মৃতি হয়ে যাবে।

দু বছর পূর্বে সুপরিচিত জার্মান ঔপন্যাসিক গুন্টার গ্রাস শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি দুটি কথায় তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন—'প্যারাডাইজ লস্ট' [স্বর্গ গেছে হারিয়ে]। শুনে আমি গভীর বেদনা বোধ করছিলাম। স্বর্গ পুনরুদ্ধারের কোন আশা আছে

আশ্রমের আবহাওয়ার মধ্যেই এমন কিছু সূক্ষ্ম বস্তু আছে যার সংজ্ঞা দেওয়া বা ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রতিবার আশ্রমে প্রবেশ করে আমি এই অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করি। দেখা না গেলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের এবং কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের সাধনা আশ্রমে সক্রিয় রয়েছে। এখনও শান্তিনিকেতন কিছু নিবেদিত আশ্রমিক নিয়ে সমৃদ্ধ। সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। খোলামেলা, সহজ সরল মুখোমুখি জীবনই আশ্রমের ঐতিহ্য। ছোটদের কাছে বড়রা সবাই 'দাদা' ও 'দিদি'। যে কেউ রথীন্দ্রনাথের কাছে যেতে পারতেন, 'রথীদা' বলে তাঁকে ডাকতে পারতেন। তেমনই ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে 'বিবিদি' বলে। তনয়দার মতো সুকঠোর শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই নিবিড় সম্বোধন ছিল স্বাভাবিক। সমস্ত শিশু এখানে ভয়শূন্য। এ কলকাতা নয়। আমি মনে করি শান্তিনিকেতন এখনও শিশুদের একটি স্বর্গ, এখনও তা কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যায়নি। কবি একবার আমাকে বলেছিলেন, ছাত্রীদের জন্য শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা আর কোথাও নেই। হায়, ততদিনে আমি বিবাহিত।
